অভিমানিনী

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল

এম্-এ, বি-এল্, সরস্বতী, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাভূষণ, ভারতী

প্রণীত।

৭৮।২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

করকমলেষু

প্রথম খণ্ড

ছায়া

অভিমানিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"যামিনী যাম যাম যুগ মানই।
জাগরে জাগি ভরমে ময় ভাণই॥"

গোবিন্দদাস।

মাধুরী তাহার স্বামীর প্রতীক্ষায় জানালার নিকট দাঁড়াইয়াছিল।

তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। দক্ষিণেশ্বর গ্রামের কিছু উত্তরে গঙ্গাতীরস্থ একখানি ছোট বাগানের মধ্যে একটি ছোট বাড়ী। বাড়ীখানির অধিকাংশই একতলা। দ্বিতলে কেবল দুইখানি গৃহ ও একটী ক্রমোন্নত ছাদবিশিষ্ট সিঁড়ির ঘর। খানিকটা খোলা ছাদ চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত। ছাদের উপর টবে কতকগুলি ফুলের গাছ সজ্জিত ছিল।

মাধুরীর স্বামী কলিকাতায় আফিসে কর্ম্ম করেন। প্রত্যহ ষ্টীমারে করিয়া কলিকাতায় যাতায়াত করেন। বাড়ী আসিতে প্রায়ই সন্ধ্যা হইয়া যায়। মাধুরী ঠিক তাঁহার আসিবার সময়টিতে প্রত্যহই উৎকণ্ঠিত চিত্তে জানালায় দাঁড়াইয়া থাকে। সেইরূপ আজও দাঁড়াইয়াছিল।

সম্মুখে বিদায়ে মন্দস্রোতা জাহ্নবী কল কল করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। গঙ্গার অপরপারে গাছের আড়ালে সূর্য্য ডুবিয়া যাইতেছে। পশ্চিমের আকাশ-প্রান্ত অস্তগামী রবিকরে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে শাদা শাদা ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ। নীল আকাশ, শাদা মেঘ ও রাঙা সূর্য্যের রেখায় চমৎকার একখানি নিসর্গচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। মাধুরী কিন্তু সেদিকে চাহিতেছিল না। তাহার সাগ্রহ দৃষ্টি দক্ষিণের দিকে গঙ্গাবক্ষে একখানি জাহাজের অনুসন্ধান করিতেছিল। তাহার স্বামীর আসিবার সময় হইয়াছে।

মাধুরী পল্লীগ্রামের মেয়ে। তাহাদের গ্রামে 'মেয়েস্কুলে' ভর্ত্তি হইয়া দিনকতক পড়িয়া বাঙ্গালা পড়িতে ও লিখিতে কিছু কিছু শিখিয়াছিল বটে, কিন্তু সেদিকে তাহার অনুরাগ মোটেই ছিল না। তাহাদের বাড়ীর আর কোনও মেয়েরা লিখিতে বা পড়িতে জানিত না। তাহারও স্কুলে যাওয়া হইত না, তবে তাহার মামা তাহার বাবাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া তাহাকে মেয়ে স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়াছিলেন। লেখা-পড়া না শিখিলে আজকালকার ছেলেরা মেয়েদের পছন্দ করে না। অল্প স্বল্প লেখা-পড়া শিখিলে হানি কি? মাধুরীর পিতাও অগত্যা কন্যার বিবাহের সুবিধা হইবে ভাবিয়া তাহাকে গ্রাম্য বালিকাবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু স্কুলে ভর্ত্তি হইলেই যদি লেখাপড়া হইত, তাহা হইলে আর ভাবনা কি? মাধুরীর পিতা কলিকাতার কোন আফিসে সামান্য ত্রিশটি টাকা বেতনে চাকরি করিতেন। সকালে উঠিয়া স্নান করিয়া পূজা আহ্নিক সারিয়া আহার করিয়াই তাঁহাকে কলিকাতায় দৌড়িতে হইত। রাত্রি না হইলে আর বাড়ীতে আসিতেন না। আসিয়া মুখ হাত ধুইয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করিয়া আহার করিতেই রাত্রি নয়টা বাজিত। দুই চারিটি সাংসারিক কথাবার্ত্তার পর সারাদিনের পরিশ্রমক্লান্ত

দেহ নিদ্রায় বিশ্রাম লাভ করিত। মেয়ের লেখাপড়া হইতেছে কি না তাহা দেখিবার তাঁহার সময় কোথায়? সপ্তাহের মধ্যে এক রবিবার ছুটী পড়িত বটে কিন্তু সেদিন সংসারের সমস্ত কাজ তাঁহার অপেক্ষায় পুঞ্জীভূত হইয়া থাকিত। অমুক জিনিসটা ক্রয় করিতে হইবে, অমুকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে, অমুকের নিকট একবার টাকার তাগাদা না করিলেই নয়, প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি সমস্ত সপ্তাহ ধরিয়া তাঁহার মনের মধ্যে জাগিতে থাকিত। এক একটা রবিবারে তাহাদের কতকগুলি করিয়া সারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেন; কিন্তু রক্তবীজের ন্যায় এই ছোট ছোট কাজগুলিকে কখনও তিনি নিঃশেষ করিতে পারিতেন না। সমস্ত জীবনটা এইরূপ আফিসের চাকরি ও ছোট ছোট কাজগুলি করিতেই কাটিয়া গেল।

বাড়ীর মেয়েরা বড় নিষ্ঠাবতী ছিল। পল্লীগ্রামে প্রাচীন আচার-পদ্ধতির বৈলক্ষণ্য সহজে ঘটিতে পারে না। ইংরাজী সভ্যতার প্রভাব ক্রমশঃ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে বটে, ও অনেক গৃহস্থ সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ পরিবার নূতন প্রণালীতে সঞ্চালিত করিতেছেন বটে কিন্তু মাধুরীর পিতা নিজ পরিবারে চিরন্তন প্রথা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। কাজেই তাঁহার বাড়ীর মেয়েরা প্রত্যহ নিয়মিত শিবপূজা করিত ও ব্রত পার্ব্বণ সম্বৎসরে কোনটাই বাদ যাইত না।

মাধুরীও ছেলেবেলা হইতে এই পূজা, বার ব্রতের টানে আকৃষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ছোট ছোট মেয়েরা যতরকম ব্রত করিতে পারে, তাহার কোনটিই তাহার অসম্পাদিত ছিল না। সমস্ত ব্রতের ছড়া, নিয়ম তাহার নখদর্পণে ছিল। শিব গড়িতে, পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিতে ও সাজাইতে তাহার মত পটু সে গ্রামে আর কেহই ছিল না। সংস্কৃত মন্ত্রগুলি কতক শুদ্ধ কতক অশুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করিতেও সে শিখিয়াছিল।

কাজেই মেয়েস্কুলে ভর্ত্তি হইলেও বই, শ্লেট, পেন্সিল্ প্রভৃতির স্কুল যাইবার সময়ই খোঁজ পড়িত। স্কুল হইতে আসিবার পর সেগুলি একটি তাকের উপর রক্ষিত হইত। তাহাতে আর মাধুরী হাত দিত না। আর স্কুলেও যে নিয়মিত যাওয়া হইত, তাহাও নহে। আজ অমুক ব্রত উদ্‌যাপন, কাল অমুক ব্রত প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কারণগুলি উপস্থিত হইলেই অর্থাৎ স্কুল যাওয়া বন্ধ হইয়া যাইত। বাড়ীর মেয়েরাও তাহাতে উৎসাহ দিতেন. কারণ তাঁহাদের মতে বার ব্রতের ন্যায় ধর্ম্মকর্ম্ম অবহেলা করিয়া স্কুলে যাইয়া কোনও ফললাভ হইবে না। মাধুরীর পিতা ত মেয়ের স্কুল যাইবার সময়ের বহু পূর্ব্বেই বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতেন, রাত্রিতে আসিতেন। মেয়ে স্কুলে যায় কি না সে সংবাদও কোনও দিন জিজ্ঞাসা করিতেন না।

এইরূপে তীক্ষ্ণবুদ্ধি হেতু স্কুলে বসিয়া বসিয়াই মাধুরী কিছু কিছু লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই সামান্য জ্ঞান চর্চ্চার অভাবে ক্রমশঃই লুপ্ত হইয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছিল। বিবাহের পর সে যখন স্বামীর ঘর করিতে আসিল, তখন সমস্তদিন তাহাকে প্রায় একলাই থাকিতে হইত। তাহার স্বামী সেজন্য তাহাকে বই টই পড়িবার জন্য অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। এঁড়েদহের লাইব্রেরী হইতে দু'চার খানি বই আনিয়াও দিয়াছিলেন। কিন্তু দুপুরবেলা সেই সমস্ত বাঞ্ছারাম ডিটেক্‌টিভের অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপপূর্ণ পুস্তক হাতে করিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেই অল্পক্ষণের মধ্যে সে ঘুমাইয়া পড়িত। জাগিয়া উঠিয়া দেখিত, তাহার বইখানি মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে।

মাধুরীর স্বামী নীলমাধব যদি তাহাকে রামায়ণ, মহাভারত বা অন্য কোনও পুস্তক আনিয়া দিতেন তাহা হইলে বরং মাধুরীর কোনও দিন

পাঠ করিবার কৌতূহল উদ্রেকের সম্ভাবনা ছিল, কেননা, ছেলেবেলায় সে মা ও ঠাকুরমার নিকট ব্রতকথাগুলির ন্যায় রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের গল্পগুলি শ্রবণ করিতে ভালবাসিত। শুনিয়া শুনিয়া সে অনেক শিখিয়াও ছিল। হয়ত এসব কথা গ্রন্থে পাঠ করিতে তাহার আগ্রহ হইলেও হইতে পারিত, কিন্তু নীলমাধব অত শত জানিতেন না। তাঁহার নিজের বিদ্যা থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত! বাল্যকালেই মাকে হারাইয়া কেবল পিতার স্নেহেই বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। সেই পিতাও তাঁহার ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। গ্রামের গঙ্গাধর ঘোষ মহাশয় কলিকাতার কোন আফিসে বড় বাবু ছিলেন। বহুদিন তাঁহার উপাসনার পর তিনি তাঁহাকে একটি চাকরি করিয়া দিয়াছিলেন। সেই অবধি তিনি এই চাকরিই করিয়া আসিতেছেন।

বাড়ীতে তাঁহার আর কেহই ছিল না। দূর সম্পর্কীয় কোনও এক খুল্লপিতামহী তাঁহাকে রাঁধিয়া খাওয়াইতেন। নীলমাধবের বিবাহের এক বৎসর পরে মাধুরীর হাতে সংসারের ভার তুলিয়া দিয়া সেই বৃদ্ধাও ইহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন।

নীলমাধব সাহিত্য-চর্চ্চা করিবার অবসর পান নাই। তবে তিনি তাঁহার বন্ধু হরিহরকে এ সমস্ত বিষয়ে একজন মস্ত সমজদার লোক বিবেচনা করিতেন। হরিহরও তাঁহাদের আফিসে কাজ করিত। তাহার উপন্যাস পড়িবার ভারী ঝোঁক ছিল। নিকটবর্ত্তী এঁড়েদহ ও দক্ষিণেশ্বর গ্রামের দুইটি লাইব্রেরীরই সমগ্র বাঙ্গলা উপন্যাস সে পাঠ করিয়া ফেলিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে গম্ভীরভাবে সে এই সকল গ্রন্থসম্বন্ধে মতামতও প্রকাশ করিত। নীলমাধব সেই মতামত শুনিয়াই মাধুরীর পাঠের জন্য পুস্তক নির্ব্বাচন করিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হরিহরের মতে যে সকল পুস্তক একবার ধরিলে আর ছাড়া যায় না, সেই সকল চিত্তচমকপ্রদ

পুস্তকও মাধুরীর হাতে পড়িয়া অনিদ্রার ঔষধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া গেল।

নীলমাধব বলিতেন "তুমি সমস্ত দিন করিবে কি?" মাধুরী হাসিয়া বলিত "আমার ঢের কাজ আছে।" বাস্তবিক সে নিজের অনেক কাজ সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রত্যূষে সমস্ত বাড়ী ঝাঁট্ দিয়া গঙ্গাস্নান, শিবপূজা, পরে রন্ধন, দ্বিপ্রহরে কাঁথা সেলাই, কোনও কোনও দিন সাবান দিয়া কাপড়, বিছানার চাদর প্রভৃতি কাচা, বিকালে পুনর্ব্বার রন্ধনের উদ্যোগ এত নিত্যই ছিল। তারপর সধবার ব্রত-নিয়মগুলি সে একে একে সমস্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গ্রামের ছোট ছোট মেয়েদের ব্রতনিয়মবিষয়ে সে নিত্যই উপদেশ দিয়া থাকে। প্রায়ই বিকালবেলা একজন না একজন মেয়ে চুল বাঁধিবার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হয়। গ্রামের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও অবাধে নীলমাধবের বাগান ও বাড়ীতে যখন তখন আসিয়া লুকোচুরি খেলে। তাহার মধ্যে কেহ মার খাইলে বা পড়িয়া গেলে কাঁদিতে কাঁদিতে মাধুরীর কাছেই সান্ত্বনার জন্য গিয়া উপস্থিত হয়; মাধুরীও তাহাকে কোলে লইয়া কখনও খাবার দিয়া কখনও বা অন্য উপায়ে ভুলাইয়া থাকে।

কিন্তু এই সমস্ত কাজের মধ্যে যত বিকালের রৌদ্র উঠানের উপর দিয়া ধীরে ধীরে সরিতে থাকে, ততই মাধুরীর মনটা চঞ্চল হইয়া উঠে। এইবার তাহার স্বামীর আসিবার সময় হইতেছে। রৌদ্র কোনখানটায় পড়িলে তাহার স্বামীর আসিবার সময় হয়, মাধুরী তাহা ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। মেয়েদের চুল বাঁধিতে বাঁধিতে, ক্রীড়াপরায়ণ বালক-বালিকাগণকে দেখিতে দেখিতে গৃহকর্ম্ম করিতে করিতে, রোরুদ্যমান বালকবালিকাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে, তাহার নয়ন দুইটি সেই চঞ্চল রৌদ্রের রেখার দিকেই বার বার সঞ্চালিত হইত। শেষে স্বামীর

আসিবার সময় হইলে সে সকল কাজ ফেলিয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইত। যতক্ষণ না তাহার স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইতেন, ততক্ষণ আর সহজে সেখান হইতে কেহ তাহাকে সরাইতে পারিত না।

সেদিনও সে এমনি করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেদিনও সে সান্ধ্যরবি-কিরণোজ্জ্বল আকাশ ও বীচিবিভঙ্গময়ী গঙ্গার শোভায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দূরে একখানি জাহাজের ধোঁয়া দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া-ছিল। তাহার স্বামীর হাত মুখ ধুইবার জন্য গাড়ু করিয়া জল ও তাহার উপর গামছা ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। গৃহমধ্যে একখানি আসন পাতিয়া, এক গ্লাস জল ঢাকা দিয়া রাখিয়াছিল। জলখাবার এখনও রেকাবীতে সাজান হয় নাই। স্বামী আসিলেই সাজাইয়া দিবে। ডিবায় কতকগুলি পান সাজিয়া শয্যার নিকট রাখিয়া দিয়াছে।

দূরে জাহাজের ধূম দেখা গেল। আজ তিন বৎসর হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে। তবুও নববধূর মত লজ্জায় ও আগ্রহে তাহার বুক কাঁপিতেছিল। তাহার স্বামী আসিতেছেন! সমস্ত দিন সমস্ত কাজের মধ্যে তাহার মনে যে তাহার স্বামীর কথাটিই জাগিতে থাকে। কতক্ষণে তিনি আসিবেন, কতক্ষণ কাছে থাকিবেন এই চিন্তাই যে তাহার অহোরাত্র হইয়া থাকে। জাহাজের বাঁশী শুনা গেল। দূরবর্ত্তী জেটীতে জাহাজ থামিল। দূর হইতে অস্পষ্ট ভাবে আরোহীর দল নামিয়া যাইতেছে, দেখিতে পাওয়া গেল। তাহাদের মধ্যে তাহার স্বামী নামিলেন কি না, অতদূর হইতে তাহা বুঝিবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

সে বাড়ীর সম্মুখের দিকের জানালায় দাঁড়াইয়া পথের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। কই তাহার স্বামী আসিলেন না। জাহাজের দুই একজন আরোহী ব্যাগ লইয়া তাহাদের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল।

প্রদীপ জ্বালিবার জন্য সে জানালার নিকট হইতে সরিয়া গেল। তবে বোধ হয় তাঁহার কোনও কারণে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। রাত্রির ষ্টীমারে বোধ হয় আসিবেন। সেইখানিই শেষ জাহাজ। এইরূপ দেরী আর একদিনও হইয়াছিল। সেদিন আফিসে বড় কাজের ভীড় ছিল।

প্রদীপ জ্বালিয়া মাধুরী উৎকণ্ঠায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। একবার এঘর, একবার ওঘর, করিতে লাগিল। তাহার মনের চাঞ্চল্য তাহার ব্যবহারে সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। রান্নাঘরে গিয়া রন্ধন সমাপনে প্রবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু কিছুতেই সেদিকে আর তাহার মন যাইতেছিল না। কেবল সে উৎকর্ণ হইয়া চিরপরিচিত পদশব্দ বা দ্বারে শিকল নাড়ার প্রতীক্ষা করিতেছিল।

রাত্রির জাহাজের বাঁশী শুনা গেল। মাধুরী ছুটিয়া জানালায় গেল। অন্ধকার গঙ্গাবক্ষে তীব্র সার্চ্চ লাইটের আলোক বিকীরণ করিতে করিতে বেগে জাহাজ অগ্রসর হইয়া আসিল। জেটীতে থামিল। এইবার নিশ্চয়ই তাহার স্বামী আসিবেন। মাধুরী দ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইল।

বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। কোনও শব্দ শুনা গেল না। সেদিন তখনও চাঁদ উঠে নাই। নক্ষত্রগুলি মাথার উপর জ্বলিতেছিল। দূরে গ্রাম্য কুক্কুরের রব দুই একবার শ্রুত হইল।

মাধুরী আর থাকিতে পারিল না। একাকিনী দ্বারে তালাবন্ধ করিয়া তাহাদের বাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তার বিপরীত দিকে এক মৃণ্ময় গৃহের দ্বারে গিয়া ডাকিল "তুলসীর মা।" "তুলসীর মা।"

প্রদীপ হস্তে এক বৃদ্ধা বাহিরে আসিল। বলিল, "কে গা? ওমা! দিদিঠাকরুণ! এত রাত্রিতে তুমি এখানে কেন? দাদাঠাকুর কোথায়?"

মা। তিনি এখনও আসেন নি। তুই একবার বাঁড়ুয্যে মশয়ের বাড়ীতে গিয়ে খবর নিয়ে আয়।

তুলসীর মা মাধুরীকে তাহার গৃহে বসিতে বলিয়া বাড়ুয্যে মশায় বা হরিহরের গৃহে চলিল। তুলসীর মার তুলসী নামে এক বিধবা কন্যা ছিল। মাধুরী বসিয়া তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে তুলসীর মার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তুলসী বলিল, "দাদাঠাকুর এখনও এলেন না কেন? আজ আসবার ত আর জাহাজ নেই। তবে যদি রেলে আসেন।"

মা। কি জানি কোনও খবরও ত দেন নি! তুই আজ আমাদের বাড়ীতে গিয়ে শুবি? একলা থাক্‌তে আমার ভয় করে।

তু। ভয় কি দিদিঠাক্‌রুণ! দাদাঠাকুর বোধ হয় রেলে করেই আস্‌বেন। হয়ত শেষ জাহাজখানা ধর্‌তে পারেন নি।

মা। তা হলেও তাঁর আস্‌তে রাত দশটা এগারটা হবে। ততক্ষণ আমি বাড়ীতে একলা থাক্‌তে পার্‌ব না। তুই আমার সঙ্গে চ।"

তু। তা যাচ্ছি। তার আর কি? মা আসুক, কি খবর আনে দেখ।

কিছুক্ষণ পরে তুলসীর মা ফিরিয়া আসিল। বলিল "বাড়ুয্যে মশায় ত কিছুই জানেন না। বল্লেন, আমি আফিসের তাগাদায় গিছলুম। শেষ জাহাজে এই মাত্র আস্‌ছি। আমি জানি নীলমাধব বিকালের জাহাজেই এসেছে।"

মাধুরী বলিল, "তুই তবে একবার ঘোষজা মশায়ের বাড়ী যা। তিনি কিছু জানেন কি না, আফিসের কোনও কাজে পাঠিয়েছেন কি না জেনে আয়।"

গঙ্গাধর ঘোষ গ্রামের মধ্যে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। ইনিই নীলমাধবদের আফিসের বড় বাবু। ইঁহার সুপারিসেই নীলমাধব ঐ আফিসে চাকরি পাইয়াছিল।

তুলসীর মা আবার সন্ধান লইতে গেল। শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ঘোষজা ম'শায়ের শ্বশুরের ভারি ব্যারাম। তিনি আফিস্ থেকেই শ্বশুরবাড়ী চলে গেছেন। বাড়ীতে আর কেউ নেই। রামা চাকর আমার খবর দিলে।"

মাধুরী উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া উঠিল। বলিল "কি হবে তুলসীর মা! তবে কার কাছে খবর পাব?"

তুলসী বলিল, "তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন দিদিঠাকরুণ। বাড়ী চল। আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। বাবু কোনও কাজে আস্তে পারেন নি। রেলে করে রাত্রিতে নিশ্চয়ই আস্বেন। ভয় কি?"

মাধুরী তুলসীকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু তাহার মন বুঝিল না। স্বামীর অপেক্ষায় প্রদীপ জ্বালিয়া বসিয়া রহিল। তুলসী আঁচল পাতিয়া শুইয়া দুই একটি কথা কহিতে কহিতে শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

অনেক রাত্রি হইয়া গেল। ঝিঁঝিঁ পোকার অবিরাম ঝিল্লীরব শ্রুত হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে দুই একটি শৃগালও ডাকিয়া উঠিতেছিল। রেলগাড়ীতে আসিবার সময় বহুক্ষণ অতীত হইয়া গিয়াছে।

বসিয়া বসিয়া মাধুরীর উৎকণ্ঠা আশঙ্কায় পরিণত হইল। কই, এত দেরী ত তাঁর কখন হয় নাই। তবে কি তাঁর কোনও বিপদ হইয়াছে? পরদিন সকালেই মাধুরী পিতাকে সংবাদ দিবে স্থির করিল। মনে মনে ঠাকুর দেবতার নিকট মানসিক করিতে লাগিল—"হে ঠাকুর! আমার স্বামীকে ভালয় ভালয় আনিয়া দাও।"

সে রাত্রিতে মাধুরী অভুক্ত রহিল। রাত্রি যখন তিনটা, তখনও তাহার চক্ষে নিদ্রা নাই। দুই একবার চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু নিদ্রা আসে না। শেষে জানালা খুলিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া রহিল।

গ্রীষ্মকাল। নৈশ শীতল সমীর প্রবাহিত হইয়া তাহার উৎকণ্ঠা ও চিন্তাতপ্ত বদনে সান্ত্বনার সুকোমল কর বুলাইয়া দিল। তখন চাঁদ উঠিয়াছে। চন্দ্রকরে জাহ্নবীসলিল ঝকমক্ করিতে করিতে বহিয়া যাইতেছে। সমগ্র প্রকৃতি সেই চন্দ্রকরে উজ্জ্বল। কিন্তু মাধুরীর হৃদয় সে দৃশ্যে ভুলিল না। উদাসনয়নে লক্ষ্যহীনভাবে সে গঙ্গার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মন বলিতেছিল আজ নিশ্চয় তাহার স্বামীর কোনও বিপদ ঘটিয়াছে।

সকালবেলা তুলসীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। মাধুরীকে দেখিয়া বলিল, "একি দিদিঠাকরুণ! তুমি কি সমস্ত রাত্রি ঘুমোও নি নাকি? মুখ চোক যে শুকিয়ে গেছে। ছি! একটুতে অত ভাবতে আছে? আমি বাঁড়ুয্যে মশায়ের কাছে মাকে এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি নেয়ে নাও। রান্নাবান্নার উদ্যোগ কর। ভয় কি? এখনই বোধ হয় দাদা ঠাকুর এসে পড়বেন।"

মাধুরী কোনও উত্তর দিল না। কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কোনও কাজে আর তাহার হাত উঠিতেছিল না। তুলসী চলিয়া গেলে সে ঘরের ভিতর গিয়া বিছানায় মুখ লুকাইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"ঝাঁপন কূপ লখই না পারনু
আইতে পড়লহুঁ ধাই ;
তখনক লঘুগুরু কছু না বিচারনু
আব পাছু তরইতে চাই ॥"

বিদ্যাপতি।

জনাই গ্রামের বাজারে একটি দোকানে বসিয়া কতকগুলি লোক পাশা খেলিতে খেলিতে কথোপকথন করিতেছিল। তখন রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। দোকানদার সে দিনের মত খাতা লেখা শেষ করিয়া জিনিষপত্র তুলিয়া ফেলিতেছে। লোকগুলিও এইবার উঠিতে হইবে বুঝিয়া খেলা বন্ধ করিয়া একবার সাগ্রহে শেষটান তামাক খাইয়া লইতেছিল।

একজন বলিল, "বোস্‌জার অবস্থা বড় খারাপ। আজ রাত্রি কাটে কি না সন্দেহ।"

আর একজন বলিল, "কল্‌কেতা থেকে না ডাক্তার আনান হয়েছে ?"

প্রথম ব্যক্তি। ডাক্তার ত তিনচার দিন থেকে কত আস্‌ছে তার সংখ্যা নাই। পয়সা খরচ কর্‌তে ত ত্রুটি হচ্ছে না। তবে পরমায়ু না থাক্‌লে আর ডাক্তার কি করবে ?

দ্বিতীয়। কেন, বোস্‌জার ত বয়স বেশী হয়নি।

প্রথম। আরে এত অত্যাচারে আর কি শরীর টেকে ? বাপের পয়সা ছিল। দেদার উড়িয়েছে, আর মদ খেয়েছে। আর বছর

লিভার এব্‌সেস্ (liver abcess) হয়, মেডিকেল কলেজে গিয়ে অপারেসন (operation) করান। তখনই সাহেব ডাক্তার বলেছিল মদ ছাড়। এবার হলে আর বাঁচবে না। তা ও নেশা একবার ধরলে কি আর কেউ ছাড়তে পারে ?

আর একজন বলিল, "তা যাই বল। অমন দিলদরিয়া মেজাজ আর কারও হবে না। বোস্‌জার বাপ্ যখন বেঁচে ছিল, তখন একটি পয়সাও বাজে খরচ হ'ত না। এই ছিদামকেই জিজ্ঞাসা কর না কেন। বোস্-জার বাপ্ বেঁচে থাকতে ছিদামের হিসেব মেটা এক কি কাণ্ডই না ছিল ? কি বল হে ছিদাম ?"

দোকানের মালিক ছিদাম মুদী বলিল, "এজ্ঞে বাবু যা বলছেন তা মিছে নয়। কত্তার কাছে পাই পয়সাটি ফাঁকি দেবার যো ছ্যালনি।"

প্রথম। বাপের এত কষ্টের টাকা এর মধ্যেই উড়িয়ে দিলে ? শুনেছি না কি দেনা করবার জন্য দালাল লাগিয়েছে।

দ্বিতীয়। ও আর শোনাশুনি কি ? এ'ত জানা কথা। ভদ্রাসন-খানা ত সিঙ্গীদের কাছে বাঁধা রয়েছে।

তৃতীয়। বল কি হে ? বুড়ো যে ঢের টাকা রেখে গেছ্‌ল। এর মধ্যে ফুঁকে দিলে ? বাড়ী বাঁধা দিয়েছে তোমায় বল্লে কে ?

দ্বিতীয়। আরে এ কথা কি আর সবাই জানে ? সিঙ্গীদের সরকার বামাচরণ মুখুয্যে সেদিন আমায় বলছিল। বল্লে, এই অসুখের সময় চিকিৎসার টাকার জন্য ঐ মর্টগেজের উপর আবার কিছু টাকা চেয়েছিল। তা সিঙ্গীমশাই দিতে চান্ নি। বলেন, যে টাকায় বাঁধা রেখেছি তার চেয়ে বেশী টাকা দিলে আমার পোষাবে না।

প্রথম। কত টাকায় বাঁধা আছে ?

এই সময় একজন চাকর দৌড়াইয়া সেই দোকানের সামনে দিয়া

চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া প্রথম ব্যক্তি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কিরে মাণিক কোথায় যাচ্ছিস্ ?"

মাণিক থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এই যে গাঙ্গুলী মশাই, আপনি এখানে। শীগ্‌গীর আসুন। বাবু মারা গেছেন।"

দোকানের সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং বলিল, "এঁ্যা, বোস্‌জা মারা গেছে!" বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই পাছে দাহ করিবার সহায়তা করিতে বলে, এই ভয়ে সকলেই সরিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। গাঙ্গুলী মহাশয়ের তদ্রূপ ইচ্ছা থাকিলেও আর সে চেষ্টা করিতে পারিলেন না। কেন না, উপস্থিত সকলেই মাণিককে বলিলেন, "এই যে গাঙ্গুলী মশায় যাচ্ছেন। ইনিই সব ঠিক করে দিবেন। কোনও ভাবনা নাই। তোমাদের জামাই বাবুরা এয়েছেন ত ?"

বড় জামাতা গঙ্গাধর ঘোষ দক্ষিণেশ্বরবাসী। তিনিই নীলমাধবের আফিসের বড়বাবু।

মাণিক বলিল, "কেবল বড় জামাইবাবু এসেছেন। তিনি সন্ধের আগেই এসে পৌছেছেন।"

মাণিকের সঙ্গে গাঙ্গুলী মশাই একদিকে ও উপস্থিত লোকগুলি বিভিন্নদিকে চলিয়া গেল। ছিদাম মুদী ঝাঁপ বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

ঝাঁপ বন্ধ করিয়া ছিদাম আহারাদি করিল। পরে একখানা বট-তলার ছাপান "মনসার ভাসান" বাহির করিয়া কেরোসিনের ডিবার আলোকে সুর করিয়া পড়িতে লাগিল। এটি তাহার নিত্যকর্ম্ম। ছিদামের স্ত্রীবিয়োগ হইবার পর তাহার সংসারে আর কেহই ছিল না।

ছিদাম একমনে সুর করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বইখানি পড়িতে লাগিল। নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া "হরিবোল" ধ্বনি তাহার কাণেও

পৌঁছিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেও একদিন তাহার পত্নীর শবদেহ লইয়া শ্মশানযাত্রী হইয়াছিল এ কথাও তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল। ত্রস্তে এক ফোঁটা অশ্রু মার্জ্জন করিয়া ছিদাম দ্বিগুণ আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়িয়া "মনসার ভাসান" পাঠ করিতে লাগিল।

কত রাত্রি, তাহা ছিদাম জানে না; কিন্তু পড়িতে পড়িতে তাহার ঘুম আসিতে লাগিল। তখন তাহার দোকানের পয়সা রাখিবার জন্য উপরে ছিদ্রবিশিষ্ট বাক্সটি খুলিয়া তাহার ভিতর জীর্ণ শীর্ণ বইখানি রাখিয়া দিল। পরে শয়নের উদ্যোগ করিতে লাগিল।

এই সময় বাহির হইতে কে ডাকিল "দোকানদার! ওহে মুদী।"

ছিদাম বলিল "কে?"

উত্তর। একবার ঝাঁপটা খোল। বিশেষ দরকার আছে।

ছিদাম ঝাঁপ খুলিয়া দেখিল,একজন দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ ভদ্রলোক একটি পুঁটুলী হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ছিদাম বলিল, "কি চাই বাবু?"

উত্তর। আমায় আজ রাত্তিরের মত এখানে থাক্‌তে দিতে হবে। তোমাদের গ্রামের বোসজা মশায়কে দেখবার জন্য যে ডাক্তার এসে-ছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গে এসেছি। বোস্‌জা মশায়ের বাড়ীতে বড় কান্নাকাটি হচ্ছে। ঘুম ত হবে না। তাই এখানে একটু শুতে এলুম। কাল সকালেই আবার ডাক্তার বাবুর সঙ্গে আর একটা ডাকে যেতে হবে।

ছিদাম বলিল, "ডাক্তার বাবু কোথায় গেলেন্?"

"তিনি বোস্‌জা মহাশয়ের খিড়কী পুকুরের ওপারে তোমাদের গ্রামের ডাক্তারের বাড়ীতে শুয়েছেন। আরও দুজন ডাক্তার সেখানে আছেন। ছোট ঘর, আর জায়গা নাই।"

ছিদাম তখন আর কোনও কথাবার্ত্তা না বলিয়া ভদ্রলোকটির শয়নের উদ্যোগ করিতে লাগিল। একবার বলিল, "আপনার খাওয়া হয়েছে ত?"

উত্তর। হাঁ।

ছি। তামুক খাবেন কি?

উত্তর। না আমি তামাক খাইনে। কাল সকালে কখন্ কল্‌কাতার গাড়ী পাওয়া যাবে বল্‌তে পার?

ছি। এজ্ঞে, ছ'টার সময় একখানা, সাতটার সময় আর একখানা।

উ। আমি ছ'টার গাড়ীতেই যাব। তুমি ভাই আমাকে ডেকে দিও। যদি ঘুমিয়ে পড়ি।

ছি। এজ্ঞে, তা দোব বই কি? সে বল্‌তে হবে কেন? পুঁটুলিটা এইখেনে রাখেন্।

উ। থাক্, আমার বিছানার উপর থাক। ওষুধপত্র আছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া উভয়ে শয়ন করিল। কিন্তু ছিদামের সহজে নিদ্রা আসিল না। "মনসার ভাসান" পড়িয়া সে এতক্ষণ তাহার পত্নীর মৃত্যুর কথা ভুলিতে চেষ্টা করিতেছিল বটে, কিন্তু এখন সমস্ত স্মৃতি তাহাকে একেবারে আক্রমণ করিল। এমন নিত্যই হইত। তবে আজ শ্মশানযাত্রীর হরিধ্বনি সেই অতীত শ্মশানদৃশ্য তাহার মনে আরো বিশেষরূপে জাগাইয়া দিয়াছে।

ছিদাম অনেকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। অলক্ষ্যে দুই এক ফোঁটা জল তাহার চক্ষু দিয়া গড়াইয়া তাহার মলিন ছিন্ন উপাধান সিক্ত করিল। বাবুটিও নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। মধ্যে মধ্যে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছিলেন। ছিদাম ভাবিল, "ভদ্দরলোক,

এমন বিছানায় শোয়া ত অভ্যেস নেই, ঘুম আসছে না।” কিছুক্ষণ পরে ছিদাম ঘুমাইয়া পড়িল।

অনেক রাত্রিতে ছিদামের একবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বাবুটি তখনও ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন।

ছিদাম বলিল, “কি বাবু, ঘুম হচ্ছে না?”

উত্তর। না হে। বড় মশা কামড়াচ্ছে। মশারি ফেলে শোওয়া অভ্যাস কি না। তা হোক, আর রাত বোধ হয় বেশী নাই।

কিছুক্ষণ পরে ছিদাম আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোরবেলায় ছিদাম ঝাঁপ খুলিয়া বাবুটিকে ডাকিয়া দিল। বাবুটি তাড়াতাড়ি উঠিয়া ছিদামকে চার আনা পয়সা দিয়া দ্রুতপদে পুঁটুলী লইয়া ষ্টেশনের দিকে চলিয়া গেলেন। ছিদাম বলিল, “বাবু! হাত মুখ ধুয়ে যান, গাড়ী ছাড়বার এখনও ঢের দেরী আছে।” কিন্তু ভদ্রলোকটি দাঁড়াইলেন না। চলিতে চলিতে ছিদামের দিকে না ফিরিয়াই বলিলেন, “থাক। ষ্টেশনে গিয়েই খানিক বস্‌ব এখন।”

ছিদাম মুখ হাত ধুইয়া দোকানে জল আছড়া দিয়া ধুনা জ্বালিল। পরে জিনিষপত্র সাজাইতে লাগিল। ক্ষণ পরেই কলিকাতায় যাইবার গাড়ীর বাঁশী শুনা গেল। তখন বাবুটি যেখানে শুইয়াছিলেন, সেখানকার বিছানাটির দিকে ছিদামের নজর পড়িল। দেখিল বিছানার তলায় একখানা কাগজের ছোট খাতা পড়িয়া রহিয়াছে। বাবুটির পকেট হইতেই নিশ্চয়ই ইহা পড়িয়া গিয়াছে। ছিদাম খাতাখানি তুলিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল কেবল কতকগুলি জমাখরচ রহিয়াছে। অধিকাংশ বাজার খরচের হিসাব।

খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা ছিল “শ্রীনীলমাধব ভট্টাচার্য্য। সাং দক্ষিণেশ্বর।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো
বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে॥"

কুমারসম্ভবম্।

যে রাত্রিতে বোসজা মহাশয়ের মৃত্যু হইল, তৎপরদিন অতি প্রত্যূষে বোসজা মহাশয়ের বড় জামাতা গঙ্গাধর ঘোষ পরিবারবর্গ লইয়া বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বসু-গৃহিণী তখন ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতেছিলেন। কনিষ্ঠা কন্যা মালতী পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছিল, বসুজ মহাশয়ের মৃতদেহ দাহ করিয়া তখনও তাঁহার পুত্রদ্বয় রঘুনাথ ও উমানাথ প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই। দুই চারজন বয়স্কা প্রতিবাসিনী গঙ্গাধর ঘোষ মহাশয়ের পত্নীকে এ সময় যাইতে বিশেষভাবে নিষেধ করিতে লাগিলেন। মায়ের এই অবস্থা, ভাইবোনগুলির বয়স অল্প, এইভাবে তাহাদের ফেলিয়া গেলে তাহাদের মুখের দিকে চাহিবে কে? কিন্তু তাহাদের যুক্তি, তর্ক, অনুরোধ বা মিনতিতে কোনও ফল হইল না। গঙ্গাধর গাড়ী আনাইয়া স্ত্রী ও পুত্রকে লইয়া চলিয়া গেলেন। বসু-গৃহিণী তখন শোকে অচেতন প্রায়, তিনি কোনও কথাই কহিলেন না।

রঘুনাথ ও উমানাথ যখন মৃতদেহ দাহ করিয়া গাঙ্গুলী ম'শায় ও অন্য দুই চারজনের সঙ্গে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সকাল হইয়াছে। রোদনের রোলে বসু মহাশয়ের বৃহৎ ভবন তখনও প্রতিধ্বনিত হইতে

ছিল। নগ্নপদ উত্তরীয়ধারী রঘুনাথ ও উমানাথকে দেখিয়া রোদনের রোল আরও বর্দ্ধিত হইল।

রঘুনাথ বাহিরের ঘরে একখানি কম্বলের উপর চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। পাড়ার অনেকে আসিয়া সহানুভূতি জানাইয়া গেলেন। অনেকেই স্বর্গীয় বোস্‌জীর দোষগুলি ভুলিয়া গুণের উল্লেখ করিয়া তাঁহার মৃত্যুতে আক্ষেপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ রঘুনাথকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। রঘুনাথ অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া রহিল। শোকের প্রথম আঘাত তখনও সে সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। সে আঘাতে সে একেবারে নিশ্চল হইয়া গিয়াছিল। তাহার কি হইয়াছে, সহসা পিতার মৃত্যুতে সে কতদূর বিপদে পড়িয়াছে, তাহাও সে তখন ভালরূপ ধারণা করিতে পারিতেছিল না। কেবল একটা অসহ্য যন্ত্রণায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল।

রঘুনাথ সেইবার ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। সংসারের কোথায় কি হইতেছে, কত আয়, কত ব্যয়, কিরূপে সংসার চলিতেছে, এ সকল ভাবনা তাহার কিছুই ছিল না। আজও সহসা সে চিন্তা তাহার মনে উঠিল না। সে কেবল তাহার পিতা যেখানে বসিতেন, সেই চিরপরিচিত স্থলটি শূন্য দেখিতেছিল। তাহাতেই তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতেছিল।

উমানাথ রঘুনাথের কাছে ছিল না। সে বাড়ীর মধ্যে গিয়া বসিয়াছিল। উভয় ভ্রাতার প্রকৃতি বিভিন্নপ্রকারের ছিল। রঘুনাথ মাতার ন্যায় শান্ত ও নির্ব্বিরোধী ছিল। উমানাথ পিতার উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির আভাস পাইয়াছিল। রঘুনাথের পিতা উভয় পুত্রকেই ভালবাসিতেন। একদিকে যেমন রঘুনাথ কি মনে করিবে এই ভয়ে অতি সন্তর্পণে নিজ উচ্ছৃঙ্খলতা গোপন করিবার প্রয়াস পাইতেন, অন্যদিকে তেমনি উমা-

নাথের টেনিস্ ব্যাট, ফুটবল-ক্লাবের চাঁদা, বাইসিকেল প্রভৃতির জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আগে অবস্থা ভাল ছিল। তখন ছেলেরা যে ভাবে পালিত হইয়াছিল, ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধানেও সে ভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। সঞ্চিত অর্থ ফুরাইয়া গেল, দেনা হইল, বাড়ী বন্ধক পড়িল। তখনও পুত্রদের ভাল খাবার, ভাল পোষাকের যোগাড় হইবার কোন বাধা দেখা যাইত না। রঘুনাথের বই কেনার সখ্, উমানাথের খেলার সখ্। উভয়ের যখন যাহা দরকার হইত, একবার আবদার ধরিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ হইয়া যাইত। তাহারা বুঝিতে পারিত না সময় সময় তাহাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে তাহাদের পিতাকে কত বিপদে পড়িতে হইত—ঋণের চেষ্টা করিতে যাইয়া কত জায়গায় অপ্রস্তুত হইয়া আসিতে হইত।

আজ তাই উভয় ভ্রাতাই বসিয়া বসিয়া পিতার স্নেহের কথা ভাবিতেছিল। পিতা যে বিপুল ঋণ রাখিয়া তাহাদিগকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া গিয়াছেন, তাহা তাহারা কিছুই জানিত না! তাহারা কেবল ভাবিতেছিল, আর কে তাহাদের আবদার সহ্য করিবে?

ক্রমে রঘুনাথের নিকট হইতে গ্রামস্থ সকলে উঠিয়া গেলেন। তখন বেলা হইয়াছিল। রঘুনাথ তখনও সেইভাবে বসিয়াছিল।

অনেকক্ষণ বাদে দরজা খুলিয়া এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা সেই গৃহে প্রবেশ করিল, তাহার নাম মালতী। সে রঘুনাথের কনিষ্ঠা ভগিনী। সে হাতে করিয়া একটি থালায় কিছু মিষ্টান্ন ও এক গ্লাস সরবৎ আনিয়াছিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চোখ দুইটি ফুলিয়াছে ও রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। থালা ও গেলাসটি রঘুনাথের সম্মুখে রাখিয়া মালতী কম্পিতস্বরে বলিল, "দাদা, জল খাও।"

সেই বাষ্পরুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া রঘুনাথ আর আত্মসম্বরণ

করিতে পারিল না। ভগিনীর মুখের দিকে চাহিয়া সে আকুলকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল।

মালতীর প্রায় দুই বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে। কলিকাতায় তাহার শ্বশুরবাড়ী। তাহার শ্বশুর জমীদার, প্রভূত সম্পত্তিশালী। মালতীর পিতা মালতীর বিবাহের সময় প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন; তেমন উৎসব সে গ্রামে আর কখনও হয় নাই। নিজের দারিদ্র্য তখন আসন্ন, তাই নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ যেমন একবার জ্বলিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই নিভিয়া যায়, তেমনি রঘুনাথের পিতাও নিজের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাও ঋণ করিয়া যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা দ্বারা কন্যার পরিণয়োৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার জমীদার বৈবাহিক বহু চেষ্টা করিয়াও এই উৎসবের কোনও ত্রুটি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। এই বিবাহের খরচের জন্যই রঘুনাথদের বাস-গৃহ বন্ধক পড়ে। বিশ হাজার টাকার উপর এই বিবাহে খরচ হইয়া-ছিল।

রঘুনাথ ও মালতী যখন কাঁদিতেছিল, তখন বাহির হইতে কাহার পদধ্বনি শোনা গেল। মালতী মুখ তুলিয়া দেখিল, তাহার শ্বশুর ও স্বামী আসিতেছেন। সে তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টানিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

মালতীর শ্বশুর হৃদয়বাবু বড় পাকা জমীদার। বৈষয়িক ব্যাপার-টাকে তিনি এত বড় করিয়া জীবনে দেখিতেন যে অন্যান্য সমস্তই তাহার তলে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার সমস্ত কার্য্যেই তিনি লাভ লোকসান খতাইয়া দেখিতেন। স্নেহ, ভালবাসা বা দয়া যেখানে তাঁহার লাভের অনুকূল হইত সেইখানেই স্ফূর্ত্তি পাইত। তা না হইলে বড় কিছু করিতে পারিত না। পুত্রের লেখাপড়াশিক্ষা হইতে আরম্ভ

করিয়া বিবাহ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাতেই নিজের 'ক লাভ হইবে তাহা বিবেচনা করিয়া চলিতেন।

বৈবাহিকের পীড়ার সংবাদ পাইয়া হৃদয় বাবু স্থির করিয়াছিলেন যে একবার দেখা করিতে যাইবেন। কারণ যদি বুড়া মরিবার সময় উইল করে তাহা হইলে হৃদয় বাবু তাহার এক্জিকিউটর হইতে পারেন, অন্ততঃ বুড়াকে দিয়া তাহার জামাইকে কিছু দেওয়াইবার চেষ্টা করা যাইতে পারিবে। নিতান্ত তা না হয়, বুড়া কন্যাকে কিছু দিয়া যাক্। এই সকল বৈষয়িক মতলব সিদ্ধির জন্যই তাঁহার আসা। কিন্তু আসিবার পূর্ব্বেই যখন জনরবে শুনিলেন যে বুড়ার বিষয় সম্পত্তি ত কিছুই নাই, অধিকন্তু বিস্তর দেনা রহিয়াছে, তখন আর তাঁহার সেখানে আসার কিছুমাত্র উৎসাহ রহিল না। বরং ভয় হইতে লাগিল পাছে বেয়ান বেটী কাঁদাকাটি করিয়া নাবালক পুত্রদ্বয়সহ গলগ্রহ হইয়া পড়ে। যাহা হউক, যখন রওনা হইয়া পড়িয়াছেন, তখন একটা হেস্ত নেস্ত করিয়া যাওয়াই ভাল, এই উদ্দেশ্যে তিনি পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বৈবাহিকের গৃহে পদধূলি প্রদান করিলেন।

তাঁহার আগমন-সংবাদে বসু-গৃহিণী আরও উচ্চরবে রোদন করিয়া উঠিলেন। পাড়ার দু'চারজন মাতব্বরও সমবেত হইলেন।

হৃদয়বাবু বেশ ধীর ও গম্ভীরভাবে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "এমন অবস্থা হয়েছে, তা কি আমি আগে জানি? তা হলে আগেই আস্তুম। তবু শচীনকে পাঠিয়ে দিচ্ছিলুম, ও ছেলেমানুষ, তার ওপর এবার পরীক্ষা। ও-ই বা আসে কি করে? তবে এ রকম অসুখ জান্‌লে সব কাজ ছেড়ে ও-ও আস্‌ত, আমিও আস্তুম। রঘুনাথ বাবাজীও ত কোনও সাঙ্ঘাতিক অসুখ বলে জানাও নি। তা তুমিই বা বুঝবে কি করে? ছেলেমানুষ তোমরা সব। সবই ভবিতব্যের হাত। আহা

বোস্‌জা মশায় বড় উদার ছিলেন। কিন্তু তাও বলি এই জন্যই আবার অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে। অবশ্য আমি ঠিক জানি না। তবে যে রকম শুন্‌ছি, তাতে বোস্‌জা ত কেবল দেনাই রেখে গেছেন বোধ হয়। কি বল রঘুনাথ? আমার কাছে আর লুকিয়ে কি হবে? ছেলেমানুষ তোমরা। আমাকেইত সব দেখ্‌তে শুন্‌তে হবে।"

পাড়ার সিঙ্গীমশাই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার কাছেই রঘুনাথদের বাড়ীখানি বন্ধক ছিল; হৃদয় বাবু আসিয়াছেন শুনিয়া তিনিও নিজ প্রাপ্যের একটা বন্দোবস্ত করিতে আসিয়াছিলেন। অন্যান্য পাওনাদারেরাও সেই উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল। সকলেই ভাবিতেছিল, হৃদয়বাবু নিশ্চয়ই কিছু একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন, কারণ তিনি ভিন্ন আর এখন নাবালকদের অভিভাবকই বা কে?

হৃদয়বাবুর কথা শুনিয়া সিঙ্গীমশাই হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট-খাট পাওনাদারেরা সকলেই নিজ নিজ প্রাপ্যের কথা উল্লেখ করিতে লাগিল। দেনার পরিমাণ শুনিতে শুনিতে হৃদয়বাবুর মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল, গড়গড়ার ডাক মন্দীভূত হইয়া গেল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "এখানে এসে কি ভুলই করেছি।"

মুখে বলিলেন, "তা তোমাদের ভাবনা কি? সবাই টাকা পাবে। বোস্‌জার কি আর পুঁজি কিছু নেই? আর যারা বন্ধক নিয়ে টাকা দিয়েছ, তাদের আর টাকা ডোববার ভয় কি? যাক কিছুদিন, শ্রাদ্ধ-শান্তিটা চুকে যাক্। তার পর একটা মীমাংসা করা যাবে, কি বল হে রঘুনাথ?"

রঘুনাথ আর কি বলিবে? এই প্রথম সে নিজের অবস্থার ইঙ্গিত পাইতেছিল। সে যে কতদুর নিঃসহায় তাহা এতক্ষণে তাহার বোধ হইতেছিল। পিতার ঋণের পরিমাণ যে এত, তাহা সে কোনওদিন

কল্পনা করে নাই। আজ তাঁহার প্রথম সংসারে প্রবেশ। কিন্তু কি শোচনীয় অবস্থায় তাহার সংসারের জ্ঞান হইল!

কিছুক্ষণ এইরূপ কথাবার্ত্তার পর হৃদয়বাবু বলিলেন, "তা হলে বাবাজী, বৌমাকে আজ আমি নিয়ে যেতে চাই। এখানে কান্নাকাটি কচ্ছে। সেখানে গেলে তবু কতকটা ভুলে থাকবে। আবার কিছুদিন বাদে আমি নিজেই রেখে যাব।"

রঘুনাথ বলিল, "মাকে একবার জিজ্ঞাসা করতে হয়।"

হৃদয়। তা বেশ। চলনা, আমিও যাচ্ছি।

বসু-গৃহিণী যেখানে ভূমিতে পড়িয়া কাঁদিতেছিলেন সেখানে হৃদয়-বাবু উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পুত্র শচীন্দ্র ও রঘুনাথ গেল। উমানাথও সেখানে এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল।

হৃদয়বাবু বলিলেন, "আহা, কি সর্ব্বনাশটাই হয়ে গেল, নাবালক ছেলে, এতবড় সংসার এত দেনাপত্র রেখে বোসজা মারা গেলেন। সংসারের গতিই এই রকম। সকলকেই যেতে হবে। তবে আগে আর পরে। যা হবার তা হয়েছে, বেয়ান ঠাকরুণ! এখন আপনি একটু না সামলালে সংসার দেখে কে? এই ছেলে দুটির মুখের দিকেই বা চায় কে? শ্রাদ্ধশান্তিটাও আছে। তারও যোগাড় করতে হয়। তার খরচপত্রই বা কিসে চলবে? নগদ টাকা কড়ি বা জিনিসপত্র ত কিছু আছে?"

হৃদয়বাবুর তখনও আশা ছিল যে বোসজার কিছু সঞ্চিত অর্থ অন্ততঃ গৃহিণীর অলঙ্কারাদি আছে সেই খবরটা জানিবার জন্যই অত কৌশলে কথাটার অবতারণা করিলেন।

বসু-গৃহিণী সে কথার কোনও উত্তর দিলেন না। কেবল বলিলেন,

"বেয়াই, এখন আমাদের সব আশা ভরসা তুমি। তুমি থেকে যা ভাল হয় সব ব্যবস্থা করে দাও।"

হৃদয়। তা দোব বৈ কি? সে কি আর একবার করে বলতে? শচীন আর রঘুনাথ উমানাথ কি ভিন্ন? তাই বলছিলুম কর্ত্তা কি রেখে গেছেন না গেছেন জেনে সেই রকম সব ব্যবস্থা করতে হয়।

বসু-গৃহিণী। "আমাদের আর কি-ই বা আছে বেয়াই? তোমার কাছে আর লুকিয়ে ফল কি? আমার গহনা ও যৎসামান্য যা কিছু আছে তা সিন্দুকেই দেখতে পাবে। কর্ত্তার হিসাব পত্র হাতবাক্সে আছে।

হৃদয়বাবু তখন বাক্সের তল্লাস করিলেন। বাক্স বসু-মহাশয়ের শয়ন গৃহেই থাকিত, বাক্স আনীত হইল। তখন চাবির খোঁজ পড়িল। চাবির গোছা বসু মহাশয়ের মাথার বালিসের তলে থাকিত। বসুমহাশয়ের মৃত্যু হইলে রঘুনাথের দিদি চাবির গোছা একটা তাকের উপর রাখিয়া দিয়াছিলেন। সেই খানে খোঁজ করিয়া চাবি পাওয়া গেল না।

হৃদয়বাবু রঘুনাথকে বলিলেন, "তোমার দিদিকে জিজ্ঞাসা কর না, পরে আর কোথাও রাখেন নাই ত?"

রঘু। তিনি ত এখানে নাই। জামাই বাবু আজ সকালেই দিদিকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর চলে গেছেন।

হৃদয়বাবু তখন বাক্স ভাঙ্গাই স্থির করিলেন। অন্য কেহ তাহাতে আপত্তি করিল না। বাক্সের ভিতর হইতে খাতা বাহির করিয়া হৃদয়বাবু তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মত সুদক্ষ হিসাবীর পক্ষে বসুজ মহাশয়ের অবস্থা বুঝিতে বেশী সময় লাগিল না। দেখিলেন বসুজ মহাশয় যে দেনা রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় হইলেও সম্পূর্ণ দেনা পরিশোধ হইবার সম্ভাবনা নাই। খাতা

খানি দেখিতে দেখিতে হঠাৎ নিম্নলিখিত পংক্তিটির উপর হৃদয় বাবুর দৃষ্টি পড়িল—

"বিশ্বম্ভর পাইন—মালতীর টায়রা বন্ধক দিয়া—৫০০৲।"

হৃদয়বাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার পুত্রবধূর অলঙ্কারও কি বন্ধক দিয়াছে না কি? তাহা হইলে বসু-গৃহিণীর অলঙ্কার ত নিশ্চয়ই নাই। খুঁজিতে খুঁজিতে আর এক জায়গায় দেখিলেন—

"নিশিকান্ত সাহা—মালতীর নেকলেস্ বন্ধক—৩০০৲।"

হৃদয়বাবু আস্তে আস্তে খাতাখানি রাখিয়া দিলেন। ভাবিলেন, যা হইবার হইয়াছে, বৌমাকে আর একদণ্ড এখানে রাখা উচিত নয়। এই স্থির করিয়া বলিলেন, "বেয়ান, আর একটা কথা। বৌমাকে আমি আজই নিয়ে যেতে চাই। এখানে কান্নাকাটি করবে। সেখানে তবু পাঁচটা দেখবে, নূতন জায়গায় অনেকটা ভুলে যাবে।"

বসু-গৃহিণী একবার বলিলেন "এই শোক পেয়ে ও গিয়ে থাকতে পারবে কি? না হয়, দুদিন বাদেই নিয়ে গেলেন।"

হৃদয়। না বেয়ান, তুমি বুঝছ না। এখানেই চারদিকে চাইলে সব কথা মনে পড়বে। ভায়েদের এই অবস্থা, তোমাদের এই অবস্থা দেখলে আরও অস্থির হয়ে পড়বে। তার চেয়ে কিছুদিন সরে থাকাই ভাল।

বসু-গৃহিণীর একবার বলিবার ইচ্ছা হইল "আমার সংসার কে দেখে? ছেলেদেরই বা কে দেখে?" কিন্তু নিজেদের সুবিধার জন্য অনুরোধ আর করিতে পারিলেন না। মেয়ের বিবাহ হইলেই সে পর হইয়া যায়। এই ত সেই দিনই সকালে তাঁর বড় মেয়ে সকল অবস্থা দেখিয়া শুনিয়াও তাঁহাকে এই অবস্থায় রাখিয়া চলিয়া গেল।

বসু-গৃহিণী বলিলেন, "আমি আর কি বল্‌ব বেয়াই। তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর।"

হৃদয় বাবু তখন পাল্কী ডাকাইবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য বাহিরে উঠিয়া গেলেন।

শচীন্দ্রও পিতার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে যাইতেছিল, এমন সময় ঝি ডাকিল "জামাইবাবু একবার এদিকে আসুন।"

হৃদয়বাবু মুখ ফিরাইয়া শচীন্দ্রকে বলিলেন,"যাও বাবা, একটু বোসগে যাও। আমি যাওয়ার ব্যবস্থা করছি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"কিন্তু হেন ম্রিয়মাণ, সদা সঙ্কুচিত প্রাণ
রমণী, পুরুষগণে কে করে যতন ?"

হেমচন্দ্র।

বাবুদের বাড়ীর খিড়কীর ঘাটে তখন পাড়ার দুইজন প্রতিবাসিনী স্নান করিতে আসিয়া চুপি চুপি কথা কহিতেছিল। একজনের নাম বামার মা। বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। ইনি বসু পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলা-মেশা করিতেন ও আপদে বিপদে বুক দিয়া পড়িয়া সাহায্য করিতেন। বসু মহাশয়ের পীড়া বৃদ্ধি হওয়ার দিন হইতে ইনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেবা ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। অপর রমণী তাঁরই প্রায় সমবয়স্কা! তাঁহাকে সকলে বামুন ঠাকরুণ বলিয়া ডাকিত!

বামার মা চুপি চুপি বলিতেছিল, "বুঝ্লে বামুন ঠাক্রুণ! বুড়ো মরেও মায়া কাটাতে পারে নি। কাল রাত্তিরে যখন মড়া নিয়ে বেরিয়ে গেল, আমি ঐ বারান্দার পাশটায় পড়েছিলুম। সমস্ত দিনের খাটুনি, তার পর এই শোকতাপ। মনে কর্লুম রাত্তিরে আর কোথায় যাব? এইখানেই পড়ে থাকি, একটু তন্দ্রার মতন এসেছে। খানিক পরে ঢুলে ঢুলে ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ একটা যেন ক্যাঁচ করে শব্দ হল। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভয়েতে আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠ্ল।

বারান্দার ওপাশেই বুড়োর ঘর। সেদিকে নজর পড়তেই বল্‌বো কি বামুন ঠাক্‌রুণ, পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম বুড়ো ঘরের ভেতর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল! আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌তে যাচ্ছি, এমন সময় আর দেখ্‌তে পেলুম নি! আমি দৌড়ে একেবারে গিন্নীর কাছে গিয়ে পড়্‌লুম! সে তখনও ফুলে ফুলে কাঁদছে। একবার মনে কর্‌লুম, তাকে বলি; আবার ভাব্‌লুম থাক্‌, মনে কষ্ট পাবে। রঘুনাথকে বল্‌বো গয়ায় একটা পিণ্ডি দিয়ে আস্‌বে।"

বামুন ঠাক্‌রুণও নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া এই কাহিনী শুনিতে শুনিতে শিহরিয়া উঠিতেছিল। বলিল, "তা আর হবে না বামার মা! বুড়োর ছেলে-অন্ত প্রাণ ছিল। মায়া কি আর একেবারে কাটাতে পারে? আমার বাপের বাড়ীর পাশে মুখুযোদের বাড়ী ছিল। চণ্ডী মুখুয্যে যখন মরে তখন তার সত্তর বছর বয়স। তৃতীয় পক্ষের সোমত্ত মাগ রেখে ম'ল। রোজ রাত্রিতে এসে উপদ্রব কর্‌ত। ইট পাটকেল কত কি বাড়ীতে পড়্‌ত। দোষ পেয়ে মর্‌লেই না কি ঐ রকম হয়।"

বামার মা অৰ্দ্ধস্পষ্ট স্বরে "রাম রাম" বলিয়া উদ্দেশে হাত দুখানা জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল। এই সময়, "কি গো তোমাদের কি কথা হচ্ছে" বলিয়া দত্তগিন্নী গামছা কাঁধে দাঁতে ঘুঁটের ছাই ঘসিতে ঘসিতে উপস্থিত হইলেন।

দত্তগিন্নীকে দেখিয়াই বামার মা কথাটা চাপা দিয়া ফেলিল। বলিল, "এই মা সুশীলার কথা বল্‌ছিলুম। তোর বয়স হয়েছে। শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে একটি ছেলের মা হয়েছিস। তোর কি উচিত এই রকম মাকে ভাইকে ফেলে রেখে চলে যাওয়া? আহা, মুখে জল দেবার একটা লোক নেই। তা বলে কি—'তোমরা রয়েছ—বামার মা, তোমাদের চেয়ে আর আমি বেশী কি কর্‌ব?' হাজার হোক তুই তোর মাকে ভাইকে

যতটা যত্ন আত্তি করবি, আমরা কি ততটা করব! তা মা, আমরা হলুম বুড়ো হাবড়া। আমাদের কথায় কে কাণ দেয় বল?”

বামুন ঠাক্রুণ। আহা বোস-গিন্নীর দুঃখ দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়! অমন মেয়ে এই অবস্থায় একবার মুখের দিকে চাইলে না গা! সাধে কি আর বলে বিয়ে দিলেই ছেলে মেয়ে পর হয়ে যায়? এই সব দেখে মনে করি যে ভগবান ছেলেপুলে না দিয়েই ভাল করেছেন। দুঃখে সুখে পৈতে কেটে খাচ্ছি।

দত্ত গিন্নী। ধন্যি কিন্তু আমাদের মালতী। ওর আর বয়েস কি বল? এই বয়সে কত জ্ঞান বুদ্ধি। মাকে তুলে বসান, ভাইদের মুখে জল দেওয়া, সব একা কচ্চে। আহা বেঁচে থাক্।

বামার মা। আর শোননি। ওকেও যে নিয়ে যেতে ওর শ্বশুর এসেছে?

দত্তগিন্নী। ওমা, বল কি! লোকের কি চোখের চামড়া একটুও নেই। কোথায় তোরা এসে পড়ে দেখ্‌বি শুনবি, না এই সময় মেয়েটাকে পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে এসেছিস। কি বল্‌ব বল মা। কালে কালে কতই দেখছি। আমার বাবা যখন ম'ল, তখন আমার শ্বশুর শ্বাশুড়ী সবাই এসে পড়্‌ল। দেখা শোনা সবই তাঁদের হাত। শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে গেলে তার কতদিন পরে তবে তাঁরা যান।

বামার মা ও বামুন ঠাক্রুণ এ কথায় বড় একটা কাণ দিলেন না। কারণ তাঁহারা দত্তগিন্নীর শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে ভালরূপেই চিনিতেন। দত্তগিন্নী পিতার একমাত্র কন্যা। পিতার মৃত্যুর পর তাহার সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করিতেই যে দত্তগিন্নীর শ্বশুর শ্বাশুড়ী তাহার পিতৃগৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন ও সে কার্য্য সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত গট্ হইয়া সেখানে বসিয়াছিলেন সে বিষয় তাঁহাদের অবিদিত ছিল না। কাজেই দত্তগিন্নীর এই আত্মশ্লাঘায় তাঁহারা কোনও উত্তর করিলেন না।

দত্তগিন্নী তাহাতে রাগিয়া গেলেন। "পোড়াকপালীরা আমার হিংসায় মরে।" মনে মনে এই কথা বলিয়া গামছাখানার উপর নিজের রাগ ঝাড়িতে লাগিলেন। গামছা কাচার চোটে বামুন ঠাক্‌রুণ ও বামার মা আর অধিকক্ষণ নিকটে টিকিতে পারিলেন না। কারণ তাঁহাদের স্নান হইয়া গিয়াছিল। গামছার তাড়নে পুষ্করিণীর জল ছিটাইয়া উঠিতেছিল।

বামুন ঠাক্‌রুণ ও বামার মা চলিয়া গেলে দত্তগিন্নী একাই স্নান করিতে লাগিলেন।

স্নান করিতে করিতে দত্তগিন্নীর দৃষ্টি বসুদের খিড়কীর দ্বারের উপর পড়িল। দ্বার অর্দ্ধমুক্ত ছিল। দেখিলেন শচীন্দ্র ও মালতী দাঁড়াইয়া আছে। শচীন্দ্র এক হাত মালতীর কাঁধের উপর দিল। মালতী সে হাত ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। দত্তগিন্নী মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "মা গো, আজকালকার ছেলেরা সব কি বেহায়াই হয়েছে।"

ঘটনাটা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরূপ। মালতী যখন শুনিল যে তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য তাহার শ্বশুর ও তাহার স্বামী আসিয়াছেন ও তাহার মা তাহাকে পাঠাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তখন সে ঝিকে দিয়া চুপি চুপি শচীন্দ্রকে ডাকাইয়া পাঠাইল।

শচীন্দ্র আসিল। উপর বাড়ীর চারিদিকে লোক। নির্জ্জন বলিয়া মালতী খিড়কীর দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিল। শচীন্দ্র ম্লানমুখে আসিয়া ডাকিল, "মালতী।"

মালতী বলিল, "আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না।"

শচীন্দ্র। কেন মালতী?

মা। আমি গেলে আমার মাকে কে দেখবে? ভায়েদের কে দেখ্‌বে?

শ। তুমি না গেলে আমায় কে দেখ্‌বে মালতী?

মা। শোন। এ ঠাট্টার সময় নয়। তোমায় দেখ্‌বার লোকের ভাবনা নাই। কিন্তু আমি গেলে আমার মা বাঁচবে না। কাল থেকে কেউ তাঁকে খাওয়াতে পারে নি।

শচীন্দ্র বুঝিল। সে মালতীকে বড় ভালবাসিত। বলিল, "আমার কি করতে হবে?"

মা। তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বল যাতে আমার এখানে থাকা হয়।

শ। সে আমি পার্‌ব না। বাবার সামনে আমি এ কথা বল্‌তে পারব না।

মা। একি লজ্জার সময়? আমি মেয়েমানুষ হয়ে ঝিকে দিয়ে তোমায় ডাকালুম। আর তুমি একটা কথা বলতে পারবে না?

শ। তুমি ত আমায় জান মালতী। আমি বাবার সঙ্গে কখনও মুখ তুলে কথাই কহিতে পারি না। তার ওপর আবার একথা কি করে বলব?

মা। তোমায় বলতেই হবে। আমি ওসব ওজর শুনতে চাই না।

শ। আচ্ছা, আমি চেষ্টা কর্‌ব।

মা। চেষ্টা কর্‌ব নয়। তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে যাতে আমার যাওয়া না হয়, তা তুমি কর্‌বে?

শ। যে প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তে পার্‌ব কি না সন্দেহ, সে প্রতিজ্ঞা কেমন করে কর্‌ব মালতী?

মা। প্রতিজ্ঞা কর্‌বে না?

শ। শোন মালতী। এই বলিয়া শচীন্দ্র মালতীর কাঁধে হাত দিল। মালতী হাত ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "যাও!" এই বলিয়া দ্রুতবেগে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

শচীন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর স্থির করিল, যা হয় হোক্, একবার পিতাকে বলিয়া দেখিবে।

বাহিরে গিয়া দেখিল বৈঠকখানায় তাহার পিতা একাকী বসিয়া তামাক খাইতেছেন। শচীন্দ্র বুঝিল এই সুযোগ। তথাপি কিরূপে কথাটা পাড়িবে তাহা ঠিক করিতে পারিল না। বলিল, "দেড়টায় একখানা গাড়ী আছে। সেই খানায় যাবেন কি ?"

হৃদয়। সেটায় আর যাওয়া হয় কৈ ? আমরা চলে যেতে পার্‌তুম। বৌমাকে নিয়ে যেতে গেলে দেরী হবে না ?

এইবারই মুস্কিল। শচীন্দ্র বলিল, "আমরাই না হয় আগে যাই না ?"

হৃদয়। তা কি হয় ? যখন এসেছি, তখন একেবারে নিয়েই যাব। বৌমা আবার পরে কার সঙ্গে যাবে ?

শচীন্দ্রকে অগত্যা বলিতে হইল "এদের এখন রেখে গেলে হয় না ?"

হৃদয়। কেন ? কেন ? বৌমা কিছু বলেছেন নাকি ?

শচীন্দ্র বড় বিপদে পড়িল ! মালতীর অনুরোধে সে পিতাকে এ কথা বলিতে আসিয়াছে, তাহা কেমন করিয়া বলে ? অগত্যা বলিয়া ফেলিল "না। এখন এই বিপদ্। তাই বল্‌ছিলুম। কিছুদিন বাদেই না হয় যেত।"

হৃদয়বাবু একটু হাসিলেন। বুঝিলেন বধূ নিশ্চয় কিছু বলিয়াছে। নহিলে যে শচীন্দ্র মুখ তুলিয়া কথা কহে না, সে এতগুলি কথা বলিয়া ফেলিতে পারিত না। ভাবিলেন, ছেলেটার মাথা খেয়েছে !

মুখ হইতে রাশীকৃত তাম্রকূটধূম নির্গত করিয়া দিয়া বলিলেন, "বাপু হে, তোমাদের চেয়ে আমরা ঢের বেশী বুঝি। তোমাদের কিসে ভাল হয় মন্দ হয়, তা আমরা যতটা বুঝি তোমাদের ততটা বোঝবার সম্ভাবনা

নাই। তুমিও ছেলেমানুষ, বৌমাও ছেলেমানুষ, তোমাদের ভালর জন্যই এ ব্যবস্থা করছি।”

শচীন্দ্র আর কোনও কথা কহিতে পারিল না। মালতী জানিল না যে শচীন্দ্র তাহার অনুরোধ রক্ষার জন্য কি চেষ্টা করিয়াছিল।

যথাসময়ে পাল্কী আসিল। মালতী যাইবার সময় রঘুনাথকে বলিল, “দাদা, মাকে দেখ। মা বোধ হয় বাঁচবে না।” উমানাথকে বলিল, “দুষ্টুমি করিস্ নি। মাকে দাদাকে জ্বালাস নি।”

মাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া মালতী পাল্কীতে উঠিল। একটু কাঁদিল না। দত্তগিন্নী আসিয়াছিলেন। মনে মনে বলিলেন, “বাবা, আজকালকার মেয়েরা সব কি? একটু চোখে জল নেই গা?”

কিন্তু পাল্কীর ভিতরে বসিয়া মালতী আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। সে দুই হাতে চোখ মুছিয়া ও মুখে কাপড় গুঁজিয়া ক্রন্দন রোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সে বুকভাঙ্গা হাহাকার কি চাপিয়া রাখিবার?

পাল্কী ষ্টেশনে রওনা করিয়া দিয়া হৃদয়বাবু শচীন্দ্রকে বলিলেন, “আমি চলিলাম। তুমি বৌমার গহনার বাক্স সঙ্গে লইয়া আসিও।” মালতী যখন পাল্কীতে উঠে, তখন হৃদয়বাবু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলেন যে গহনার বাক্স তাহাতে দেওয়া হয় নাই। সেই জন্য রঘুনাথের সম্মুখে শচীন্দ্রকে ঐ কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

রঘুনাথ গহনার বাক্স আনিতে গেল। মাকে বলিল, কিন্তু চাবি পাওয়া গেল না। লোহার সিন্দুকের ভিতর মালতীর গহনার বাক্স ছিল। তাহার চাবি ও হাতবাক্সের চাবি একত্র এক গোছাতেই ছিল। সকাল হইতে তাহা পাওয়া যায় নাই।

চারিদিকে অনেক খোঁজ হইল। কিন্তু কোথাও চাবি মিলিল না।

শেষে রঘুনাথ শচীন্দ্রকে বলিল, "ভাই, তুমি আজ যাও। চাবিটা পাওয়া যাচ্ছে না। দিদি বোধ হয় কোথাও রেখে গেছেন। আমি এখনই জানবার জন্যে দক্ষিণেশ্বরে লোক পাঠাচ্ছি। কাল তোমাদের বাড়ী নিশ্চয় গহনার বাক্স পৌঁছে দেব।"

পিতা এ অবস্থায় গহনার বাক্সের জন্য এত পীড়াপীড়ি করায় শচীন্দ্র অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়াছিল। কিন্তু মনে মনে পিতার উপর অসন্তুষ্ট হইলেও মুখে কিছু বলিতে পারে না। রঘুনাথকে বলিল, "সে কি ভাই। সে কি কথা? সুবিধামত এক সময় দিলেই হবে?" এই বলিয়া, সে নিজেকে এই অপ্রীতিকর অবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া দ্রুতপদ-ক্ষেপে ষ্টেশনের দিকে চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"দারিদ্র্যাৎ পুরুষস্য বান্ধবজনো বাক্যে ন সংতিষ্ঠতে
সুস্নিগ্ধা বিমুখীভবন্তি সুহৃদঃ স্ফারীভবন্ত্যাপদঃ"

মৃচ্ছকটিকম্।

মালতী চলিয়া গেলে রঘুনাথ সেই দিনই দক্ষিণেশ্বরে তাহার দিদি সুশীলার নিকট চাবির সন্ধানের জন্য একজন লোক পাঠাইল। পরদিন সে লোক ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "দিদি বল্লেন,আমি ত রঘুনাথের সামনেই তাকের উপর চাবি রেখে দিয়েছিলুম। সেইখানেই দেখ্‌তে বলগে। আমি তার পর আর সে চাবি অন্য কোথাও সরিয়ে রাখি নি।"

আবার একবার তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত বাড়ীতে চাবির খোঁজ হইতে লাগিল। কিন্তু কোথাও চাবি পাওয়া গেল না। অবশেষে হতাশ হইয়া রঘুনাথ মিস্ত্রী ডাকাইয়া সিন্দুক খুলিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল।

দুইজন মিস্ত্রী তিন চার ঘণ্টা পরিশ্রমের পর সিন্দুকের ডালা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তাহার ভিতরে মালতীর গহনার বাক্স ছিল। রঘুনাথ স্থির করিল নিজেই সেই বাক্স লইয়া গিয়া হৃদয়বাবুকে দিয়া আসিবে ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহিত শ্রাদ্ধের বন্দোবস্ত বিষয়ে পরামর্শ করিয়া আসিবে।

হৃদয়বাবু অন্তঃপুরের এক কক্ষে খাটে শয়ন করিয়া তামাক খাইতে-ছিলেন, এমন সময় রঘুনাথ আসিয়াছে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। সেই

গৃহের কক্ষতলে একখানা আসন পাতিতে হুকুম দিয়া তিনি রঘুনাথকে সেইখানেই আনিতে বলিলেন। রঘুনাথ আসিল।

হৃদয়বাবু বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "এস, বাবা এস।"

র। এই মালতীর গহনার বাক্স এনেছি। সিন্ধুকের চাবি পাওয়া যায় নি। ডালা ভেঙ্গে বার করতে হ'ল।

হৃ। বাস্তবিক চাবিটা গেলই বা কোথা? গহনার বাক্সর চাবিটা কার কাছে?

র। মালতীর কাছেই আছে।

হৃ। ও ঝি—বৌমাকে এখানে পাঠিয়ে দে। বল তোমার দাদা এসেছে।

মালতী অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। রঘুনাথ বলিল, এই তোর গহনার বাক্স এনেছি।"

মা। চাবি?

র। চাবি তোর কাছে নেই?

মা। না। চাবি ত বাবার কাছে। বাবার রিংয়ে আমার বাক্সের চাবি ছিল।

হৃদয়বাবুর মুখ ক্রমশঃই গম্ভীর হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "তা হলে সে চাবি ত হারিয়েছে। এখন বাক্স খোলবার উপায়?"

র। এটাও তা হলে ভাঙ্গতে হবে। অন্য কোনও চাবি দিয়ে ত এ বাক্স খোলা যাবে না। এর বিলাতী কল। বাবা অনেক দেখে দেখে এটা কিনেছিলেন।

হৃদয়বাবুর মুখ আরও গম্ভীর হইল। তিনি তাহার খানসামা স্বরূপকে ডাকিলেন। তাঁহার হুকুমে সে ছেনী ও হাতুড়ি লইয়া আসিয়া কিছুক্ষণ চেষ্টার পর বাক্স খুলিয়া ফেলিল।

বাক্স একেবারে শূন্য। তাহার মধ্যে কোনও অলঙ্কারই নাই।

মালতী বলিয়া ফেলিল, "কই দাদা, গয়না ?"

র। তাইত এ কি ?

ক্রোধে হৃদয়বাবুর শরীর কাঁপিতেছিল। বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, "বৌমা, তোমার বাক্সের চাবি তুমি তোমার বাবাকে দিয়াছিলে কেন ?"

মালতী চুপ করিয়া রহিল।

হৃ। কথা কচ্ছ না যে ?

মালতী এবার মুখ তুলিল। বলিল, "বাবা চেয়ে নিয়েছিলেন।"

হৃ। কেন ?

মা। আমার একখানা গয়না বন্ধক দিবার জন্য।

হৃদয়বাবু ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিলেন, "তোমার গয়না বন্ধক কিরকম ?"

রঘুনাথ এ সব কথা কিছুই জানিত না। সে বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া মালতীর দিকে চাহিয়া রহিল।

মালতী স্থিরকণ্ঠে বলিল, "বাবা দু'বার আমার দু'খানা গয়না বন্ধক দেন। টাকার বিশেষ দরকার পড়েছিল। কিন্তু সে গয়না আবার ছাড়িয়ে এনেছিলেন।"

হৃদয়বাবুর সর্ব্বশরীর রাগে জ্বলিয়া গেল। বিছানা হইতে ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ছাড়িয়ে যে এনেছিলেন তা বুঝ্‌তে পাচ্ছি। একে একে সমস্ত গহনাগুলিই বিক্রমপুরে পাঠিয়েছেন। মেয়েকে যে জিনিস দান করেছেন তা নিতে লজ্জা করে না। ছোট-লোক—চামার।"

মালতী দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি নিজে দেখেছি বাবা গয়না ছাড়িয়ে এনে আমার বাক্সয় রেখেছেন।"

হৃদয়বাবু ধমক দিয়া বলিলেন, "তুমি চুপ্ কর। বাড়ীর ভেতর যাও। আমি আর কচি খোকাটি নই যে আমার চোখে ধুলো দেবে? এই জন্যেই চাবি হারিয়েছে বলে ধূয়ো তুলেছিলে বটে? বাক্স আজ এখনই না খোলালে ত দিব্যি ফাঁকি দিতে দেখ্‌ছি। জুচ্চুরি কর্‌তে লজ্জা করে না? মেয়ের গয়না বেচে বড়মানুষি করে গেছেন, আবার উপযুক্ত ছেলেও তেমনি আমার চোখে ধূলো দিতে এসেছেন। খুব কুটুম করেছিলুম যা' হোক্।"

রঘুনাথের মুখে কথা সরিতেছিল না। সে কি-ই বা বলিবে? এ সকল ঘটনার বিন্দুবিসর্গও সে জানিত না। অনেক চেষ্টা করিয়া বলিল, "আমি এর কিছুই জানি না।"

হৃদয়বাবু হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, "তা জান্‌বে কেন? এসব আমার কাজ, কেমন? ছোটলোকের ছেলে যেমন হয় তেমনি হয়েছ। ওসব চালাকি আর ক'র না। আমারও পষ্ট কথা শুনে যাও। যদি এই গয়নাগুলি দিতে পার ত এই বাড়ীতে ঢুকো, নহিলে আর এমুখো হ'য়ো না। আমি নিজে তোমার বাবার খাতায় দেখে এসেছি, গয়না যার যার কাছে বন্ধক আছে তাদের নাম লেখা আছে। যদি আমার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখ্‌তে চাও ত গয়নাগুলি খালাস করে দিয়ে যেও।"

এই বলিয়া হৃদয়বাবু ফট্‌ফট্ করিয়া চটিজুতার শব্দ করিতে করিতে সে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।

বাহিরে ঝি চাকরেরা দাঁড়াইয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছিল। দেউড়িতে পাঁড়েজীর নিকটও এ সংবাদ পৌঁছিয়াছিল। সেও উর্দ্ধগামী দাড়ী চুম্‌রাইতে চুম্‌রাইতে বলিতেছিল, "ক্যা তাজ্জব?"

সংসারে প্রবেশ করিয়া রঘুনাথের এই প্রথম পরীক্ষা। অপমানে তাহার চক্ষু দিয়া জল আসিতেছিল। সে ধীরে ধীরে উঠিল। একবার মনে করিল মালতীকে দুটো কথা বলিয়া যায়, আবার ভাবিল যদি দেখা করিতে না দেয়, যদি আবার অপমান করে? এই ভাবিয়া সে বাড়ী যাইবার জন্য উঠিল।

দুই এক পা গিয়াছে, এমন সময় পিছন হইতে কে ডাকিল, "দাদা।"

রঘুনাথ ফিরিয়া দেখিল মালতী। মালতীর মুখ সাদা হইয়া গিয়াছিল। রঘুনাথ ফিরিতেই বলিল, "ছি, কাঁদছ কেন? লোকে দেখে হাস্‌বে। চোখ্ মুছে ফেল। আর কখনও এ বাড়ীতে এস না। আমারও খোঁজ কর না। খবরদার। মনে ক'রো আমি মরেছি। যাও।"

এই বলিয়া মালতী রঘুনাথকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। পরে একটু থামিয়া বলিল, "আর মাকে—"; বলিতে বলিতে তাহার স্বর কাঁপিয়া গেল। বলিল—"আর মাকে—না, কিছু না। যাও।"

মালতী ঘোমটা টানিয়া দিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

রঘুনাথ ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল। চাকর-বাকরেরা আর আগেকার মত সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল না। দ্বার পার হইবার সময় পাঁড়েজী উঠিয়া দাঁড়াইল বটে, কিন্তু আগেকার মত সেলাম করিল না। রঘুনাথ সমস্ত দেখিল, কিন্তু এ সব ছোটখাট বিষয়ে তাহার আর লক্ষ্য ছিল না। তাহার শরীর মন সব অসাড় হইয়া গিয়াছিল। পা আর চলিতেছিল না। নিজের অপমানের কথা সে তত ভাবিতেছিল না, কেবল ভাবিতেছিল, মালতীর কি হইবে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"সুখাত্তু যো যাতি নরো দরিদ্রতাং
ধৃতঃ শরীরেণ মৃতঃ স জীবতি।"

মৃচ্ছকটিকম্।

শ্বশুরের মৃত্যুর পর গঙ্গাধর ঘোষ নীলমাধবের উপর বিশেষ প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন। নীলমাধবের বেতন বৃদ্ধি হইল। তাঁহার অপেক্ষা অধিকদিন কর্ম্ম করিতেছে, এমন তিন চারজন কর্ম্মচারীর উপর তিনি উঠিয়া গেলেন। মাহিনাও প্রায় দ্বিগুণ হইল।

ইহাতে আফিসের কর্ম্মচারিগণের সহিত তাঁহার আর সদ্ভাব রহিল না। সকলেই তাঁহাকে 'খোসামুদে' বলিয়া অন্তরালে অভিহিত করিত ও অন্যায়রূপে তাঁহার পদবৃদ্ধিতে ঈর্ষ্যায় জ্বলিতে থাকিত। তার উপর নীলমাধব আবার কাজকর্ম্মও ভালরূপ চালাইতে পারিতেন না। কারণ যে পদে তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার উপযুক্ত বিদ্যা তাঁহার ছিল না। কাজেই অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের দ্বারাই তিনি নিজ কাজ করাইয়া লইতেন ও সাহেবদের কাছে মান বজায় রাখিতেন। বড়বাবু সহায় ছিলেন বলিয়া আফিসের কোনও কর্ম্মচারী নীলমাধবের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার সাহস করিতে পারে নাই।

গঙ্গাধর বাবু এই সময় দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাস করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই নিমিত্ত কলিকাতার মধ্যে বাসোপযোগী একখানি বাড়ীও খুঁজিতে লাগিলেন। বহু বাড়ী দেখিয়া অবশেষে

শ্যামবাজার অঞ্চলে এক সুবৃহৎ ত্রিতল ভবন তাঁহার মনোনীত হইল। তিনি তাহা ক্রয় করিয়া সপরিবারে সেখানে উঠিয়া গেলেন।

কিছুদিন পরে একটা গুজব উঠিল যে গঙ্গাধর বাবু আফিসের চাকরি ছাড়িয়া দিতেছেন। প্রথমে সে কথাটা কেহ বিশ্বাস করিল না। অনেক দিনের চাকরি, হঠাৎ এমন করিয়া ছাড়িবেনই বা কেন? কিন্তু সত্য সত্যই একদিন যখন গঙ্গাধর বাবু বড় সাহেবের খাস-কামরায় ঘণ্টাখানেক থাকিয়া বাহির হইয়া বলিলেন, "আমি আগামী মাস থেকে চাকরিতে ইস্তফা দিলুম।" তখন আর কাহারও এ বিষয়ে সন্দেহ রহিল না।

যাইবার সময়ও গঙ্গাধর বাবু বড় সাহেবকে বলিয়া নীলমাধবের আরও পদবৃদ্ধি করিয়া দিলেন। নীলমাধবের মাসিক বেতন হইল ১৫০৲ টাকা।

আফিসের চাকরি পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাধর বাবু ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। চীনাবাজারে সুবৃহৎ এক ষ্টেশনারি দোকান ও এক ছাপাখানা খুলিলেন। বড় বড় সওদাগরদের আফিসে তাঁহার পরিচয় ছিল। সেই সব আফিসের সমস্ত ছাপানর কাজ তিনি একচেটিয়া করিয়া লইলেন, দোকানখানিও নিজে তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার বরাত ফিরিয়া গেল। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কলিকাতার ধনীসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চালও ফিরিয়া গেল। এখন জুড়ীগাড়ী নহিলে তাঁহার আর কোথাও যাওয়া হয় না। বাড়ীতে লোকজন, চাকর দরওয়ান। প্রতি রবিবারে বন্ধুবর্গের সমাগমে প্রীতিভোজ। গঙ্গাধর বাবুকে এখন আর দেখিলে চিনিতে পারা যায় না।

তাঁহার পত্নী সুশীলাসুন্দরীরও এই সময় বহু পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে তিনি তাঁহার গর্ব্ব তত প্রকাশ করিতে পারিতেন

না। কারণ তাঁহার স্বামী আফিসের বড়বাবুই হউন বা যাহাই হউন পল্লীগ্রামে বয়স্কা বা ব্রাহ্মণ কন্যাগণকে যথোচিত সম্মান অন্ততঃ বাহ্যিক-ভাবেও তাঁহাকে দেখাইতে হইত। কলিকাতায় সে সব বালাই রহিল না। পাড়ার দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যাগণ বরং এখন কিছু প্রত্যাশায় তাঁহার উপাসনা করে। তাহাদের মুখে "মা-ঠাকুরুণ" বুলি এবং নিজের রূপ, অর্থ ও ভাগ্যের প্রশংসা তাঁহার বড়ই মিষ্ট লাগিত।

তাঁহার পুত্র নীরেন্দ্রেরও বেশ বড়মানুষী চাল অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরে যে চাকরকে সে "রামদা" বলিয়া সম্বোধন করিত, এখানে পিতামাতার উপদেশে তাহাকে "রামা" বলিয়া ডাকে। রাম বহুদিনের পুরাতন লোক। গঙ্গাধরের বাল্যকাল হইতে সে আছে। গঙ্গাধরের সম্পদ্‌বৃদ্ধিতে তাহার সুবিধা কিছুই হয় নাই। কারণ এখন চাকর মনিবের মধ্যে অনেক ব্যবধান হইয়া গিয়াছে। চাকরদের জন্য পৃথক চাউল, পৃথক্ তরকারীর বন্দোবস্ত। অন্ধকার নীচের ঘরে বাস। হুকুম শোনা ভিন্ন মনিবের সহিত তাহাদের আর অন্য কোনও সম্পর্ক নাই।

এই উন্নতির দিনে একদিন গঙ্গাধর বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, এমন সময় রঘুনাথ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বসিল। আরও অনেক লোক সেখানে বসিয়াছিলেন।

রঘুনাথকে দেখিয়া গঙ্গাধর বাবু বিশেষ কোনও সমাদরের ভাব দেখাইলেন না। বড়মানুষী কেতা তাঁহার বেশ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। বড়মানুষী ধরণে উদাস ভাবে বলিলেন, "কিহে, সব ভাল ত?"

র। আজ্ঞে হাঁ।

গ। অনেকদিন তোমাদের কোনও খবর পাই নাই। কই, তোমরা ত আর খোঁজ খবর রাখ না?

রঘুনাথ মনে মনে ভাবিল, "আপনি ত বড় খোঁজ রাখেন। বাবার

মৃত্যুর পর হইতে আমরা বাঁচিয়া আছি কি মরিয়া গিয়াছি, আমার দিদিই সে খবর রাখেন না, তা আপনি? বাবার শ্রাদ্ধের দিনে পর্য্যন্ত একবার যান নাই।" কিন্তু এ সব কথা মনে উঠিলেও সে মুখে তাহা প্রকাশ করিল না। কারণ আজ সে যে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছে।

রঘুনাথকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া গঙ্গাধর বাবু বলিলেন, "তুমি এখন কি কচ্ছ?"

র। এইবারে ফোর্থ ইয়ারে উঠেছি। এই বৎসরে বি, এ, পরীক্ষা দোব।

গ। বেশ, বেশ। কোন্ কলেজে পড়্ছ?

র। আজ্ঞে। মেট্রপলিটানে।

গ। বাড়ী থেকেই যাতায়াত কর নাকি?

র। আজ্ঞে না। তা আর সুবিধা হয় না। আমাদের মার্টিন কোম্পানির রেলের অবস্থা ত জানেন। ওর উপর নির্ভর করে আর কলেজ করা যায় না। তা ছাড়া ৩।৪ ঘণ্টা ত আস্তেই লাগে।

গ। তাহলে আছ কোথা?

র। আজ্ঞে কলেজের মেসে আছি। আজকালকার নিয়মে যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকবার যো নাই। কলেজের মেসেই ছাত্রদের থাক্তে হয়।

গঙ্গাধর বাবুর স্কুল কলেজের সহিত সম্বন্ধ কোনকালেই বিশেষ ছিল না। রঘুনাথের মুখে এই কথা শুনিয়া ভাবিলেন, একটু আত্মীয়তা দেখান যাক্। বলিলেন, "তা আমার ত বাড়ী রয়েছে। এখানে এসে থাক্লেই পারতে। তা যখন কলেজের মেসে না হলে তোমাদের থাকতে দেবে না তখন আর কি করবে বল?"

র। আজ্ঞে, আপনার এখানে থাকতে কিছু বাধা নাই। অভি-

ভাবকের কাছেও থাকা চলে। আপনি আমার অভিভাবক হলে আমি এখানে থাক্‌তে পারি। আমি সেই জন্যই এখানে এসেছি। মেসের খরচ আর জুগিয়ে উঠ্‌তে পাচ্ছি না।

গঙ্গাধর বাবু বড় বিপদে পড়িলেন। ভাবিলেন, "কথাটা তুলে ত বড় ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখ্‌ছি।" কিন্তু অতগুলি ভদ্রলোকের সামনে নিজে প্রস্তাব করিয়া এখন আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না। বিশেষ আজকাল আবার তিনি হেথায় সেথায় চাঁদা দিয়া গরীবের উপর দয়া দেখাইয়া বড়মানুষী চাল দেখাইতেন। কাজেই মান বাঁচাইবার জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিতে হইল, "তা বেশ। তার আর কি ? থাকো না কেন। তুমি ত ঘরেরই ছেলে। কত বাইরের লোকে সাহায্য পায় আর তুমি দুটি খেতে পাবে না ?" এই বলিয়া যেন কি একটা মহৎ কাজ করিলেন, এই ভাবে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মুখের দিকে সগর্ব্বে চাহিয়া দেখিলেন।

পাড়ার গোবিন্দ সেখানে উপস্থিত ছিল। সে জাততে পরামাণিক। গঙ্গাধর বাবুর সম্পদ্‌বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে তাঁহার মোসাহেবের পদ অধিকার করিয়াছিল। সে রঘুনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তা আপনার কোনও কষ্ট হবে না। বুঝেছেন বাবু। বাবু আমাদের পাড়ায় কারোর কষ্ট দেখ্‌তে পারেন না। আপনি ত কুটুম্ব—শুধু কুটুম্ব নন—মহা কুটুম্ব।" এই বলিয়া গোবিন্দ হ্যা হ্যা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অপমানে রঘুনাথের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সেদিন আর নাই। এখন সে সবই সহ্য করিতে শিখিয়াছে। সে বলিল, "পরশু পয়লা। পরশু থেকেই আস্‌ব। এই মাসের মেসের পাওনাটা মিটিয়ে দোব।"

এই বলিয়া আবার নমস্কার করিয়া রঘুনাথ উঠিয়া যাইতেছিল, এমন সময় গঙ্গাধর বাবু কি জানি কি ভাবিয়া বলিলেন, "উঠ্‌লে যে। বাড়ীর ভেতর যাও না। ওরে সদা—"

"আজ্ঞে" বলিয়া বাবুর পেয়ারের ভৃত্য সদানন্দ হাজির হইল। তাহার মাথার টেরির বাহার দেখে কে?

গ। যা, বাবুকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যা। বল্‌গে যা খোকাবাবুর মামা এয়েছে।

সদানন্দ বড় সায়েস্তা চাকর। চট্‌ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া বলিল, "আজ্ঞে আসুন।" সে তখনও জানিতে পারে নাই যে রঘুনাথ আশ্রয়ের ভিখারী হইয়া তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

রঘুনাথ বাড়ীর ভিতর পৌঁছিয়া দেখিল, দালানে একখানি আসন পাতা রহিয়াছে। তাহার দিদি সুশীলাসুন্দরী দাঁড়াইয়া আছেন।

রঘুনাথ দিদিকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। সুশীলাসুন্দরী তাহাকে আসনের উপর বসিতে বলিলেন।

পিতৃবিয়োগের পর এই প্রথম ভ্রাতা ভগিনীতে সাক্ষাৎ। ইহার মধ্যে একবৎসর অতীত হইয়া গেছে। সেই একবৎসরের দুঃখকষ্টপূর্ণ দিনগুলির স্মৃতি রঘুনাথের মনে জাগিতে লাগিল। সে চুপ করিয়া রহিল।

সুশীলাসুন্দরী ভ্রাতার দিকে চাহিয়া রহিলেন। একবৎসর দেখা নাই। ইহার মধ্যে রঘুনাথের কি চেহারা হইয়া গিয়াছে! সেই সুন্দর সুঠাম মুখ, সেই হৃষ্টপুষ্ট দেহ আর নাই। বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে, দেহ কৃশ হইয়াছে। চুলগুলি রুক্ষ রুক্ষ। পায়ে তালি দেওয়া একজোড়া জুতা। গায়ে একটা পুরাতন সার্ট ও চাদর। পরিধানে একখানা আধময়লা কাপড়।

সুশীলাসুন্দরীর আগেকার কথা মনে পড়িতে লাগিল। বাবা বাঁচিয়া থাকিতে ভাইগুলিকে কতই না আদর করিতেন। একবার খেলিতে খেলিতে কাপড়ে কাঁটার খোঁচা লাগিয়া সামান্য একটু ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, সেই কাপড় পরিয়াছিল বলিয়া বাবা রঘুনাথকে কতই না তিরস্কার করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "আমি বেঁচে থাক্‌তে তোদের ছেঁড়া কাপড় পর্‌তে হবে না।" ভাল ভাল জুতা জামা দুই একমাস ব্যবহার করিয়া রঘুনাথ উমানাথ পল্লীবালকদের বিতরণ করিত। পিতা উৎসাহ দিতেন। সেই ভায়ের আজ এই বেশ!

সুশীলাসুন্দরীর হৃদয় করুণায় দ্রবীভূত হইয়া গেল। ভাইয়ের কাছে বসিয়া স্নেহময় স্বরে বলিল, "তোর চেহারা এমন হয়ে গেছে?"

সহানুভূতির স্বরে রঘুনাথের হৃদয় গলিয়া গেল। সুশীলাসুন্দরী যখন জিজ্ঞাসা করিল "মা কেমন আছে?" তখন রঘুনাথ আর থাকিতে পারিল না। গত বৎসরের দুঃখকষ্টের কাহিনী বাধা না মানিয়া তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সে কি দুঃখ কষ্ট তাহা রঘুনাথও সব জানিত না। রঘুনাথের মাতা, ধনীর গৃহিণী হইয়া এককালে যে সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছেন ও মুক্তহস্তে পাড়াপ্রতিবাসীদের দান করিয়াছেন, তিনিই শেষে পাল্কী করিয়া পাড়ায় কখনও বা গ্রামান্তরে যাইতেন। পাথরের থালা, বাটি গেলাস বা রূপার বাসন এক একখানা বেচিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন। মুখে বলিতে পারিতেন না যে এই জিনিসটা বেচিব। জিনিসটা অমনিই দান করিতেন। করিয়া বলিতেন, "আমায় কিছু টাকা আজ ধার দিতে পার?" যাহারা এককালে তাঁহার নিকট উপকার পাইয়াছিল তাহারাও এ সময়ে জিনিসগুলির ন্যায্য মূল্য প্রদান করিত না। গৃহিণীও কিছু বলিতে পারিতেন না। যে যাহা দিত তাহাই লইয়া চলিয়া আসিতেন।

এইরূপে দুই পুত্রের লেখাপড়া শিক্ষা ও গ্রাসাচ্ছাদন চলিতেছিল। গৃহিণী নিজেই রন্ধন করিতেন, নিজেই ঘর ঝাঁট দিতেন, বাসন মাজিতেন। দ্বিপ্রহরে ঐরূপ অর্থ সংগ্রহে বহির্গত হইতেন।

অবশেষে মূল্যবান আসবাব একে একে প্রায় সমস্তই বিক্রয় হইয়া গেল। পাল্কীভাড়া দিবারও আর পয়সা জুটে না! তখন সেই ধনী-গৃহের কুলবধূ থান কাপড়খানি পরিয়া অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া সঙ্কুচিত ভাবে পদব্রজেই পথে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। যেদিন কোথাও কিছু মিলিত না, সেদিন বাড়ীতে আসিয়া ভূতলে পড়িয়া কাঁদিতেন। বলিতেন, "হরি! আর কেন আমায় রেখেছ? এখনও কি আমার ভোগ শেষ হয় নাই?"

যে পুত্রদ্বয়কে সম্পদের সময় দশ বার রকম ব্যঞ্জনসহ নিত্য খাওয়াইতেন, এই দুঃখের দিনে তাহাদের পাতে একটা তরকারী ও ডাল দিতে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইত। রঘুনাথ বুঝিত, সে বাহ্যিক উৎসাহ দেখাইয়া খাইয়া লইত। বলিত "বাঃ, আজ মোচার ঘণ্টটা ত' চমৎকার হয়েছে।" আগে এই প্রশংসায় গৃহিণীর কত আহ্লাদ হইত। এখন কিন্তু এইরূপ কথা শুনিলেই তাঁহার ভয় হইত, যদি আর একটু চাহিয়া ব'সে। নিজের জন্য ও কণামাত্র না রাখিয়া তিনি সমস্ত তরকারী পুত্রদ্বয়কে পরিবেশন করিয়া দিতেন। নিজে সাহস করিয়া কোন দিন বলিতে পারিতেন না, "আর একটু দোব কি?"

উমানাথ কিন্তু ওসব বুঝিত না। লেখাপড়ায় বরাবরই তাহার মনোযোগ কম ছিল। পিতার মৃত্যুতে ও ভ্রাতা বিদেশবাসী হওয়াতে তাহার খুব সুবিধাই হইয়াছিল। পাড়ার একটা "স্বদেশী সমিতি" করিয়া লাঠিখেলা শিখিতেছিল। একটা কুস্তীর আখ্‌ড়াও বসিয়াছিল। সেখানে বহুবিধ ব্যায়াম ও কুস্তী অভ্যাস হইত। পাড়ার যুবকেরা

ইহাতে যোগ দিয়াছিল। অবশ্য ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই চলিত-ভাষায় 'বয়াটে' বলিয়া অভিহিত হইত। ব্যায়ামে পরিপুষ্টদেহ উমানাথ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আসিয়া সংসারের দুঃখ কষ্টের বিষয় ভাবিতে পারিত না। "আরও দাও" "আরও দাও" বলিতে থাকিত। এক একদিন তাহার জননী নিজের সমস্ত অন্ন তাহাকে দিয়া যে অনাহারে থাকিতেন, তাহাও সে জানিতে পারিত না।

এইরূপে রঘুনাথদের সংসার চলিতেছিল। দুর্গাপূজার সময় রঘুনাথের পিতা মোদককে ফরমাস দিয়া বৃহদাকারের মিষ্টান্ন প্রস্তুত করাইতেন। গ্রামস্থ বালক, যুবক সকলেই তাহা লইতে রঘুনাথদের বাড়ী সমবেত হইত। সে কি বিপুল আনন্দ! নিয়ম ছিল, একটা গোটা বৃহদাকারের মিষ্টান্ন শেষ করিয়া যে দ্বিতীয় একটা খাইতে আরম্ভ করিতে পারিবে সে চারিটা সন্দেশ বকৃশিশ্ পাইবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অধিক সন্দেশ পাইবার লোভে প্রাণপণে খাইতে থাকিত। যাহারা দাঁড়াইয়া দেখিত তাহারা হাসিতে হাসিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িত।

আর এখন মিষ্টান্ন কাহাকে বলে তাহা রঘুনাথ উমানাথ একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছে। রঘুনাথ কলিকাতার মেসেই দিন কাটাইত। অতি কষ্টে একটা প্রাইভেট টিউসনি করিয়া মেসের মাসিক খরচ দিত। দিনের মধ্যে মেসের দুবেলা বরাদ্দ আহার ব্যতীত তাহার আর জলখাবার পয়সা জুটিত না। যে দিন অতিশয় ক্ষুধা পাইত, এক পয়সার শুক্‌না চিঁড়া খাইয়া এক গ্লাস জল খাইত। তাহাতে অনেকক্ষণ পেটটা ভার হইয়া থাকিত।

উৎকণ্ঠায়, দুঃখে কষ্টে, ভাবনায় রঘুনাথের লাবণ্য শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। একটা অবসাদ ও ক্লান্তির ভাব তাহার মুখে অঙ্কিত

হইয়া গিয়াছিল। যদিও এই তাহার তরুণ বয়স, তবু তাহার আর আশার মোহন স্বপন দেখা হইত না। বরং যতই ভবিষ্যৎ ভাবিত, ততই তাহার নিঃসহায় নিরুপায় অবস্থা স্পষ্টরূপে মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিত। সর্ব্বদাই তাহার কাণে কাণে কে যেন বলিত, "উপায় নাই।" "উপায় নাই।"

সুশীলাসুন্দরী কতক ভ্রাতার কথায়, কতক বা আভাসে তাহাদের অবস্থা বুঝিলেন। তাঁহার গর্ব্বিত অন্তঃকরণ করুণায় দ্রবীভূত হইয়া গেল। বলিলেন, "তুই থাক্ এখানে। তোর কোনও কষ্ট হবে না।"

রঘুনাথ ভাবিল, এতদিনে বুঝি ভগবান একটা আশ্রয় মিলাইয়া দিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী
যজ্জীবতি তন্মরণম্।"

হিতোপদেশঃ।

মাস শেষ হইলে রঘুনাথ গঙ্গাধর বাবুর বাড়ীতে উঠিয়া আসিল। তাহার অবস্থানের জন্য গঙ্গাধর বাবু একতলায় সরকারদের দপ্তরখানার পার্শ্বে একটা ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। সুশীলাসুন্দরী ভ্রাতার শয়নের জন্য দ্বিতলের একটা ঘর পছন্দ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু অতটা বাড়াবাড়ি গঙ্গাধর বাবুর ভাল লাগিল না। তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া রঘুনাথও বলিল, "বেশ আছি দিদি নীচের তলায়। উপরে গোলমাল। নীচে কোনও হ্যাঙ্গাম নাই।"

হ্যাঙ্গাম কিন্তু বিলক্ষণই ছিল। পাশের ঘরে সরকার আমলাদের কলরব, কোলাহল, আস্ফালন, ডাবা হুঁকার ভড়্ ভড়্ শব্দ, চাকরদের তিরস্কার, বাজারের ফর্দ্দ লইয়া বিতণ্ডা, সন্ধ্যার পর তাস পেটার পটাপট্ শব্দ, "ছক্কা" "বোম্" রবে ঘরগুলি কাঁপিতে থাকিত। রঘুনাথ এই গোলমাল উপেক্ষা করিয়া তক্তাপোষের উপর বসিয়া কেরোসিনের আলোকে পুস্তকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অধ্যয়ন করিবার প্রয়াস পাইত। সে এখন সকলই সহিতে শিখিয়াছে।

কিন্তু এ সুবিধাও তাহার অধিকদিন রহিল না। একদিন সকালবেলা গঙ্গাধর বাবু তাহাকে ডাকাইলেন। রঘুনাথ তাড়াতাড়ি

উপস্থিত হইলে বলিলেন, "ওহে নীরেনের মাষ্টারটা ত কিছু করে না দিলুম ওটাকে' তাড়িয়ে। একটা ভাল মাষ্টার খুঁজছি। যতদিন না পাই তুমি এক একবার ছেলেটাকে নিয়ে সকালবেলা বোস'। পড়া শুনার অভ্যাসটা যাতে থাকে, নইলে সব ভুলে যাবে। সকালবেলা তুমি ওপরে নীরেনের ঘরেই বোস'!" তাঁহার ছেলে যে একতলায় রঘুনাথের ঘরে যাইবে তাহা কল্পনা করাই অসম্ভব।

সেইদিন হইতে রঘুনাথের সকালবেলা পড়াশুনা একরকম বন্ধ হইয়া গেল। নীরেন্দ্র বড় সোজা ছেলে নয়। কলিকাতার পেশাদার প্রাইভেট টিউটররাও তাহাকে শাসন করিতে অপারগ হইয়া একে একে বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছে। রঘুনাথ একটু ধমক ধামক দিবার চেষ্টা করিতেই চোখ, রাঙ্গাইয়া বেশ দুই চার কথা শুনাইয়া দিল। রঘুনাথ দেখিল উভয় সঙ্কট। তখন নীরেন্দ্র বলিল, "দেখুন, আমার পড়া যা হবে তা' ত বুঝ্‌তেই পাচ্ছেন। আপনি বই নিয়ে নিজের পড়া করুন।"

রঘুনাথ বলিল, "তোমার বাবা কি বল্‌বেন?"

নী। সে ভাবনা আপনাকে কর্ত্তে হবে না। সে আমি ঠিক করে নোব।

এই বন্দোবস্তের পর নূতন ভাবে নীরেন্দ্রের পড়া হইতে লাগিল। গঙ্গাধর বাবু বেলা ৮ টার সময় চা খাইয়া ত্রিতল হইতে একতলার বৈঠকখানায় নামিয়া আসিতেন। তাঁহার আসিবার পথ নীরেন্দ্রের পড়িবার ঘরের সম্মুখ দিয়া। নীরেন্দ্রের পড়িবার সময় সাতটা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু আটটার কিছু পূর্ব্বে নীরেন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইত, সে চোখ্‌ রগড়াইতে রগড়াইতে পড়িবার ঘরে আসিয়া দেখিত, রঘুনাথ নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিতেছে। নীরেন্দ্রও একখানা

বই খুলিয়া বসিত। ত্রিতলের সিঁড়িতে তাহার পিতার পদশব্দ পাইলেই উচ্চৈঃস্বরে জ্যামিতি বা ভূগোল বা অন্য কিছু একখানা বই আবৃত্তি করিতে থাকিত। পিতা নীচের তলে পৌঁছিলেই, বই ফেলিয়া নীরেন্দ্র ত্রিতলে চলিয়া যাইত।

রঘুনাথকে কলেজে যাইতে হইত, কাজেই সকাল সকাল তাহার ভাত না হইলে চলিত না। গঙ্গাধর বাবু অনেক বেলায় আহার করিতেন। পাচকও ভাল ভাল তরকারী এগারটার পূর্ব্বে রন্ধনই করিত না। চাকরদের একটা তরকারী বা ডাল মাত্র রঘুনাথ খাইতে পাইত। নীরেন্দ্রের জন্য একটু বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। দুখানা মাছভাজা বা দুধ সে পাইত কিন্তু রঘুনাথের অদৃষ্টে তাহা জুটিত না। গঙ্গাধর বাবু বড় হিসাবী লোক ছিলেন। সে হিসাব চক্র ভেদ করিয়া ভ্রাতার জন্য অধিক কিছু বন্দোবস্ত করিবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহা সুশীলাসুন্দরীর অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল।

আহারের ক্লেশ রঘুনাথ গ্রাহ্য করিত না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যে সকল অপমানসূচক বাক্যবাণে তাহাকে জর্জ্জরিত হইতে হইত, তাহাতে সে অস্থির হইয়া পড়িত। এক রবিবারের রাত্রিতে বিরাট ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। গঙ্গাধর বাবু কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আহারে বসিলে পরিবেশনের অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া গঙ্গাধর বাবু রঘুনাথকে বলিলেন, "ওহে, দু' চারটে জিনিষ দিয়ে দাও না। ভদ্রলোকেরা সব ব'সে রয়েছেন।" রঘুনাথ দ্বিরুক্তি না করিয়া থালা হস্তে পরিবেশনে প্রবৃত্ত হইল। তাহাকে দেখিয়া একজন বলিলেন, "এটি আবার নূতন আমদানী দেখ্‌ছি যে।" তাঁহারা ধনী, বেতনভোগী পাচক ভিন্ন অন্য কেহ যে পরিবেশন করিতে পারে, সে ধারণাও তাঁহাদের ছিল না।

গোবিন্দ অমনি বলিয়া উঠিল, "হ্যা—হ্যা—চেনেন না এঁকে? ইনি বাবুর মহা-কুটুম্ব মহা-কুটুম্ব। শ্যালক মহাশয়।"

বাবুটি গম্ভীরভাবে রঘুনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বটে!"

গঙ্গাধর বলিলেন, "আর বলেন কেন? বসন্ত এলেই কোকিল আসে, ভ্রমর জুটে। ওদের যে অবস্থা। থাকতে খেতে পর্য্যন্ত পায় না। এ রকম দেখে আর কি করে চুপ করে থাকা যায়? এইখানেই এনে রেখেছি। এখান থেকেই কলেজে যাচ্ছে।"

গোবিন্দ বলিল, "আহা, বাবুর আমাদের যে দয়ার শরীর, পাড়াশুদ্ধ কে না বাবুর অন্ন খাচ্ছে? তা আপনার লোক দুটো পাবে না?"

রঘুনাথ ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া জল আসিতেছিল। কিন্তু নিভৃতে যাইবার অবসরও সে পাইল না। গঙ্গাধর বাবু অনবরত 'রঘুনাথ, দই আন হে। সব বসে রয়েছেন যে? পানতুয়া কই? একটু হাত চালিয়ে নাও" মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এইরূপ আদেশ প্রচার করিতেছিলেন। রঘুনাথের সর্ব্বংসহ প্রকৃতিও এইবার যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

কিন্তু সেই সবে আরম্ভ মাত্র। ক্রমশঃ বাড়ীর যত ফায় ফরমাস সমস্তই রঘুনাথের উপর আসিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি আহারাদি করিয়া বই লইয়া রঘুনাথ কলেজে বাহির হইতেছে, এমন সময় গঙ্গাধর বাবু তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে, সরকার মহাশয়ের বড় অসুখ। আগে একবার কবিরাজকে ডেকে এনে দাও। তারপর কলেজ যেও।" ডাক্তারি ঔষধে বেশী খরচ বলিয়া ভৃত্য ও কর্ম্মচারীবর্গের জন্য কবিরাজী চিকিৎসার বন্দোবস্ত ছিল। কবিরাজ মাসে দশ টাকা করিয়া পাইতেন। ইহাতেই তাঁহার দর্শনী ও ঔষধের মূল্য কুলাইয়া

লইতে হইত। আর কবিরাজও তিনি তেমনি ধরণের। কাজেই এই নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি তাঁহার পক্ষে পরম মঙ্গলকর হইয়াছিল।

রঘুনাথ বই ফেলিয়া কবিরাজ ডাকিতে দৌড়িল। সেদিন প্রথম ঘণ্টায় সে আর কলেজে উপস্থিত হইতে পারিল না।

এইরূপে ক্রমশঃ "এটা কিনে এনে দাও," "ওটা কিনে এনে দাও," "একবার বাজারে যাও হে, আজ জনকতক ভদ্রলোক খাবেন, চাকররা ত পছন্দ করে আনতে পারবে না" প্রভৃতি হুকুম রুজু হইতে লাগিল। রঘুনাথ প্রমাদ গণিল। একে ত শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ, তাহার উপর যে জন্য সে এত কষ্ট সহিতেছিল, সেই লেখাপড়াও যখন বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, তখন সে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল।

কলিকাতায় তখন ছেলেধরার হুজুগ হইয়াছে। অল্প বয়স্ক বালক ও যুবককে সব ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, সকলের মুখেই এই একই কথা। কেহ বলে চা-বাগানে কুলির অভাব হইয়াছে তাই জোর করিয়া লোক ধরিয়া পাঠাইতেছে। কেহ বলে, পদ্মার উপর বিরাট সেতু হইবে, সেখানে সহস্র নরবলির প্রয়োজন। এইরূপ বহু প্রকার অদ্ভুত গুজবে নিম্নশ্রেণীর অধিবাসিগণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে সম্ভ্রান্ত বংশের কোন বালক বা যুবক উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র হইয়া কিছুদিন নিরুদ্দেশ হইলে তাহাকে ছেলেধরায় লইয়া গিয়াছে বলিয়া পুলিশে খবর দেওয়া হইতে লাগিল। রেল ষ্টেশন, ষ্টীমারের জেটি সর্ব্বত্র গোয়েন্দা ঘুরিতে লাগিল। হুজুগ ক্রমশঃ এতদূর বৃদ্ধি হইল যে একটু রাত্রি হইলে লোকে রাস্তায় বাহির হইতে ইতস্ততঃ করিত। নিরীহ পণ্ডিতমণ্ডলী প্রাইভেট টিউশনি করিয়া ফিরিতে রাত্রি হইলে ছাতা খুলিয়া কাঁধের উপর পিছন দিকে হেলাইয়া ধরিতেন যাহাতে পিছন হইতে সহসা কেহ চোখ বাঁধিয়া ফেলিতে না পারে।

এই হুজুগের সময় একদিন গঙ্গাধর বাবু রঘুনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে, কাল নীরেনদের ইস্কুলের মাষ্টারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি বল্লেন, নীরেন ত প্রায় মাসখানেক হ'ল ইস্কুলে যায় নাই। ব্যাপার কি বল দেখি? রোজ গাড়ী করে স্কুলে পাঠিয়ে দিই, যায়ই বা কোথা? তুমি আজ সঙ্গে করে ওকে স্কুলে দিয়ে এস।"

রঘুনাথ দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না। গাড়ী আসিল। রঘুনাথ ও নীরেন্দ্র গাড়ীতে উঠিল। নীরেন্দ্র বলিল, "আপনি কলেজে যান। মিছে কেন গোলমাল বাড়াবেন। আমি ইস্কুলে যাব না।"

রঘুনাথ বলিল, "আমি তোমার বাবাকে বলে এসেছি। তোমাকে স্কুলে পৌঁছে না দিয়ে যেতে পারব না।"

নীরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। গাড়ী চলিতে লাগিল। নীরেন্দ্র বলিল, "গাড়ীটা একবার থামাতে বলুন, একটা পেন্‌সিল্ কিনে নিই।"

রঘুনাথ গাড়োয়ানকে গাড়ী থামাইতে বলিল। গাড়ী থামিল। নীরেন্দ্র নামিয়া খানিকটা হাঁটিয়া গিয়া একটা দোকানে দাঁড়াইয়া পেন্‌সিল্ কিনিল। গাড়ীখানা আস্তে আস্তে পথে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল।

নীরেন্দ্রের পেন্‌সিল্ কেনা আর শেষ হয় না। রঘুনাথ নামিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "এস।"

হাত ধরিবামাত্রই নীরেন্দ্র ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল ও ঝাঁকি দিয়া হাত ছাড়াইয়া দৌড়িয়া গিয়া একটা গ্যাসের থাম জড়াইয়া ধরিল। রঘুনাথও দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া যেমন গাড়ীতে তুলিতে যাইবে, অমনি চারিদিকে একটা ভীষণ রব উঠিল "ছেলেধরা।

ছেলেধরা।” শত শত লোক জমা হইয়া গেল। দোকানদার, মুটে, মজুর, পথিক যে যেখানে ছিল দৌড়িয়া আসিল। ছাতা, লাঠি, কাষ্ঠখণ্ড যে যাহা দিয়া পারিল রঘুনাথকে প্রহার করিতে লাগিল। নিকটে কয়েকজন মুসলমান দপ্তরীর দোকান ছিল। তাহারাও লাঠি লইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। শেষে রাগটা গাড়ীর সহিস কোচমানের উপরও গিয়া পড়িল। তাহারা বেগতিক বুঝিয়া লাফাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। সহিস পলাইল বটে, কিন্তু কোচম্যান দপ্তরীদের লাঠির আঘাতে ধরাশায়ী হইল। ব্যাপারটা যে কি তাহা আর কাহারও বুঝিবার ধৈর্য্য ছিল না। গাড়ীখানা হইতে ঘোড়া খুলিয়া দিল। ঘোড়া ছুটিয়া কোথায় চলিয়া গেল। গাড়ীখানাকে পর্যান্ত ভাঙ্গিয়া কেরোসিন তৈল দিয়া দিনের বেলায় কলিকাতার প্রকাশ্য রাস্তায় সমবেত জনতা ভস্মীভূত করিয়া দিল।

জনতার ক্রোধ যখন প্রকাশের উপযুক্ত পাত্র না পাইয়া ইন্ধনহীন অগ্নির ন্যায় নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, তখন চিরন্তন প্রথামত যষ্টি-রুলধারী পাহারাওয়ালাগণ মৃদুমন্দ গতিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। দুইজন সাহেব ইন্‌স্‌পেক্টরও আসিলেন। দুর্বৃত্তেরা তখন সকলেই সরিয়া পড়িয়াছে। নিরীহ পথচারী দুই চার জন ধৃত হইয়া থানায় নীত হইল।

তবে পুলিশ আসাতে রঘুনাথের একটা উপায় হইল। ফুটপাথের উপর তাহার সংজ্ঞা-হীন দেহ পতিত ছিল। সর্ব্বাগ্রে ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব তাহাকে ও কোচম্যানকে মেডিকেল কলেজের হাঁসপাতালে প্রেরণ করিলেন।

রঘুনাথের সেদিন আর জ্ঞান হইল না। পরদিন প্রায় দ্বিপ্রহরে সে চোখ মেলিল। মাথায় দারুণ যন্ত্রণা। অতি কষ্টে হাঁসপাতালের

শুশ্রূষাকারিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার তত্ত্ব লইতে কেহ আসিয়াছিল কি ?"

শুশ্রূষাকারিণী বলিল, "না ।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"কো নাম পাকাভিমুখস্য জন্তো-
র্দ্বারাণি দৈবস্য পিধাতুমীষ্টে ?"

উত্তররামচরিতম্।

সেবারে ইংরাজীবর্ষের প্রথমদিনে গড়ের মাঠে প্যারেড্ দেখিবার জন্য বহুলোক সমবেত হইয়াছিল। সহরবাসী কেহ বা রাত্রি চারিটা কেহবা পাঁচটার সময় উঠিয়া হাঁটিয়া ময়দানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন, বাঙ্গালী, উড়িয়া, মাড়োয়ারি, নেপালী,—কত রকম ধর্ম্মাবলম্বী, কত রকম জাতি ঠাঁসাঠাসি গাদাগাদি করিয়া মাঠের চারিদিকে দাঁড়াইয়াছিল। ধাক্কাধাক্কি ঠেলাঠেলি খুব হইতেছিল, সকলের চেষ্টা সম্মুখে দাঁড়াইবে।

মফঃস্বল হইতেও বহু লোক আসিয়াছিল। বড়দিনের ছুটিতে সার্কাস থিয়েটার দেখিতে, জিনিষপত্র খরিদ করিতে, কেহ বা বাবুয়ানি করিতে সহরে আসিয়া জুটিয়াছিল। দোকানদারগণ এই সুযোগে অনেক রঙ্গচঙ্গে খেলো-জিনিষ বহুমূল্যে বিক্রয় করিয়া দু'পয়সা রোজগার করিতেছিল। হাত ও গলায় রঙ্গিন ছিট্, বাকিটা সাদা লংক্লথ—এরূপ জামা, সৌখিন গিল্টীর চশমা, চকচকে সুতার মোজা, জাপানী রুমাল অসংখ্য বিক্রয় হইতেছিল। এই অল্প কয়েকদিন কলিকাতার আবহাওয়ায় থাকিয়া মফঃস্বলবাসিগণ নূতন ফাসন অনুকরণ করিবার

জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল। দেশে গিয়া যাহাতে সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতে পারে, সকলের মনেই সেই বাসনা বিদ্যমান।

মেদিনীপুর জেলা হইতে এক মোক্তার তাঁহার গ্রামস্থ জনকতক লোকের মুরুব্বিস্বরূপ হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি সেই সব কাণঢাকা টুপির উপর কম্ফর্টারশোভিত মস্তক, জর্ম্মণীর প্রস্তুত র‍্যাপারে আবৃতদেহ মফঃস্বলবাহিনীকে সঞ্চালন করিতেছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কোট পেণ্টুলুন পরিলে সকলেই খাতির করিবে। এই বিশ্বাসে একটা সাদা জিনের পেণ্টুলুন ও একটা কাল কোট পরিয়া মাথায় একটা নাইট ক্যাপ দিয়া গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ও সগর্ব্বে এদিক ওদিক চাহিতেছিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশ মত তাঁহার দেশবাসিগণ এদিক ওদিকে দাঁড়াইতেছিল।

মোক্তার মহাশয় সম্মুখের পংক্তিতেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। সহসা একটা গোল উঠিল। খুব ঠেলাঠেলি হইতে লাগিল। মোক্তার মহাশয় চাহিয়া দেখিলেন, কয়েকজন কনেষ্টবল প্যারেডের স্থান করিবার জন্য বেত্রাঘাতে জনতাকে পিছাইয়া দিতেছে! সপাসপ করিয়া বেত পড়িতেছে ও হুড়মুড় করিয়া জনতা পিছাইয়া যাইতেছে। পিছনে কে আছে বা কে কাহার ঘাড়ে পড়িতেছে, তাহা আর কাহারও দেখিবার অবকাশ থাকিতেছে না। দেখিতে দেখিতে একজন কনেষ্টবল মোক্তার মহাশয় যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। মোক্তার মহাশয় কোট পেণ্টুলুনের অমোঘ কবচে নিজেকে নিরাপদ মনে করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সপাৎ করিয়া তাঁহারই উপর বেত্রাঘাত পড়িল। অমনি তাঁহার গ্রামবাসিগণ সভয়ে "আরে দেখিস্ দেখিস্" বলিয়া হুড়মুড় করিয়া দশ পনর হাত পিছাইয়া পড়িল। মোক্তার মহাশয় সেই গোলযোগে নিজ অপমান

লুকাইবার জন্য জনতার ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন ও পিছন দিক দিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির ঠেলাঠেলির পর জনতার পিছনে আসিয়া দেখেন সে দিক দিয়া যে বাসায় ফিরিয়া যাইবেন তাহারও উপায় নাই। পিছনেও জনকতক কনেষ্টবল অনবরত বেত্র সঞ্চালনে জনতাকে সম্মুখ দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। পিছনে রাস্তা, তথায় অসংখ্য গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। পাছে লোকে গাড়ীচাপা পড়ে এই জন্যই এ ব্যবস্থা। মোক্তার মহাশয় তখন গলদঘর্ম্ম কলেবরে কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। সামনে দাঁড়াইলে বেত খাইতে হয়, পিছনেও তাই, ফিরিয়া যাইবারও উপায় নাই। অবশেষে যুক্তি করিয়া মোক্তার মহাশয় মাঝখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহাতে বেত্রাঘাত হইতে রক্ষা পাইলেন বটে; কিন্তু একবার পিছন হইতে ধাক্কা খাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, আবার সামনে হইতে ধাক্কা খাইয়া পিছাইতে লাগিলেন। যোড়াসাঁকো হইতে পূর্ব্বদিনে ক্রীত নূতন কোটটি জনতার ঠেলায় চড়্‌চড়্‌ করিয়া উঠিতে লাগিল। সে ভীষণ ঠেলার বেগ সহ্য করা যোড়াসাঁকোর কলের সেলাইয়ের ক্ষমতা নহে। মোক্তার মহাশয় কোটের মায়া ছাড়িয়া দিয়া টুপিটি হাতে করিয়া তরঙ্গতাড়িত তৃণগুচ্ছবৎ সঞ্চালিত হইতে লাগিলেন।

হঠাৎ একটা ভীষণ গোলযোগ উপস্থিত হইল। একজন শিখ কনেষ্টবল অশ্বারোহণে জনতার মধ্য দিয়া পথ করিয়া আসিতেছিল। শিক্ষিত অশ্ব কাহাকেও পদদলিত করে না, কিন্তু ঘোড়া দেখিয়াই ভয়ে কে কোথায় যে ঠিকরিয়া পড়িতেছিল, তাহার ঠিক নাই। কাহারও হাতে, কাহারও পায়ে, কাহারও মাথায় আঘাত লাগিতেছিল। কাহারও ছাতি কাহারও মাথায় লাগিল, কাহারও লাঠীর খোঁচা কাহারও পেটে লাগিল, কাহারও নগ্নপদ কাহারও জুতার পেষণে ক্ষতবিক্ষত হইয়া

গেল। মোক্তার মহাশয় প্রমাদ গণিলেন; অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি মুস্কিল! সামনে চাবুক, পিছনে চাবুক, মাঝখানে ঘোড়া।" প্রবল ঝাঁকিতে তাঁহার নূতন কোটটি পাঁচ ছয় জায়গায় ফাটিয়া গেল। হস্তে ধৃত টুপিটিও জনতার পেষণে অপরূপ আকার ধারণ করিল।

গ্রামবাসী এক বৃদ্ধ একটি ছোট ছেলে ও মেয়ে লইয়া তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল। কিন্তু সেই ভীষণ জনতার মধ্যে পড়িয়া তাহার তামাসা দেখার সখ বহুপূর্ব্বেই মিটিয়া গিয়াছিল, এখন কেবল ভাবিতেছিল, কিরূপে ছেলে মেয়ে দুইটিকে নিরাপদে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু তাহার চীৎকার, কাকুতিমিনতিতে কেহই কর্ণপাত করিতেছিল না। সকলেই নিজের দেখিবার সুবিধার জন্য সচেষ্ট। বৃদ্ধ পিষিয়া যাক্ বা শিশু পদদলিত হোক্, তাহাতে কাহারও কিছু আসে যায় না।

অনেক ঠেলাঠেলি করিয়া রোরুদ্যমান বালক ও বালিকাকে লইয়া বৃদ্ধ জনতার পশ্চাতে আসিয়া পড়িল। পিছনে রাস্তা। রাস্তার উপর গাড়ীর সারি। বৃদ্ধ ছেলে মেয়ে দুইটিকে লইয়া রাস্তা পার হইবার উদ্দেশ্যে যেমনি রাস্তায় পা দিয়াছে, অমনি "এইও" বলিয়া একজন পাহারাওয়ালা তাহাকে প্রবলবেগে এক ধাক্কা দিল। বৃদ্ধ হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। ছোট মেয়েটি ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

এই সময় তীব্রকণ্ঠে পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়া উঠিল,—"খবরদার।"

পাহারাওয়ালা পিছনে চাহিয়া দেখিল, ধুতি-কামিজপরা এক যুবক তাহার দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। পাহারাওয়ালা ফিরিতেই যুবক ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল ও বৃদ্ধকে তুলিয়া ধরিয়া ছেলে

মেয়ে দুইটিকে লইয়া রাস্তা পার করিয়া দিতে গেল। পাহারাওয়ালা পূর্ব্ব হইতেই ক্রুদ্ধ ছিল, এখন যুবকের এই কার্য্যে রেগে গিয়া তাহাকে বাধা দিল। যুবক তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বৃদ্ধ ও বালক বালিকাকে রাস্তার অপর পারে পৌছাইয়া দিল। পৌছাইয়া দিয়া ফিরিতেই পাহারাওয়ালা তাহার হাত ধরিল। যুবক বলিল, "হাত ছোড় দেও।"

পাহা। তুম্‌কো থানেমে যানে হোগা।

যু। কেঁও?—বলিয়া এক ঝাঁকি দিয়া হাত ছাড়াইয়া লইল।

পাহারাওয়ালা পুনর্ব্বার হাত ধরিতে গেল যুবক দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"খবরদার।"

জনকতক পাহারাওয়ালা এদিক ওদিক দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের হাতে বৃহৎ বৃহৎ লাঠি। গোলযোগ দেখিয়া তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল ও যুবককে ধরিবার উপক্রম করিল। যুবক সহসা এক হুঙ্কার দিয়া একজন পাহারাওয়ালার উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহার লাঠি কাড়িয়া লইল। সে হুঙ্কারের শব্দ বহুদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হইল। তৎপরে যুবক হঠাৎ একটু ঝুঁকিয়া পড়িল। পরক্ষণেই এক লম্ফে কিছু দূরে গিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতের লাঠি সবেগে ঘুরিতে লাগিল। তিন চার জন পাহারাওয়ালা লাঠি লইয়া অগ্রসর হইয়া যুবককে আক্রমণ ও তাহাকে লক্ষ্য করিয়া লাঠি চালাইল। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার শরীরের বিভিন্ন স্থানে আহত হইয়া পড়িয়া গেল। ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া একজন জমাদার তীরবেগে ছুটিয়া যুবককে ধরিতে গেল। কিন্তু লাঠির আঘাতে তাহার পাগড়ী উঠিয়া গেল। তখন চারিদিক হইতে কনেষ্টবল ও পাহারাওয়ালা যুবককে ঘিরিয়া ফেলিল। চারিদিকে অসংখ্য লোকও দাঁড়াইয়া গেল। লোকের ভিড়ের মধ্যে

পড়িয়া যুবক বিপন্ন হইল। জনতার মধ্য দিয়া লাঠিসঞ্চালনে নিজের পথ করিতে গেলে বহু নিরীহ লোক আহত হইত। যুবক সহসা হাতের লাঠি ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। তখন চার পাঁচ জন পাহারাওয়ালা একেবারে যুবকের উপর পড়িয়া তাহাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিল ও টানিয়া কিছু দূরে লইয়া গেল। সেখান হইতে চারিজন কনেষ্টবল যুবককে ধরিয়া থানায় লইয়া গেল।

থানার কর্ম্মচারী খাতা খুলিয়া কনেষ্টবলের অভিযোগ লিখিয়া লইয়া যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি ?"

যুবক বলিল, "উমানাথ বসু।"

কর্ম্মচারী। বাড়ী কোথা ?

যু। জনাই।

ক। জামিন দিতে পার্‌বে ?

যু। পার্‌ব। আমার ভগ্নীপতি শ্যামবাজারে থাকেন। তাঁর নাম গঙ্গাধর ঘোষ। তাঁকে খবর দিলে তিনি জামিন হতে পার্‌বেন। আমার দাদাও সেখানে থাকেন। তাঁর নাম রঘুনাথ বসু।

থানার কর্ম্মচারী ধনাঢ্য গঙ্গাধর ঘোষের নাম শুনিয়াছিলেন। যুবকের কথায় তাঁহার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হইল। অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বলিলেন,—"আচ্ছা আমি একজন পাহারাওয়ালা পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি বসো।"

যুবক বসিল। একজন পাহারাওয়ালা গঙ্গাধর বাবুর ঠিকানা বুঝিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে পাহারাওয়ালা ফিরিয়া আসিল। বলিল, "গঙ্গাধর বাবু বলিলেন, তিনি কাহারও জামিন হইতে পারিবেন না।"

যুবক। আমার দাদা ?

পাহারাওয়ালা বলিল, "গঙ্গাধর বাবু বলিলেন, রঘুনাথ বলিয়া কেহ এ বাড়ীতে থাকে না।"

থানার কর্ম্মচারী তখন মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "বটে? তুমি ছোক্‌রা ত কম নও। আমাদের সঙ্গে ধাপ্পাবাজী। মিছামিছি এতটা হায়রাণ করালে? যাও, একে হাজতে নিয়ে যাও।"

আদেশমত যুবক হাজতে নীত হইল।

পরদিন কয়েকটা মোকদ্দমার পর ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যুবককে উপস্থিত করা হইলে তাহার বিচার আরম্ভ হইল। প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেট কনেষ্টবলগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন। শান্তিভঙ্গ, সরকারী কর্ম্মচারীকে কর্ত্তব্যকার্য্যে বাধাদান, আঘাত প্রভৃতি অভিযোগ যুবকের উপর আরোপিত হইল। একে একে সকলের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়া গেলে ম্যাজিষ্ট্রেট যুবকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার কি বলিবার আছে?"

যুবক যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিল। শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। পরে বলিলেন, "তোমার কোনও সাক্ষী আছে?"

যুবক বলিল, "না।"

আর কোনও কথা না বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট রায় লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পনের মিনিট পরে কলম থামাইয়া বলিলেন "তিন মাস সশ্রম কারাবাস।" যুবক কোনও কথা কহিল না, কেবল মুহূর্তের জন্য তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। পরে আত্মসংবরণ করিয়া পুলিশের রক্ষীর সহিত সে বিচারালয় পরিত্যাগ করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

"যদা তু ভাগ্যক্ষয়পীড়িতাং দশাং
নরঃ কৃতান্তোপহিতাং প্রপদ্যতে।
তদাস্য মিত্রাণ্যপি যান্ত্যমিত্রতাং
চিরানুরক্তোঽপি বিরজ্যতে জনঃ॥"

মৃচ্ছকটিকম্।

এই ঘটনার পরদিন প্রাতঃকালে চা খাইতে খাইতে গঙ্গাধর বাবু খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। গোবিন্দও প্রসাদপ্রত্যাশায় বসিয়াছিল। গঙ্গাধর বাবু বলিলেন, "আর শুনেছ হে গোবিন্দ! রঘুনাথের ভাই উমানাথের তিনমাস জেল হয়েছে। গিয়েছিলেন কিনা পুলিশের সঙ্গে দাঙ্গা করতে। বড় ভাই রঘুনাথ ত দাঙ্গা করে হাসপাতালেই আছেন। আমার নীরেনকে যে সেদিন মেরে ফেলেনি এই ভাগ্যি। গাড়ীখানা ত গেছেই। কি দাঙ্গাবাজ কুটুম্বই সব হয়েছে। পরিচয় দিতেও লজ্জা করে। আবার উমানাথ লোক পাঠিয়েছিল আমাকে জামিন হ'তে।"

গোবিন্দ বলিল, "অমন কাজটি করবেন না হুজুর! যে দিনকাল পড়েছে! ওসব হাঙ্গামে যাবেন না।"

গঙ্গা। আরে সে কি আর আমায় বল্‌তে হবে? যে স্বদেশী হাঙ্গাম চল্‌ছে! ওদের সঙ্গে সংশ্রব রাখ্‌তে গেলে শেষে আমার পিছনেও

গোয়েন্দা লাগ্‌বে। আমার বাড়ীও খানাতল্লাস হবে। আমি আগে থাক্‌তেই বলে দিয়েছি আমার বাড়ীতে ওসব নামের কেউ থাকে না।

গোবিন্দ। আজ্ঞে, আপনি বিবেচক লোক, আপনি বল্‌বেন বই কি? এঁ্যা, শেষে কি না পুলিশের সঙ্গে দাঙ্গা? কালে কালে কতই দেখ্‌ছি। রঘুনাথকে আগে ত ভাল মানুষটি বলে বোধ হ'ত। এখন দেখ্‌ছি ভিজে বেড়াল।

গঙ্গা। যা হোক্। আমার সঙ্গে সম্পর্ক এই পর্য্যন্ত। এখানে ঢুক্‌তে দিচ্ছি না। কে বাপু ওসব পুলিশের আসামী বাড়ীতে রেখে ফ্যাসাদে পড়্‌বে?

গো। তার আর কথা আছে? কোন্ দিন ওয়ারিন্ বেরুবে— খানাতল্লাস হবে। আপনি মানী লোক। খামকা ও সব জঞ্জালে জড়াবেন কেন?

গোবিন্দের কথায় প্রীত হইয়া গঙ্গাধরবাবু হুকুম দিলেন,—"ওরে সদা! গোবিন্দবাবুকে এক পেয়ালা চা এনে দে।"

গোবিন্দ সদাকে বলিল, "হ্যা বাবা! আনত এক পেয়ালা। সর্দ্দিতে নাকটা বুজে রয়েছে।" ইহারই জন্য এতক্ষণ গোবিন্দ বাক্‌-চাতুর্য্য প্রদর্শন করিতেছিল। এখন প্রার্থিত বস্তুলাভে বহুবিধ মুখ-ভঙ্গী সহকারে পেয়ালা খালি করিয়া শুষ্ক কণ্ঠ সরস করিয়া লইল। পরে দুই হাত ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিল, "আজ্ঞে বল্‌ছিলুম কি—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নীলমাধব সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। নীলমাধবকে দেখিয়া গঙ্গাধর বাবু একটু উঠিয়া বসিয়া বলিলেন,—"কি হে, আজকাল যে আর দেখ্‌তেই পাই না?"

নীল। আজ্ঞে, আপিসের কাজে বড় ব্যস্ত থাক্‌তে হয়। আর লোকেরাও সবাই মিলে আমার পিছনে লেগেছে।

গঙ্গা। কেন ?

নীল। আমার উন্নতিতে তাদের হিংসা হয়েছে। আগে আপনি বড়বাবু ছিলেন, কেউ কিছু বলতে সাহস করত না। এখন কথায় কথায় ভুল চুক ধ'রে একেবারে বড় সাহেবের কাণে পর্য্যন্ত সে কথা তুলে দেয়। বড় হুঁসিয়ার হ'য়ে কাজ কর্ম্ম করতে হচ্ছে।

গোবিন্দ দেখিল বাবুকে জল করিবার এই এক সুযোগ। অমনি দুই পাটি দাঁত বাহির করিয়া "হ্যা হ্যা" করিয়া হাসিয়া বলিল, "এমন বাবু কি আর পাবে নীলমাধব বাবু। বড়বাবুর কাছে চাকরী ত' রাম-রাজত্ব। তা উনিই বা পরের জন্য কতদিন আপনার উপর ঝুঁকি নেবেন ? কাজেই কাজ ছেড়ে দিলেন। তা দেখ নীলমাধব বাবু, এখনকার বড়বাবুকে একটু তোয়াজ করগে। তা হ'লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

গঙ্গাধর বাবু মনে মনে খুসী হইয়া বলিলেন, "আর শুনেছ নীল-মাধব ? উমানাথের যে তিনমাস জেল হয়েছে।

নীল। কে উমানাথ ?

গঙ্গা। আমাদের রঘুনাথের ভাই।

নীল। আজ্ঞে সে কি ? কি করেছিল ?

গোবিন্দ একটু আগাইয়া বসিয়া বলিল, "বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, আর করবেন কি ? এইবার বাছাধন টেরটা পেয়েছেন কত ধানে কত চাল।"

গঙ্গাধর বাবু খবরের কাগজখানা আগাইয়া দিয়া, বলিলেন, "এই যে দেখ না পড়ে।"

নীলমাধব কাগজখানা তুলিয়া লইয়া নির্দ্দিষ্ট অংশ পাঠ করিলেন।

পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। বলিলেন "বিচার হয়ে গেছে। কাকে উকীল দিয়েছিলেন?"

গঙ্গা। আমি উকীল দেব? শোন গোবিন্দ, কথাটা একবার!

গোবিন্দ। নীলমাধব বাবু বলেন কি? বাবু এই সব ফৌজদারীর হ্যাঙ্গামে জড়াবেন! যেমন রঘুনাথকে করেছেন তেমনি উমানাথকেও করেছেন। ওদের সঙ্গে সব সম্বন্ধই ঘুচিয়ে দিয়েছেন।

নীল। রঘুনাথ কি এখানে নাই? আমি ত জানি সে এখানেই আছে।

গোবিন্দ। রাধে বল! ও সব ঝঞ্ঝাট এখানে নেই। সে সেইদিনই যে হাঁসপাতালে গিয়েছিল, সেইখানেই আছে। এতদিনে আছে কি গেছে তাই বা কে জানে?

নীলমাধব একটু উত্তেজিত স্বরে গঙ্গাধর বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, তাই নাকি?"

গঙ্গাধর বাবু তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন,—"তাই বই কি!"

নীল। আপনি এদের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করলেন?

গোবিন্দ। তোমার ত আস্পর্দ্ধা কম নয় দেখ্‌ছি। বাবুর বাড়ীতে এসে বাবুকে চোখ্‌ রাঙ্গাচ্ছ? তুমি নিজের চরকায় তেল দাওগে যাও!

নীলমাধব গোবিন্দের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গঙ্গাধরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার একটা মিনতি, আপনার কাছে হাতযোড় কচ্ছি। এদের দেখ্‌বার আর কেউ নেই। আপনি এদের রক্ষা করুন। এখনও আপিল করা যেতে পারে। আমি উকীল যতীন বাবুকে ডেকে দিইগে, আর হুকুম দিলেই রঘুনাথকে গাড়ী করে এখানে আনি।"

গঙ্গা। তুমি কি ক্ষেপেছ নাকি? আমি কেন পরের জন্য অত মাথা ঘামাতে যাব?

নীল। এরা কি আপনার পর হ'ল? ওদের বাপ যে মরবার সময় আপনার হাতে ওদের সঁপে দিয়ে গেছেন। আর আপনি ওদের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করছেন। নিজে কিছু করতে না চান, আমায় কেবল কিছু টাকা দিন। আমিই সব ব্যবস্থা কচ্ছি। আপনাকে কোনও ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে না। এ বাড়ীতে আমি কাকেও আনব না।

গঙ্গা। বলি, টাকা কি আমার ছড়াছড়ি যাচ্ছে না কি?

গোবিন্দ। হ্যাঁ। তুমি ত খুব লোক হে। বাবুর কি আর টাকা রাখ্‌বার যায়গা নেই?

নীলমাধব আবার মিনতি স্বরে বলিলেন, "দোহাই বড়বাবু। অন্ততঃ পাঁচ'শ, নিদেন দু'শ টাকা দিন, আমি এখনই বেরিয়ে পড়ি।"

গঙ্গা। তোমার পাগ্‌লামী শোনবার আমার সময় নেই। ওরে সদা, গাড়ী জুত্‌তে বল্। আমি এখনই বেরোব।

এই বলিয়া গঙ্গাধর বাবু অন্তঃপুর প্রবেশের উদ্যোগ করিলেন। নীলমাধব আর একবার সামনে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আর একটা কথা বলি—শুনে যান।"

গঙ্গাধর বাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তোমার কোনও কথা আমি শুনতে চাই না। বেরোও এখান থেকে। এ বাড়ীতে যদি ফের ঢুক্‌বে ত গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।"

নীলমাধব দাঁড়াইয়া গঙ্গাধর বাবুর দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে একবার চাহিলেন, গঙ্গাধর বাবু সে দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

গোবিন্দও নীলমাধবের মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পাইয়া গিয়াছিল। বলিল, "আজ্ঞে, নীলমাধব বাবু, কিছু মনে করবেন না। বাবু আছেন ত আছেন ভালমানুষটি, কিন্তু একবার চট্‌লে আর কিছু জ্ঞান থাকে না।"

নীলমাধব তীব্রস্বরে বলিলেন, "চোপ্‌ ছুঁচো।"

গোবিন্দ ভয়ে পাঁচ হাত পিছাইয়া গেল। হাতে হাত ঘসিতে ঘসিতে বলিল, "আজ্ঞে, আজ্ঞে, আমি ত কিছু বলিনি। আমার উপর রাগ করেন কেন?"

নীলমাধব কোনও উত্তর না দিয়া দ্রুতপদে ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

গোবিন্দ তখন মনে মনে বলিল, "তোমার বড় বাড় হয়েছে। আচ্ছা তোমায় মজাটা দেখাচ্ছি।"

দশম পরিচ্ছেদ

"কপোত পাখীরে চকিতে বাঁটুল
বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডীদাস কহে এমতি হইলে
আর কি পরাণ রয়?"

চণ্ডীদাস।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। জনাই-গ্রামের অধিকাংশ লোকেই স্নান সমাপন করিয়া আহারাদির উদ্যোগে প্রবৃত্ত। বসু-গৃহিণী বৃহৎ অট্টালিকার এক প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে শয়ন করিয়াছিলেন। আজ কয়েক দিন হইতে তাঁহার প্রবল জ্বর হইয়াছে। মাঝে মাঝে প্রলাপ বকিতেছেন। বসুজ মহাশয়ের মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। অতটা কেহ লক্ষ্য করে নাই। শোকে তাপে অমন হইতেছে, এই কথাই সকলের মুখে শোনা যাইত। কিন্তু অভাবের তাড়নায় ধনীর গৃহিণী যখন লোকের গৃহে অর্থযাচ্ঞা করিতে বাধ্য হইলেন, তখন তাঁহার শরীর আর বাধা মানিল না। মনের অসহ্য যাতনায় শরীরও অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। রঘুনাথ উমানাথের মুখ চাহিয়া এই অকর্ম্মণ্য শরীর লইয়াও তিনি অসাধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ আর বেশী দিন চলিল না। একদিন কলসীতে করিয়া জল আনিবার সময় তিনি কলসীশুদ্ধ পড়িয়া গেলেন।

যখন উঠিবার চেষ্টা করিলেন, তখনই বুঝিলেন যে শরীর আর বহিবে না। পাড়ার বামার মা আসিয়া তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া আরও দুই চারজনের সাহায্যে ঘরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া দিল। সেই হইতেই এই প্রবল জ্বর।

উমানাথ তখন বাড়ীতে ছিল। সে ছেলেমানুষ, অসুখ যে গুরুতর তাহা সে হঠাৎ বুঝিতে পারে নাই। বসু-গৃহিণীও "ও কিছু নয়" বলিয়া রোগটা উড়াইয়া দিতে চাহিলেন। কারণ অসুখের যন্ত্রণা অপেক্ষা তাঁহার বিশেষ যন্ত্রণা হইতেছিল, চিকিৎসার টাকার জন্য ছেলেরা বিব্রত হইয়া পড়িবে। এই জন্য রঘুনাথকেও সংবাদ দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু জ্বর প্রবল বেগ ধারণ করিলে বসু-গৃহিণী যখন প্রলাপ বকিতে লাগিলেন, তখন উমানাথ বড়ই ভয় পাইল। গ্রাম্য কবিরাজকে ডাকাইয়া দেখাইল। কবিরাজ বিশেষ ভরসা দিলেন না। উমানাথ তখন রঘুনাথকে খবর দিতে কলিকাতায় ছুটিল। রঘুনাথ যে হাঁসপাতালে পড়িয়াছিল তাহাও সে জানিত না। তেলকল ঘাটে রেল হইতে নামিয়া নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া গড়ের মাঠের উপর দিয়া গঙ্গাধর ঘোষের বাড়ী যাইবার সময় পুলিশের সহিত বিবাদ করিয়া উমানাথ কারারুদ্ধ হইয়াছিল।

বসু-গৃহিণী অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বামার মা পাশে বসিয়াছিল।

রঘুনাথ উমানাথের কোন সংবাদ নাই। বামার মা গ্রামের একজন লোককে রঘুনাথ উমানাথের সন্ধানে গঙ্গাধর বাবুর বাড়ী পাঠাইয়াছিল, সে লোকও ফিরিয়া আসে নাই। বামার মা উৎকণ্ঠিত চিত্তে বসু-গৃহিণীর নিস্পন্দ শরীর ও রোগকাতর বদনের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। সেদিন পাড়ার আর কেহ বসু-গৃহিণীকে দেখিতে আসে

নাই! কবিরাজ মহাশয় সকালে আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "অবস্থা বড় খারাপ। জ্ঞান হইলেই আমায় খবর দিও।"

এই সময় বাহির হইতে কে ডাকিল,—"বাড়ীতে কে আছ?"

বামার মা মনে করিল, তাহার প্রেরিত লোকটি বোধ হয় ফিরিয়া আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া বলিল, "কে ঘোষের পো?" বলিয়াই দেখিল একজন অপরিচিত লোক। মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া দাঁড়াইতেই আগন্তুক বলিল, "মা ঠাকরুণের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

বামার মা। আপনি কোথা থেকে আসছেন?

আগ। আমি রঘুনাথ উমানাথের খবর এনেছি।

বামার মা। গিন্নীর বড় অসুখ। আজ ক'দিন থেকে এখন তখন অবস্থা বল্লেই হয়।

আগ। যেমনই হোক, আমার দেখা না করলেই নয়।

বামার মা। উপরে যান। এখন তিনি অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন!

আগন্তুক উপরে উঠিয়া বামার মার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিল। বামার মা বাহিরে কবাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিল, বসু-গৃহিণী চক্ষুরুন্মীলন করিয়াছেন। আগন্তুককে দেখিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "রঘুনাথ এসেছে?"

বামার মা বুঝিল, গৃহিণীর সংজ্ঞা হইয়াছে। তখন কবিরাজের কথা তাহার স্মরণ হইল। সে তাড়াতাড়ি কবিরাজকে সংবাদ দিতে গেল।

আগন্তুক বসু-গৃহিণীর কথায় কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "না, এখনও আসে নাই।"

বসু-গৃহিণী। আপনি কে?

আগ। আমি আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি। রঘুনাথ শিগ্‌গিরই আস্‌বে।

বসু-গৃহিণী। আমার দিন ফুরিয়েছে। মর্‌বার সময় কেবল একটা সাধ হচ্ছে, মালতীকে একবার দেখ্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে। তা বাছাকে কি আর পাঠাবে?

আগন্তুক বলিল, "আমি তাকে খবর দিতে যাচ্ছি!"

এই সময় কবিরাজ মহাশয় বামার মার সঙ্গে আসিয়া পড়িলেন। রোগিণীর অবস্থা দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতেই বসু-গৃহিণী বলিলেন, "আর কেন? আমি আর ঔষধ খাব না।"

কবিরাজ আশ্বাসের স্বরে বলিলেন, "সে কি মা? অমন কথা বল্‌বেন না। এই ঔষধটুকু খেয়ে নিন।"

বসুগৃহিণী। আর কেন কষ্ট কর্‌ছেন কব্‌রেজ মশাই, আমায় যেতে দিন।

আগন্তুক কবিরাজকে বাহিরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিল, "কেমন দেখ্‌লেন?"

কবি। আজকের দিন কাটে কি না সন্দেহ।

আগন্তুক বলিল, "তবে আমি চল্লুম। দেখি যদি মালতীকে আন্‌তে পারি।"

এই বলিয়া আগন্তুক দ্রুতপদে ষ্টেসনের দিকে চলিয়া গেল।

কবিরাজ পুনর্ব্বার গৃহমধ্যে গিয়া বসুগৃহিণীকে ঔষধ খাওয়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। বামার মা রোরুদ্যমান কণ্ঠে অনেক মিনতি করিল। গৃহিণী শুনিলেন না।

কবিরাজ চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় একটা ঔষধ বামার মাকে

দিয়া গেলেন, বলিলেন, "দেখো আর একবার চেষ্টা করে যদি বড়ীটা খাওয়াতে পার।"

কবিরাজ চলিয়া গেলে পাড়ার দত্তগিন্নী আহারান্তে পান চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া বলিলেন, "মা ঠাকৃরুণ আজ কেমন আছেন গো?"

বসু-গৃহিণী তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন। বামার মা বলিল, "আস্তে কথা কও। গিন্নী ঘুমুচ্ছেন।"

দত্ত-গিন্নী নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, "বিমল বল্‌ছিল, উমানাথের নাকি জেল হয়েছে। কল্‌কেতায় পুলিশের সঙ্গে নাকি মারামারি করেছিল। খবরের কাগজে উঠেছে।"

বামার মা বলিল, "এঁ্যা? বল কি? কি সর্ব্বনাশ!"

দত্ত-গিন্নী বামার মা'র গা টিপিয়া বলিলেন, 'চুপ।"

বামার মা দেখিল বসু-গৃহিণী চোক চাহিয়াছেন। উত্তেজিত ভাবে বসু-গৃহিণী বলিলেন, 'কি বল্লে দত্ত-গিন্নী, উমানাথের জেল হয়েছে। আর রঘুনাথ—বল বল তার কি হয়েছে? বেঁচে আছে ত?" এই কথা বলিতে বলিতে সবেগে তিনি শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। বামার মা তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁকে ধরিল। বলিল, "না মা, কে বল্‌লে? কিছু হয়নি, তুমি কি শুনতে কি শুনেছ?"

বসু-গৃহিণী। তুমি আমার কাছে লুকোচ্ছ বামার মা? রঘুনাথ উমানাথ আমাঅন্ত প্রাণ। তারা কেন আমার কাছে নাই? উমানাথের জেল হয়েছে, রঘুনাথ বুঝি বেঁচে নাই। বল বল, রঘুনাথের কি হয়েছে?"

বলিতে বলিতে বসু-গৃহিণী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মস্তক বামার মার হাতের উপর ঢলিয়া পড়িল। বামার মা আস্তে আস্তে তাঁহার সংজ্ঞাহীন দেহ বিছানার উপর শোয়াইয়া দিল ও দত্ত-গিন্নীকে বলিল, "সর্ব্বনাশ হল। শীগ্‌গির কবিরাজ মহাশয়কে খবর দাও।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"কি আর বলিব মায় ?
কিছু দয়া নাই তাহার হৃদয়ে,
এ কথা বলিব কায় ?"

চণ্ডীদাস।

বিকাল বেলা হৃদয় বাবু বাহিরের বৈঠকখানায় একাকী বসিয়া জমীদারীর খাতাপত্র দেখিতেছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে একটি পালিস করা কাঠের বাক্স। বাক্সের মধ্যে বহুবিধ কাগজপত্র। কতকগুলি কাগজ একত্রিত করিয়া লাল ফিতা দিয়া এক একটী তাড়া বাঁধা হইয়াছে। পৃথক পৃথক খোপের ভিতর চিঠিপত্র। হৃদয় বাবু পাকা জমীদার। জমীদারী সংক্রান্ত প্রত্যেক কার্য্য নিপুণভাবে পরীক্ষা করিতেন। সমস্ত খাতা-পত্রে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার পর্য্যবেক্ষণের গুণে তাঁহার জমীদারীর আয় পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

হৃদয় বাবু একান্ত মনোনিবেশ সহকারে একখানি দলিল দেখিতে-ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি দ্রুতপদে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। তাহার দেহ ঘর্ম্মাক্ত। মুখে উৎকট চিন্তা ও উৎকণ্ঠার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

হৃদয় বাবু আগন্তুকের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই সে তাঁহাকে নমস্কার করিল। হৃদয় বাবু বলিলেন, "আপনি কি চান ?"

আগ। আজ্ঞে, আমি জনাই থেকে আস্‌ছি।

"জনাই" শুনিবামাত্র হৃদয়বাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। বলিলেন, "কি দরকার?"

আগ। আজ্ঞে আপনার বেহান মৃত্যুশয্যায় বার বার কেবল কন্যাকে দেখ্‌তে চাচ্ছেন। যদি একবার এক ঘণ্টার জন্যও আপনার বৌমাকে পাঠান তা হ'লে দেখে মর্‌তে পারেন।

হৃদয়। আপনি কে? আপনাকে ত আমি কখন দেখি নি। আপনার সঙ্গে আমি বৌমাকে পাঠাতে পারি না।

আগ। আমার সঙ্গে পাঠাতেও আমি অনুরোধ কচ্ছি না। আমি কেবল খবর দিতে এসেছি। আপনার পুত্রের সঙ্গে পাঠান। কেবল একবার দেখা করে আস্‌বে। আজকের দিনও কাটে কি না সন্দেহ।

হৃদয়। আপনি ভিতরকার কথা কিছু জানেন না দেখ্‌ছি, তাই এরকম অনুরোধ কর্‌তে এসেছেন। আপনি জানেন না যে রঘুনাথ ও উমানাথের এ বাড়ীতে প্রবেশ নিষেধ, আপনি জানেন না যে তাদের সঙ্গে আমি সব সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেছি। তারা আমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করেছে জান্‌লে এ রকম অনুরোধ কর্‌তে আসতে সাহস কর্‌তেন না।

আগ। আজ্ঞে যাই হোক, এ রকম সময়ে ও সকল কথা আর মনে রাখ্‌বেন না। সব অপরাধের জন্য আমরা ক্ষমা চাচ্ছি। একবার আপনার বেহানের শেষ সাধটা পূর্ণ করুন।

হৃদয়। দেখুন, আমার বয়স হয়েছে, অনেক দেখেছি শুনেছি। যে ফিকির করে আপনাকে পাঠিয়েছে, ও রকম ফন্দি অনেকেই করে থাকে। রঘুনাথকে বল্‌বেন, গহনাগুলি না দিতে পার্‌লে ও সব

চালাকিতে আমায় ভোলাতে পার্‌বে না। আমরা দেখে দেখে মাথার চুল পাকিয়েছি, বুঝলেন ?

আগ। আজ্ঞে, আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, আপনি নিজের লোক পাঠিয়ে কি নিজে গিয়ে দেখুন।

হৃদয়। আমার অত গরজ পড়ে নি! আপনি আসুন। আমার অন্য কাজ আছে।

আগন্তুক মিনতির স্বরে আরও দুই চারিটা কথা বলিল। হৃদয়বাবু কোনও উত্তর দিলেন না, একমনে কাগজপত্র দেখিতে লাগিলেন।

আগন্তুক তখন নমস্কার করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। বাহির হইয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিল। পরে রাস্তার অপর পারে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে হৃদয় বাবুর বাড়ী হইতে একজন ঝি বাহির হইয়া বাজারের দিকে চলিয়া গেল। আগন্তুক তাহার অনুসরণ করিল। সে রাস্তা পার হইয়া মোড় ফিরিলে আগন্তুক অগ্রসর হইয়া বলিল, "হাঁ গা বাছা! তুমি কি হৃদয় বাবুর বাড়ী থাক ?

ঝি একবার আগন্তুকের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, "হাঁ! কেন ?"

আগন্তুক মৃদুস্বরে বলিল, "দেখ, আমার একটা কাজ কর্‌তে পারবে ? তোমাদের বৌদিদিকে একটা খবর দিতে পারবে ? তাঁর মা মর' মর'। আমায় খবর দিতে বলেছিল, আমি বাবুকে এসে বল্লুম। তা বাবু পাঠাতে চাইলেন না। তোমার বৌদিদি যদি কোন রকমে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যেতে পারেন। আজ না গেলে আর এ জন্মের মত দেখা হবে না।"

ঝি। না বাবু, আমি ও সব বল্‌তে টল্‌তে পার্‌ব না। বাবু যে

রকম লোক, একবার এ কথা কাণে গেলে আমার তখনই চাকরী যাবে।

আগন্তুক পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া বলিল, "তোমায় দুটো টাকা দিচ্ছি! কেবল একটা কথা বলগে। তা হলেই হবে। তোমার ভয় কি? কেই বা জান্‌বে! তুমি কেবল তোমাদের বৌদিদিকে বলগে'। তিনি দাদাবাবুর মত করাতে পার্‌লেই হবে।"

ঝি টাকা দুইটি লইয়া আঁচলে বাঁধিল। সুর বদলাইয়া বলিল, "তা এত করে যখন বল্‌ছেন তখন চেষ্টা দেখ্‌বো! আমার দ্বারা যদি একটা উপকার হয়, তা আর করব না? আমাকে সে রকম লোক মনে করবেন না।"

আগন্তুক মনে মনে হাসিয়া প্রকাশ্যে বলিল, "তা জানি বৈকি? নৈলে এত লোক থাক্‌তে তোমাকেই বা বল্‌ব কেন?"

ঝি প্রীতা হইয়া বলিল, "আপনি ঐ মোড়ের দোকানটার কাছে থাক্‌বেন। আমি বৌদিদিকে বলে এসে আপনাকে খবর দেব।"

বাজার করিয়া ঝি যখন বাড়ীতে ফিরিল, মালতী তখন রান্নাঘরে বামুনঠাকুরকে রাত্রির পাকের কি ব্যবস্থা হইবে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতে-ছিল।

বাড়ীতে মালতীই গৃহিণী। মালতীর শাশুড়ী বহুদিন পূর্ব্বে মারা গিয়াছিলেন।

একটু অবসর পাইলে ঝি মালতীকে তাহার মাতার অবস্থার কথা জানাইল। শুনিয়া মালতীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি নিজ শয়নকক্ষে গেল।

সেখানে শচীন্দ্র সাহেবী পোষাক পরিতেছিল। সেদিন তাহাদের কলেজে ছাত্রগণ "প্রতাপাদিত্য" অভিনয় করিবে। শচীন্দ্র 'রডা'র

ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। বাড়ী হইতে সে একেবারে সাহেবী পোষাক পরিয়া যাইতেছিল। তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য বাহিরে গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল।

শচীন্দ্র বলিল, "এই যে! এতক্ষণ আমি ভাবছি যে গেল কোথা? নাও, চট্ করে 'নেকটাই'টা বেঁধে দাও ত।"

মা। আজ তোমার যাওয়া হবে না।

শচীন্দ্র হাসিয়া বলিল, "বেশী রাত হবে না গো, সেজন্য ভাবনা নেই; নাও, দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

মা। আজ তোমায় আমার সঙ্গে যেতে হবে।

শ। কোথায়? আজ মঙ্গলবার। থিয়েটারের দিন নয় ত' জানে।

মা। আমি আজ জনাই যাব।

শচীন্দ্র চমকিয়া উঠিল। বলিল "ব্যাপার কি? এতদিন তোমার সামনে 'জনাই'য়ের নাম পর্য্যন্ত মুখে আনবার হুকুম ছিল না, আর এখন একেবারে জনাই যাত্রা। তা বেশ, যাওয়া যাবে, তার আর কি? শ্বশুরবাড়ী যেতে আর কার কবে অনিচ্ছা? তবে আজ রাত্রিতে যাওয়াটা অদৃষ্টে নেই।"

শচীন্দ্র নেকটাই আঁটিয়া ফেলিয়াছিল। আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বুরুষ দিয়া মাথার চুল সমান করিয়া দিতে দিতে এই কথাগুলি বলিল।

মালতী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল,—"তামাসা নয়। আমায় আজই যেতে হবে। আমার মা মর' মর'—খবর দিয়েছেন। আজ না গেলে আর জন্মের মত তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।"

শচীন্দ্রের হাত হইতে বুরুষ পড়িয়া গেল। এতক্ষণ সে নিজের বেশের দিকেই মনোযোগ দিতে দিতে রহস্যচ্ছলে মালতীর সহিত কথা কহিতেছিল। এখন ফিরিয়া মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল,

তাহার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। অগ্রসর হইয়া মালতীর কাঁধে হাত দিয়া বলিল, "সত্যি মালতী ?"

মালতী দুই হাতে শচীন্দ্রের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তুমি আমায় নিয়ে চল।"

শ। আজ ত আমি কিছুতেই যেতে পারব না মালতী! আজ লাট সাহেব আমাদের কলেজে থিয়েটার দেখতে আসবেন। আজ আমার না গেলেই নয়। তা তুমি আজই যাও না কেন ? আমি না হয় কাল সকালের ট্রেণেই যাব। সরকার মশাইকে সঙ্গে করে তুমি যেতে পার। বাবা কি বন্দোবস্ত করলেন ?

মা। তিনি কিছুই বলেন নি। তাঁকে তোমায় বলতে হবে।

শচীন্দ্র ভাবিয়াছিল যে তাহার পিতা বুঝি মালতীকে যাইবার অনুমতি দিয়াছেন ও সেই অনুমতি পাইয়া মালতী তাহাকে ধরিতে আসিয়াছিল। এখন বুঝিল ব্যাপারটা অন্যরূপ। কিন্তু বেশী ভাবিবারও সময় ছিল না। তাহার দেরী হইয়া যাইতেছে। বলিল, "আমায় কি করতে হবে বল।"

মা। তুমি বাবার মত করাও।

শচীন্দ্র এই প্রকার দৌত্যকার্য্যে বিশেষ অপটু ছিল। কিন্তু মালতী এরূপ কাকুতিমিনতি করিতে লাগিল যে সে আর 'না' বলিতে পারিল না। সত্য কথা বলিতে কি তাহার মনটাও কেমন করিতেছিল।

শচীন্দ্র বৈঠকখানায় গিয়া দেখিল, তাহার পিতা তাকিয়া ঠেস দিয়া শুইয়া আছেন। শচীন্দ্র ডাকিল, "বাবা!"

হৃদয় বাবু উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "কি রে ?"

শচীন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "আমার শাশুড়ী নাকি মর' মর'। তাই এরা একবার জনাই যেতে চাচ্ছে।"

কথাটা শুনিয়াই হৃদয় বাবুর প্রসন্নভাব অন্তর্হিত হইয়া গেল। রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন, "এ খবর তোমায় কে দিলে ?"

শ। বাড়ীতেই শুনলুম।

হৃদয়। কে ? বৌমা বল্লেন ? তিনি জান্‌লেন কেমন করে ?

শচীন্দ্র এত জেরায় পড়িবে তাহা আগে ভাবে নাই। কাজেই মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "আজ্ঞে তা জিজ্ঞাসা করি নি।"

হৃদয়। ও সব কথায় কাণ দিও না। আমার কাছে এক বেটা এসেছিল, ঐ রকম চালাকি ক'রতে। ও সব কেবল বৌমাকে নিয়ে যাবার ফিকির। রঘুনাথ উমানাথ নিজেরা না এসে এই ফন্দি করেছে। আর যদিই বা সত্যি হয়, তা হলেও বৌমার আর সেখানে যাওয়া হতে পারে না। ওদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছি, তা তোমায় অনেকদিন আগেই বলেছি।

শচীন্দ্র আমতা আমতা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে তবু যদি সত্যি হয়, তা' হলে এরকম অবস্থায়—"

হৃদয়বাবু উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "আমি যা বললুম তার উপর আর "তবু" নেই বাপু। আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন আমার কথাটা শুন্‌তে হবে। আমি ম'লে যা খুসী করো।"

শচীন্দ্র আর একবার চেষ্টা করিল। বলিল, "আমি বোধ করি—"

হৃদয় বাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তুমি বোধ কর তোমার মাথা। কিসে ভাল হয় না হয় তা আর আমাকে শেখাতে হবে না।"

শচীন্দ্র তখন ফিরিয়া গেল। শয়নকক্ষে গিয়া দেখিল মালতী নাই। ক্ষণপরেই মালতী আসিল। তাহার মুখ দেখিয়া শচীন্দ্র বুঝিল, মালতী অন্তরাল হইতে তাহার শ্বশুরের সব কথা শুনিয়াছে। মালতী শচীন্দ্রকে

বলিল, "তোমার কাছে কখনও কিছু চাই নি আজ আমার এই সাধটি পূর্ণ কর। তুমি আমায় সঙ্গে করে নিয়ে চ "

শ। কাল সকালে যা হয় করা যাবে। আজ রাত্রিতে যাবই বা কি করে?

মা। ঘোড়ার গাড়ী করে চল। কাল গেলে আর মাকে দেখতে পাব না।

শ। অত উতলা হয়ো না। কাল সকালেই যাব। আজ আমি চললুম। আমার দেরী হয়ে গেছে।

মালতী শচীন্দ্রের হাত ধরিল। বলিল, "আমার একটা কথা রাখবে না? আমার মা মরে যায়, একবার শেষ দেখা দেখব। তার চেয়ে তোমার থিয়েটার করা বড় হ'ল। আমি কি তোমার কেউ নই? আমার কি সুখ দুঃখ নেই? আমার কি সাধ আহ্লাদ নেই? তোমরা যা ভাল বুঝবে যা ভাল বল্‌বে তাই কি আমাকেও ভাল বল্‌তে হবে? তোমার একদিন থিয়েটার না করাটা অসম্ভব হল, আর আমি আমার মাকে শেষ দেখা দেখ্‌তে পাব না? আচ্ছা বেশ।"

মালতীর চিত্ত আজ ধৈর্য্য হারাইয়াছিল। এতদিন তাহার অন্তরে সুপ্ত সর্পের ন্যায় যে বিদ্রোহের প্রবৃত্তি নিশ্চেষ্ট হইয়াছিল, আজিকার ঘটনার আঘাতে তাহা ফণা তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। পুরুষদের সকল সুখ, সকল আহ্লাদ আছে—ক্ষুদ্রতম আকাঙ্ক্ষাটি পূর্ণ করিবার জন্য রমণীদের প্রাণ দিতে হইবে। কিন্তু রমণীদের কিছু ইচ্ছা হইলে—ইচ্ছা কেন মরিয়া গেলেও—তাহাদের মুখের দিকে চাওয়া যেন পুরুষদের অনুগ্রহ! সে কি অপরাধ করিয়াছে? তাহার মাতারই বা কি দোষ? কে অলঙ্কার লইল, তাহার জন্য তাহার উপর এ পীড়ন কেন? পিতৃগৃহের দিকে অন্তরের স্নেহ-নির্ঝর

উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেও সে এতদিন তাহা চাপিয়া শ্বশুরগৃহের সংসারের ছোট খাট কাজে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছিল। দিনের মধ্যে শত-বার তাহাদের ভাইদের, তাহার মাতার সংবাদ-প্রত্যাশায় মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিত। সে আকাঙ্ক্ষা দমন করিয়া সে স্বামীকে 'জনাই' নামটি পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে দেয় নাই। কিন্তু আজ একবার তাহারা তাহার মাকে শেষ দেখা দেখিতেও দিবে না? পরম শক্রও এ সময় শক্রতা ভুলিয়া যায়, আর তাহার স্বামী, যাহার চেয়ে তাহার আপনার জন নাই, যে তাহার অন্তরের নিভৃততম প্রদেশটি পর্য্যন্ত অবগত আছে, সে তাহাকে উপেক্ষা করিল? আজ তাহার নিজের দৌর্ব্বল্য, শক্তিহীনতার কথা বারবার মনে জাগিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ক্রোধ ও দুর্দ্দমনীয় অভি-মানে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। বড় দুঃখে বড় ক্রোধে, বড় অভিমানে তাহার মুখ দিয়া ঐ কথাগুলি বাহির হইয়া গেল।

শচীন্দ্র টুপিটা মাথায় দিয়া কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। মালতী তাহাকে বাধা দিল। বলিল, "যাও কোথা? দাঁড়াও। আমি কি করব তা বলে যাও।"

শচীন্দ্র "তোমার যা খুসী।" বলিয়া মালতীর হাত ঠেলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। মালতীর শেষ কথাগুলি শুনিয়া তাহার একটু রাগ হইয়াছিল। সত্য কথা আর কাহার প্রিয় হইয়া থাকে?

শচীন্দ্র চলিয়া গেলে মালতী স্থির হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, পরে যে ঝি তাহাকে সংবাদ দিয়াছিল, তাহাকে ডাকিয়া চুপি চুপি কি বলিল। ঝি প্রথমে কিছুতেই রাজী হইল না। শেষে অনেক বুঝাইবার পর স্বীকৃত হইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

দোকানের সম্মুখে আগন্তুক অপেক্ষা করিতেছিল। ঝি তাহাকে গিয়া বলিল, "বউদিদিকে এরা যেতে দিচ্ছে না। আপনি যদি একখানা

গাড়ী নিয়ে আসেন, তাহ'লে আমাকে সঙ্গে করে বউদিদি যেতে পারেন।"

প্রস্তাবটা আগন্তুকের ভাল লাগিল না। সে অনেকক্ষণ ইতস্তত: করিতে লাগিল। শেষে বলিল, "আচ্ছা।"

ঝি বলিল, "গলির মোড়ে গাড়ী ঠিক করে রাখ্‌বেন। আমরা খিড়কী দোর দিয়ে বেরিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌ব।"

আগন্তুক মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া গাড়ীর সন্ধানে চলিয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"এষ ক্রীড়তি কূপযন্ত্রঘটিকান্যায়প্রসক্তো বিধিঃ।"

মৃচ্ছকটিকম।

গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী পল্লীপথ দিয়া চলিতেছিল। গাড়ীর ভিতরে একদিকে মালতী বসিয়া খড়খড়ির ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে চন্দ্রালোক উদ্ভাসিত পথিপার্শ্বের দৃশ্য দেখিতেছিল। তাহার সম্মুখের আসনে ঝি বসিয়া ঢুলিতেছিল। মালতীর হৃৎপিণ্ড দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতেছিল। মনের প্রবল উত্তেজনায় সে কোনও বাধা না মানিয়া মাকে দেখিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মাকে দেখিতে পাইবে কি না, সেই চিন্তায় সে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। তাহার শ্বশুর-বাড়ীতে এতক্ষণ তাহার অনুপস্থিতি ধরা পড়িয়াছে কি না, তাহার শ্বশুর বা স্বামী কি ভাবিতেছেন, এ সকল চিন্তা এক একবার মনে উঠিতেছিল বটে কিন্তু তাহার মাতার চিন্তা এগুলিকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছিল। কেবল তাহার নয়নসম্মুখে রোগশয্যাশায়িনী জননীর কাতর মুখচ্ছবি ভাসিয়া উঠিতেছিল।

ক্রমে গাড়ী জনাই গ্রামের পথে প্রবেশ করিল। রাত্রি তখন চারিটা। পথঘাট সবই মালতীর পরিচিত। ঐ যে হালদারদের পুষ্করিণী, ইহার পাড়ে চাল্‌তা গাছ হইতে চালতা সংগ্রহ করিবার জন্য মালতী ছেলেবেলায় উমানাথের সহিত দুপুরবেলায় ছুটিয়া আসিত। ঐ

যে তাহার 'বকুলফুল' স্বর্ণলতাদের বাড়ী! স্বর্ণলতার স্বামী পশ্চিমে চাকরী করেন। স্বর্ণলতাও এখন সেখানে আছে। ঐ যে দত্তদের বাড়ীর পাশে মস্ত আম গাছ, যাহার তলায় মালতী কত ছুটাছুটী করিয়াছে। গাছের মাথার উপর দিয়া সিঙ্গীমশাইদের চূণকাম করা অট্টালিকার উপরিভাগ দেখা যাইতেছে। বামপার্শ্বে পাঠশালা—চারদিক খোলা আটচালা, রাত্রিতে শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে।

গাড়ী মোড় ফিরিল। আর তাহাদের বাড়ী পৌঁছতে বেশী দেরী নাই। দু পাশে ঝোপ, জঙ্গল ও বাঁশবন। খানিকটা যাইতেই ডানদিকে একটা পুষ্করিণী, পানায় জল ঢাকিয়া গিয়াছে। তালগাছ কাটিয়া বাঁশের খুঁটিতে আটকাইয়া ঘাটের সিঁড়ি বাঁধা হইয়াছে। ঘাটের কাছে হাত কতক জল দেখা হইয়াছে, বাকি জায়গা পানায় সবুজবর্ণ। ঝিঁঝিঁ পোকার অবিশ্রাম ডাক শোনা যাইতেছিল। গাড়োয়ানের চাবুক আস্ফালনের সহিত অশ্বতাড়নশব্দে ও গাড়ীখানির ঘর্ঘরে একটা গ্রাম্য কুকুরের নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় সেটা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিল। ঐ যে মালতীদের বাড়ী।

গাড়ীখানি গিয়া বাড়ীর সম্মুখে থামিল। বাড়ীর দরজার সামনে খানিকটা খোলা জায়গা। সেখানটা বাঁশের টুকরা ও বাখারীর ভগ্নাংশে পূর্ণ। গাড়ী থামিতেই কোচ্‌বাক্স হইতে আগন্তুক নামিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল। মালতী তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল। ঝিয়েরও ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সেও পিছনে পিছনে নামিল।

আগন্তুক দ্বারের কড়া নাড়িতে লাগিল। উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "বাড়ীতে কে আছ? দরজা খুলে দাও।"

খানিকক্ষণ ডাকাডাকির পর ভিতর হইতে কে উত্তর দিল। আগন্তুক তখন আর কড়া না নাড়িয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ

পরে কে প্রদীপহস্তে দরজা খুলিতে লাগিল। দরজা ঈষৎ খুলিয়া বলিল "কে গা ডাক্‌ছ ?"

স্বর শ্রবণে মালতী অগ্রসর হইয়া বলিল, "কে বামার মা ? আমি এসেছি।"

বামার মা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "মালতী কি দেখতে এলি মা ! তোর মা যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে গেছে মা ! কেবল যে 'মালতী মালতী' বল্‌তে বল্‌তে গেল মা !"

মালতী "মাগো" বলিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেল। ঝি দুই-হাতে তাহার দেহ বেষ্টন করিয়া ধরিল।

আগন্তুক মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

দ্বিতীয় খণ্ড

মেঘ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"দ্রবতি চ হিমরশ্মাবুদ্‌গতে চন্দ্রকান্তঃ।"

উত্তররামচরিতম্‌।

সবে ভোর হইতেছে। তখনও সূর্য্যের করস্পর্শে পূর্ব্বদিক রক্তবর্ণ ধারণ করে নাই। একে শীতকাল, তার উপর মেঘে আকাশ ধীরে ধীরে ভরিয়া যাইতেছিল—শীঘ্র যে সূর্য্য উঠিবে তাহার সম্ভাবনাও কিছুমাত্র দেখা যাইতেছিল না। কুয়াশায় চারিদিক ঢাকিয়া গিয়াছিল। মাঝে মাঝে বায়ু বহিলে কুয়াশা একটু একটু সরিয়া যাইতেছিল বটে কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাহা জমাট বাঁধিতেছিল।

'গোড়াই' নদীর উপর দিয়া ছোট একখানি ষ্টীমার চলিতেছিল। ফাষ্ট ক্লাস ক্যাবিনের সম্মুখে খানিকটা খোলা জায়গা। তার একদিকে সারেঙ্গ দাঁড়াইয়া খটাং খটাং করিয়া ষ্টীমার চালাইবার সঙ্কেত করিতেছিল। সুকানি চাকা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মাঝে মাঝে চাকা এদিক ওদিক ঘুরাইতেছিল। কখনও কখনও দু' একজন খালাসী সেখান দিয়া রসি বা বাল্‌তি হাতে ঘুরিয়া যাইতেছিল। একজন ব্যতীত আর কোন আরোহী সেখানে ছিল না।

আরোহী ডেকের উপর বিস্তৃত একখানা ইজিচেয়ারে শুইয়া ঘুমাইতেছিল। গায়ে গরম কাপড়ের কোট, তার উপর শাল জড়াইয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। কেবল মুখখানি দেখা যাইতেছিল।

প্রত্যূষের শীতল বায়ু আরোহীর কেশ বিশৃঙ্খল করিয়া দিতেছিল। আরোহী বোধ হয় স্বপ্ন দেখিতেছিল। স্বপ্নের ঘোরে তাহার মুখে মৃদু হাস্যরেখা বিকসিত হইতেছিল।

জাহাজখানি ছোট। কুষ্টিয়া হইতে পাবনায় দিনে দুইবার ফেরী করে। সময় সময় নদীমধ্যে চড়ায় লাগিয়া দুই তিন দিন যাবৎ আট্‌কাইয়া থাকে। যাত্রীরা ষ্টীমারের ভাড়া সম্পূর্ণ দিয়া শেষে নৌকায় চড়িয়া ষ্টীমার কোম্পানীকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বাড়ী পৌঁছে।

প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিন একটি মাত্র; তাহাতে একটি ক্ষুদ্র শয্যা। আরোহী প্রায়ই থাকে না। কদাচিৎ কোন সাহেব-সুবা আসিলে শয্যার উপর একখানা ফরসা চাদর পাতিয়া দেওয়া হয়, গোটা দুই বালিসও পড়ে। বাকি সময় খালাসীদের ও সারেঙ্গের জিনিষপত্র বিছানার তলে জমা হইয়া থাকে।

সেদিন প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিনে লোক ছিল। খুব ভোরে আমরা যে আরোহীর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি সে যখন ঘুমাইতেছিল তখন ক্যাবিনের ভিতর হইতে বালকের কলরব শোনা গেল। খানিকক্ষণ পরে সাত আট বৎসরের এক বালক ক্যাবিনের দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল। ক্যাবিনের ভিতর হইতে অলঙ্কারশিঞ্জিতের সহিত নারীকণ্ঠে অনুচ্চরব শ্রুত হইল "যাস্‌ নি—এই—পড়ে যাবি।" কিন্তু বালক সে নিষেধে ভ্রূক্ষেপ করিল না। তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া সে ডেকের দিকে চলিল। ক্যাবিনের ভিতর হইতে আবার শোনা গেল "দেখ্‌ না মা—নীহার—খোকা কোথা গেল? লক্ষ্মীছাড়া ছেলের জ্বালায় কোথাও একটু শান্তিতে থাক্‌বার যো নেই।"

ক্যাবিন হইতে অষ্টাদশবর্ষীয়া এক তরুণী বাহির হইয়া আসিল। তাহার গায়ে একটা সেমিজের উপর একখানি কালরংয়ের কাপড় পরা।

কাপড়ের আঁচল মাথার উপর দিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। পায়ে চটি জুতা। বালককে ধরিবার জন্য দ্রুতগতিতে সে অগ্রসর হইল। দ্রুতগমনের প্রয়াসে তাহার হাতের বালা, চুড়ি ও আঁচলের চাবির রিং বাজিয়া উঠিল। কাণের ইয়ারিং দুটি দুলিতে লাগিল।

খোকা তখন সারেঙ্গের নিকট গিয়া পৌঁছিয়াছে। তরুণীকে দেখিয়া আরও সরিয়া যাইতে লাগিল। সহসা তরুণীর দৃষ্টি নিদ্রিত আরোহীর প্রতি পড়াতে সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

তখনও আরোহীর নিদ্রা ভাঙ্গে নাই। তখনও নদীজলকণবাহী বায়ু তাহার কেশরাশি আন্দোলিত করিতেছিল। তখনও তাহার মুখে স্বপ্নের সেই হাসিটুকু লাগিয়াছিল। চারিদিক্ কুয়াশায় ঢাকা। ডেকের উপর কেবল সারেঙ্গ ও সুকানি নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত। খোকা একেবারে আরোহীর কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

তরুণী কিছুক্ষণ নিদ্রিত আরোহীর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর একটু অগ্রসর হইয়া বালককে বলিল "হিরণ্ময়—ভাল হবে না কিন্তু—এস বল্‌ছি।"

বালক তরুণীর কথায় ভয় পাইল না। বলিল "হ্যাঁ—আমি বলে নদী দেখ্‌তে এলুম। ঘরের ভেতর থেকে বুঝি কিছু দেখা যায়?"

তরুণী বলিল "আয়—আমি ঘরের জানলা দিয়ে নদী দেখাই।"

বা। না। আমি জানলা দিয়ে নদী দেখ্‌তে চাই না। আমি এই খান থেকে নদী দেখ্‌ব।

ত। কথা শুন্‌বি না? দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি।

এই বলিয়া তরুণী যেমন অগ্রসর হইল অমনি বালক উচ্চহাস্য করিয়া নিদ্রিত আরোহীর গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিল।

আরোহীর চকিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চমকিয়া উঠিয়া বালককে দেখিয়া বলিল "কি খোকাবাবু, এরই মধ্যে উঠে পড়েছ?" বলিয়াই তরুণীকে দেখিতে পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। সকাল হয়েছে তা বুঝ্‌তে পারি নি।"

তরুণী সহজ ভাবে বলিল "আমাদের জন্য আপনাকে কাল খুব কষ্ট পেতে হয়েছে। এই শীতে রাত্তিরবেলা বাইরে শুয়ে আপনার না অসুখ করে?"

আ। আমি যে কষ্টে ছিলুম তা ত' নিজের চোখেই দেখেছেন। এমন আরামে ঘুমুচ্ছিলুম যে আপনারা কখন এসেছেন তা জান্‌তেও পারিনি।

হিরণ্ময় এই সময় নদীগর্ভে কৃষ্ণকায় একটা পদার্থ দেখিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "ওটা কি?—ওই যে কাল মতন? ঐ—ঐ ডুবে গেল।"

আরোহী বলিল "ওটা শুশুক। আবার উঠ্‌বে দেখ।"

তরুণী বালককে আরোহীর নিকট দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ক্যাবিনে ফিরিয়া গেল।

ক্যাবিনের ভিতর ষ্টোভ জ্বালাইয়া তখন একজন মহিলা চা প্রস্তুত করিতেছিলেন। তরুণীকে দেখিয়া বলিলেন "কি, খোকা এল না?"

তরুণী বলিল "কাল যিনি আমাদের ক্যাবিন্ ছেড়ে দিয়েছিলেন, খোকা তাঁর কাছে রয়েছে।"

ম। আহা—ছেলেটি বড় ভাল; চেনা নেই, শোনা নাই, আমাদের জন্য কাল কত কষ্ট পেয়েছে। এই শীতে সমস্ত রাত ঠাণ্ডায় বাইরে পড়ে থাক্‌তে হয়েছে। কাল আমাদের সাহায্য না কর্‌লে হয় ত' আমরা ষ্টীমারেই উঠ্‌তে পার্‌তুম না। অন্ধকার রাত্তির—ষ্টেশনে নেমে ত

একজন কুলীও পাই না। আর রামদীনটা যে কোথায় নেমে গেল তাই বা কে জানে?

ত। কোথায় কোন ষ্টেশনে ভুল ক'রে নেমে পড়েছে। তোমার পা দিয়ে রক্ত পড়্‌ছে যে।

ম। রেলের লাইনের উপর দিয়ে আস্‌বার সময়, পাথরে লেগে পা ছড়ে গেছে।

ত। এমন বন্দোবস্ত কিন্তু আর কোথাও দেখিনি। না আছে একটা আলো—অন্ধকারেই এসে জাহাজে উঠ্‌তে হ'বে। উপরের ডেকে পর্য্যন্ত একটা আলো নাই। বলে, আলো থাক্‌লে সারেঙ্গ জাহাজ চালাতে পারে না।

ম। চা হ'য়ে গেল। খানকতক বিস্কুট বার ক'রে দে। ছেলেটি খাবে বোধ হয়? তুই একবার ডেকে নিয়ে আয়।

তরুণী ডাকিতে গেল। হিরণ্ময় ততক্ষণে আরোহীকে সব পরিচয় দিয়া ফেলিয়াছে। তাহার নাম—হিরণ্ময় রায়। পিতার নাম—শ্রীযুক্ত রুক্মিণীকুমার রায়। তিনি পাবনায় থাকেন। তাঁহার নিকটই ইহারা যাইতেছে। তরুণী তাহার দিদি ও মহিলাটি মা।

আরোহী হিরণ্ময়ের হাত ধরিয়া তরুণীর আহ্বানে ক্যাবিনের দরজার নিকট গেল। মহিলাটি বলিলেন "বাবা, তোমার নাম জিজ্ঞাসা করি নাই। আমাদের হাতে চা খেতে তোমার কোন আপত্তি আছে কি?"

আ। কিছু না। আপত্তি কিসের? আমার নাম—সীতাপতি মিত্র।

ম। পাবনাতেই কি তোমার বাড়ী?

সী। না, আমার বাড়ী ঢাকায়। আমাদের এক আত্মীয় তাঁর জমীদারী দেখ্‌তে পাবনায় এসেছেন। তিনি বাবাকে বিশেষ করে

লিখেছিলেন আমায় পাঠিয়ে দিতে। তাই আমি একবার দেখা কর্‌তে এসেছি।

ইত্যবসরে তরুণী প্লেটে বিস্কুট সাজাইয়া দিয়াছিল। মহিলা চা ঢালিয়া যুবককে দিলেন। যুবক চা খাইতে খাইতে বলিল "আর বেশী দেরী নাই। শীঘ্রই ষ্টীমার বাজিৎপুর ঘাটে পৌছিবে।"

চা খাওয়া শেষ হইলে সীতাপতি আবার হিরণ্ময়ের হাত ধরিয়া ডেকে আসিয়া বসিল। হিরণ্ময় কত কি বকিয়া যাইতে লাগিল, "আমি ঘুড়ি উড়াইতে পারি। বাবা বলেছে এবার আমায় লাল রঙ্গের মস্ত ঘুড়ি কিনে দেবে। আর একটা বোমা লাটাই। আমি সূতায় এমনি মাঞ্জা দোব যে কেউ আমার সঙ্গে প্যাঁচ খেল্‌তে পার্‌বে না। আচ্ছা, সূতায় একটা ছুরি বেঁধে দেওয়া যায় না? যে প্যাচ্‌ খেল্‌তে আস্‌বে, কচ্‌ করে তার সূতা কেটে যাবে?"

সী। তোমাদের সঙ্গে আর কেউ আসেনি?

হি। রামদীন দরওয়ান ছিল। মা বল্‌লে সে ভুল করে আগে গাড়ী থেকে নেমে পড়েছে। সে বোকা কি না। আমার ভুল হয় না। গাড়ী থাম্‌লে "কুষ্টিয়া" "কুষ্টিয়া" বলে ডাক্‌বে তবে ত' নাম্‌তে হয়? তা জানে না। তার আবার দাড়ী একটা কাপড় দিয়ে মাথার সঙ্গে বেঁধে রাখে। আবার সুখা খায়। তার পাগ্‌ড়ী দেখেন নি। মস্ত—এই এত বড়।

সী। তুমি পড়্‌তে জান না?

হি। দিদির কাছে প্রথম ভাগ পড়্‌ছি। দিদি কলেজে পড়ে কি না। বাবা বলেছে পাবনায় আমার একজন মাষ্টার রেখে দেবে। বুড়ো মাষ্টারের কাছে কিন্তু আমি পড়্‌ব না। আচ্ছা পড়্‌লে প্রাইজ দেয়, নয়? দিদি কত বই প্রাইজ পেয়েছে। আমি কিন্তু গান গাইতে

শিখেছি। গান গাইতে পারলেও প্রাইজ দেয়। দিদি হারমোনিয়ম বাজায়। আমি তার কাছ থেকে গান গাইতে শিখেছি।

সী। কই, গাও দেখি একটা গান।

হিরণ্ময় অমনি গান ধরিল—

"জীবনে যত কাজ হ'ল না সারা।
জানি হে জানি তাও হ'য়নি হারা॥"

দুই লাইন গাহিয়া বলিল "দূর—শুধু কি গান হয়? হারমোনিয়ম না বাজালে গান হয় না।"

সী। কেন হবে না? বেশ ত' গাচ্ছিলে, গাও, গাও।

হিরণ্ময় বলিল "না।" বলিয়া সীতাপতিকে টানিয়া বলিল "ঐ দিকে চলুন না। আমি জাহাজের কল দেখ্‌ব।"

সীতাপতি মৃদু হাসিয়া বালককে লইয়া সিঁড়ি দিয়া উপর ডেক্ হইতে নিম্নে নামিল।

নিম্নে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বসিবার জায়গা। বোঁচকা, বুঁচকি, ট্রাঙ্ক, বিছানা, ঝুড়ি, হাঁড়ি, টীনের কানাস্তারা, প্রভৃতি বহুবিধ মালের সহিত মানুষের ঠাসাঠাসি। কেহ বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। কেহ বা আবার বসিবার জায়গা না পাইয়া ট্রাঙ্কের উপর চাপিয়া বসিয়াছে। কোথাও কোন রমণী অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া রোদনপরায়ণ শিশুকে থামাইবার প্রয়াস পাইতেছে। পুরুষ আরোহীদের মধ্যে কেহ ঘুমাইতেছে, কেহ ঢুলিতেছে। কেহ সিগারেট্ ধরাইতেছে। কেহ বিড়ি টানিতেছে। কেহ বা ডেকের তক্তা বাজাইয়া বাজখাঁই সুরে রাগিনী আলাপ করিতেছে। কোথাও জেলেদের বৃহৎ চুপড়ীর গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও বা কাহার মৃণ্ময় তৈলপাত্রটি ভাঙ্গিয়া তৈলে ডেক্ ভাসিয়া গিয়াছে। মালিক পার্শ্বস্থ আরোহীর প্রতি

অসাবধানতার আরোপ করিয়া তুমুল কলহ করিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে যতটুকু পারে তেল চাঁচিয়া তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। কোথাও দুইজন পাইকার পাটের দর সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে। কোথাও বা দুই বৃদ্ধ "জিনিসপত্রের দর ক্রমশঃ আগুন হইয়া উঠিতেছে" এই মন্তব্যে এক মত প্রকাশ করিতেছে। "তুমি ত ভারি মজার লোক হে—গোটা জাহাজখানা কি রিজার্ভ করে নিয়েছ নাকি?" "আ মরণ, মিন্‌সে চোখের মাথা খেয়েছে নাকি? ছেলেটার গায়ের ওপর দিয়েই যাচ্ছে?" "আহা চটেন কেন? কতক্ষণের মামলা, একটু রয়ে-স'য়ে সকলকেই নিতে হয়।" ইত্যাকার বহুবিধ ধ্বনিতে স্থানটি মুখরিত হইয়া উঠিতেছে।

সীতাপতি হিরণ্ময়ের হাত ধরিয়া অতিকষ্টে একটু পথ করিয়া জাহাজের কলের নিকট গেল। কিন্তু বহুক্ষণ আর কল দেখা হইল না। জাহাজ বাজিৎপুর ঘাটের নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিল। সেই ভীড়ের মধ্যে নামিবার জন্য চাঞ্চল্য ও হুড়াহুড়ি প'ড়য়া গেল। ধীরে ধীরে জাহাজখানি তীরের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। জেটি নাই। দুইখানি অতি সরু তক্তা জাহাজের উপর হইতে ডাঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হইল। তাহা অবলম্বনে অতি ক্লেশে আরোহীরা তীরে উঠিতে লাগিল। ঠেলাঠেলিতে দুই একজন জলে পড়িয়া গেল। সেখানে অল্প জল। বিশেষ আঘাত লাগিল না বটে কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ জল ও কর্দ্দম-সিক্ত হইয়া গেল।

ঘাটে হ্যাটকোটপরা একজন ভদ্রলোক দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার পিছনে দুজন পাহারাওয়ালা। হিরণ্ময় তাঁহাকে দেখিয়াই সীতাপতিকে বলিল "ঐ যে বাবা!"

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা জাহাজ হইতে নামিয়া গেলে রুক্মিণীবাবু

জাহাজে আসিয়া উঠিলেন। হিরণ্ময় ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। বলিল "বাবা—রামদীন্‌টা ভুলে রেলগাড়ী থেকে কোথায় নেমে গেছে। আমাদের ইনি নিয়ে এসেছেন। আমি জাহাজের কল দেখেছি। ভাল করে সব দেখ্‌তে পাইনি। চল না আর একবার দেখাবে।"

রুক্মিণীবাবু হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, দেখাব চুপ কর্।" তারপর সীতাপতির দিকে ফিরিতেই সীতাপতি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া ব্যাপারটা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিল।

রুক্মিণীবাবু সীতাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন "আপনি পাবনায় কোথায় থাক্‌বেন?"

সী। কোথায় থাক্‌ব তা ঠিক নেই। একটা হোটেলে উঠ্‌ব। তারপর আমার আত্মীয়টির খোঁজ করে নিতে হবে।

রু। এ কি আর সে রকম সহর মনে কর্‌ছেন? হোটেলে কোথা থাক্‌বেন? আর থাক্‌তেই বা আপনাকে দেব কেন? চলুন —আমাদের সঙ্গে। তারপর আপনার আত্মীয়ের খোঁজ করে দেওয়া যাবে। তাঁর নাম কি?

সী। হৃদয়ভূষণ মিত্র।

রু। আমি তাঁকে চিনি না। অবশ্য আমি এই সম্প্রতি এখানে বদ্‌লী হ'য়ে এসেছি। পরিচয় হওয়াও সম্ভব নয়। তা যাই হোক্, সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি আসুন।

সী। আমি আর কেন আপনাদের কষ্ট দেব?

রু। বিলক্ষণ! ও—কি একটা কথা হ'ল। চলুন। কই আপনার জিনিসপত্র কোথা? এই পাঁড়ে—এই বাবুর জিনিস সব আমাদের বাড়ী নিয়ে যাবি।

এই বলিয়া রুক্মিণীবাবু কেবিনের দিকে অগ্রসর হইলেন সীতাপতি একটু দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। রুক্মিণীবাবু ক্যাবিনের দ্বারে পৌছিলে নীহার তাঁহাকে নমস্কার করিল। রুক্মিণীবাবু বলিলেন "কেমন ছিলে মা? কলেজ বোর্ডিংয়ে কোন কষ্ট হয় নি ত?"

নীহার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "না" পরে বলিল "আপনি এত রোগা হ'য়ে গিয়েছেন। খুব বুঝি খাটুনি পড়েছে?"

রু। না, খাটুনি আর এমন বেশী কি? তবে মাঝে ম্যালেরিয়া ধরেছিল।

তীরে পাল্কী ছিল। রুক্মিণীবাবুর পত্নী ও নীহার তাহাতে আরোহণ করিলেন। রুক্মিণীবাবু, সীতাপতি ও হিরণ্ময়কে লইয়া একখানি গাড়ীতে আরোহণ করিলেন।

রুক্মিণীবাবু ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। মাসখানেক হইল পাবনায় বদলী হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"ললিতমধুরাস্তে তে ভাবাঃ ক্ষিপন্তি চ ধীরতাম্।"

মালতী-মাধবম্

বেলা দ্বিপ্রহর। ইচ্ছামতী নদীতীরে পাবনা সহরের একপ্রান্তে রুক্মিণীবাবু বাসা লইয়াছিলেন। বাহিরের ঘরে আহারান্তে সীতাপতি ঈজিচেয়ারে অঙ্গ প্রসারিত করিয়া একখানা খবরের কাগজ পড়িতেছিল, এমন সময় উচ্চ চীৎকারের সহিত একখানা বাঁধান খাতা হাতে লইয়া হিরণ্ময় সেই গৃহে দৌড়াইয়া আসিল। আসিয়া খাতাখানা সীতাপতির ক্রোড়ের উপর ফেলিয়া দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "দিদি ধরতে আস্ছে। খাতা নেবে। লুকিয়ে রাখুন।"

সীতাপতি ঈষৎ হাসিয়া খাতাখানা খুলিয়া দেখিল। প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা ছিল—

জীবন-তটিনী।

সাধ হয়, বহে যাক্ মৃদু কলতানে
জাহ্নবীর মত এ জীবন।
লভি' জন্ম শিলাতলে,
রজত রেখার ছলে
ধীরে ধীরে যাক্ ধরি' সরণি আপন
শৈলদেহ বাহি স্রোত মন্থর গমনে
গিরিপদ করিবে চুম্বন॥

কতই বিটপি-পুঞ্জ কুঞ্জবন রচি'

কূলে তার শোভিবে মোহন,

প্রভাতে উঠিয়া রবি

হেরিবে বদন ছবি

বিমল শীতল জলে—মুকুরে যেমন,

হৃদয় প্রশান্ত, তৃপ্ত, রবিচ্ছবি ধরি'

কেবল পুলকে শিহরণ ॥

মধ্যাহ্নে গলিত স্বর্ণে রঞ্জিত সে কায়

লাবণ্যের লহরী বিশাল,

রবিচূর্ণ শত শত

তরঙ্গে তরঙ্গে নত

সুনীল সলিল—দূর মূরতি করাল,

গগন জলদ-হীন যেন দেখা যায়

প্রকৃতির মুক্ত কেশজাল ॥

সায়াহ্নে অলস ক্লান্ত আসিবে তপন

জুড়াইতে শীতল সলিলে,

নিমজ্জিবে দেহ তার

দূর হবে ক্লেশ ভার

ধরিবে হৃদয়ে তারে মহা-কুতূহলে

প্রস্ফুট কুসুম-বাস ভরিয়া কানন

সুরভিত করিবে অনিলে ॥

হিরণ্ময় আর পড়িতে দিল না। বলিল "এ সব দিদির লেখা। কাউকে দেখ্‌তে দেয় না। বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। আজকে যেমনি বাক্স খুলে পশম বের করতে গিয়েছে অমনি আমি খাতা নিয়ে

দে'ছুট্। আমি বাবাকেও একদিন দেখিয়েছি। আর একখানা ছবির খাতা আছে। সেখানা একবার যদি পাই দুখানা ছবি কেটে দেয়ালে জল দিয়ে এঁটে দোব।"

সীতাপতি পাতা উল্টাইয়া দেখিল, খাতাখানির তিন চতুর্থাংশ কবিতায় ভরা, বাকি পৃষ্ঠাগুলি সাদা রহিয়াছে। কবিতাগুলি রচনার সময়ই যেমন কাটাকুটি থাকে, সেইরূপই রহিয়াছে। নকল করিয়া রাখা হয় নাই। সীতাপতি খাতাখানি পড়িতে লাগিল।

সকলগুলিই মধুর শব্দবিন্যাসে, সুমিষ্ট ছন্দে রচিত। স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে ইচ্ছামতীর কলতানের সঙ্গে সুর মিলাইয়া সীতাপতির মৃদু গুঞ্জন-রবে পঠিত কবিতাগুলি এক কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি করিয়া ফেলিল। সে জগতে শুধু হাসি—শুধু বাঁশী—শুধু আলো—শুধু গান—শুধু মলয়ের প্রবাহ—শুধু ফুলের সৌরভ। আর সেই পরীরাজ্যের রাজা ও রাণী—কাহারা?

প্রমত্ত যৌবনে এমনই একটা না একটা দিন সকলেরই আসে। সেদিন সংসারের সব কথা—সব ঘটনা ডুবিয়া যায়। অদৃশ্যস্থিত কোন্ দেবতার কর-সঞ্চালনে যৌবন প্রেম ও সুখের তিনখানা কাচ-খণ্ডের বেষ্টনে তুচ্ছ ঘটনারূপ কাচের টুকরাগুলি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নব নব সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব দৃশ্য উদ্ভাসিত করিতে থাকে। আজ সীতা-পতিরও বুঝি তাহাই ঘটিল।

কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে তাহা সীতাপতি জানিত না। হিরণ্ময় তাহাকে ঠেলিয়া বলিল "দেখুন—দেখুন—কেমন ছবি করেছি।" সহসা স্বপ্নঘোর ভাঙ্গিয়া গেলে লোকে যেমন চমকিয়া উঠে তেমনি ভাবে সীতাপতি হিরণ্ময়ের দিকে চাহিয়া দেখিল।

হিরণ্ময় বড় সুবিধা পাইয়াছিল। সীতাপতি যখন কবিতা পাঠে

নিযুক্ত তখন সে তাহার পিতার টেবিলের ড্রয়ার হইতে কাঁচি-খানি বাহির করিয়া সীতাপতি যে খবরের কাগজখানি পড়িতেছিল, তাহা তুলিয়া লইয়া তাহার বিজ্ঞাপনের সব ছবিগুলি একে একে কাটিয়া ফেলিয়াছিল। এখন সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া সীতাপতিকে দেখাইতেছিল।

সীতাপতি বলিল "এ কি করেছ খোকা? কাগজখানা সব কেটে ফেলেছ?"

হি। ও আর কি হবে? বাবা বলেছে খবরের কাগজ কাট্‌লে কিছু হয় না। বই কাটতে নেই। বই কাট্‌লে দোষ হয়, নয়?

সীতাপতি হাসিয়া বলিল "হ্যাঁ। হয় না আবার? খুব দোষ হয়। তুমি কাঁচি পেলে কোথা?"

হি। বাবার ড্রয়ার থেকে নিয়েছি। আজ বাবা চাবি বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছে। আমি একটা পয়সাও বের করে নিচ্ছি।

সী। না ছি। পয়সা নিতে নেই। পয়সা নিতে নেই। পয়সা কি করবে?

হি। লজঞ্জুস্ কিন্‌ব। বা-রে পয়সা না দিলে কি অমনি দেবে? কখ্‌খনো দেবে না।

সী। আচ্ছা, আমি বিকালে তোমায় লজঞ্জুস্ কিনে এনে দোব। তোমার দিদিকে খাতা দিয়ে এস। তা না হ'লে কিন্তু দোব না।

হি। ঠিক্ দেবেন?

সী। ঠিক্।

হি। আচ্ছা। খাতা আমি এক্ষুণি দিয়ে আসছি। ছোট

লজঞ্জুস্ কিন্তু আমি নোব না। যেগুলো খেতে খেতে নানা রকম রং হয় সেই রকম চাই।

সী। সেই রকমই এনে দোব। যাও খাতা দিয়ে এস।

হিরণ্ময় দৌড়িয়া খাতা লইয়া চলিয়া গেল।

সীতাপতি চোখ্ বুজিয়া ঈজি চেয়ারখানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিল। সে ভাবনায় তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের চিত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল —আর সেই ভবিষ্যৎ জীবনের সুখের সঙ্গে যাহার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ— তাহার চিত্রও ক্ষণে ক্ষণে বিবিধরূপে দেখা দিতেছিল।

সীতাপতি এম্, এ পাশ করিয়া ঢাকা কলেজে বি, এল্ পড়িতেছিল। তাহার পিতা ঢাকার কোন স্কুলে অল্প বেতনে মাষ্টারী করিতেন। বহু ক্লেশে এই বড় ছেলেটিকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। সীতাপতির আরও অনেকগুলি ভাইবোন্। অতি কষ্টে তাহাদের সংসার চলিত। তাহাদের যে সকল আত্মীয় ছিলেন, তন্মধ্যে হৃদয়বাবুই ধনাঢ্য। এই হৃদয়বাবুর নিকট হইতে সীতাপতির পিতা যেদিন সহসা এক পত্র পাইলেন যে তাঁহার বড় ছেলেটিকে হৃদয়বাবু একবার দেখিতে চান, সে দিন আসন্ন শুভ সম্ভাবনায় তাঁহার হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল। পুত্রকে বারংবার বহু উপদেশ দিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

হৃদয়বাবু পাবনার একটা জমিদারীর তদারকে আসিয়াছিলেন। সহরে একদিন থাকিয়া মফস্বলে নিজ তালুকে চলিয়া গিয়াছিলেন। সীতাপতি তাঁহার অপেক্ষায় কয়েকদিন রুক্মিণীবাবুর বাড়ীতেই কাটাইতে লাগিল।

সীতাপতির পিতা বলিয়া দিয়াছিলেন "দেখ বাবা! যাঁর কাছে যাচ্ছ তিনি বড়লোক, মেজাজটাও কড়া। তাঁকে চটিও না। তাঁর অনুগত হয়ে চ'লো। আমাদের অবস্থা ত দেখ্তে পাচ্ছ। হৃদয়-

বাবুর মত একজন মুরুব্বি সহায় পেলে তোমার ভবিষ্যতের ভাবনা থাক্‌বে না। ভগবান্ যদি এ সুযোগ মিলিয়ে দিলেন ত নিজের দোষে যেন তা হারিও না।"

সীতাপতি তখন সবেমাত্র এম্, এ পাশ করিয়াছে—সংসারের কিছু ধার ধারিত না। কাজেই সাংসারিক জ্ঞানের পরিপক্কতার যে উপদেশ তাহার পিতা দিলেন, তাহা ঠিক্ সে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। কেবল বলিয়াছিল "যে আজ্ঞে।"

আজ আবার পিতার সেই কথাগুলি মনে হইতে লাগিল। আজ কথাগুলির অন্য প্রকার আলোচনা করিতে লাগিল। সীতাপতি ভাবিল "মুরুব্বির দরকার কি? আমি নিজে কি নিজের দু'মুটো ভাতের যোগাড় ক'রে নিতে পার্‌ব না!"

এই আত্মনির্ভরতার কথা ভাবা তাহার এখন দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। কেননা সে কল্পনায় নিজের যে ভবিষ্যৎ গঠিত করিতেছিল, তাহা সফল করিতে গেলে তাহার পিতা, মাতা, ভাই বোন্, আত্মীয়, স্বজন, সমাজ, সব ছাড়িতে হইবে। থাকিবে কেবল—নীহার। রুক্মিণীবাবুরা যে ব্রাহ্ম।

এই সময় রামদীন্ মিশির আসিয়া জানাইল "একজন বাবু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছেন।"

সীতাপতি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে গেল। বাহিরে হৃদয়বাবু দাঁড়াইয়াছিলেন। সীতাপতি প্রণাম করিতেই বলিলেন "তোমারই নাম সীতাপতি? চল, আমার সঙ্গে। কথা আছে।"

সীতাপতি শালখানা লইয়া জুতাটা বদ্‌লাইয়া বাহির হইল। হৃদয়বাবু ইচ্ছামতীর তীরে দাঁড়াইয়া বলিলেন "দেখ বাবা, আমার সংসারের সমস্ত ঘটনা জান বোধ হয়। শচীনকে আমি ত্যাজ্যপুত্র

ক'রেছি—বৌমাও আমার বাড়ীতে নেই। সেইজন্য আমি তোমাকে পোষ্যপুত্র নিতে ইচ্ছা করি। তোমার বাপকে লিখেছিলুম। আজ তাঁর চিঠির জবাব পেয়েছি। তাঁর কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তোমরা এখন লেখাপড়া শিখেছ, বড় হয়েছ, তোমাদের একটা মতামত লওয়া দরকার। এই তোমার বাবার চিঠি পড়।"

এই বলিয়া হৃদয়বাবু পকেট হইতে একখানা খাম ছেঁড়া চিঠি বাহির করিয়া সীতাপতির হাতে দিলেন।

সীতাপতি পড়িয়া দেখিল তাহার পিতা এ প্রস্তাবে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন ও হৃদয়বাবুর নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। শেষে লিখিয়াছেন "সীতাপতিকে আমি আপনার হাতেই দিলুম। আপনি তার ভালর জন্য যে ব্যবস্থা করিবেন তাহা সে মানিতে বাধ্য এবং নিশ্চয়ই মানিবে।"

হৃদয়বাবু বলিলেন "আমি অনেকদিন থেকে তোমাদের খবর নিচ্ছিলুম। তোমার সম্বন্ধেও খোঁজ করে যা জেনেছি তাতে তুমি আমাদের বংশের মান রক্ষা কর্‌বার সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলে আমার বিশ্বাস। এখন তোমার মতটা একবার জান্‌তে চাই।"

সীতাপতির মনে একসঙ্গে অসংখ্য চিন্তার উদয় হইতেছিল। সে হৃদয়বাবুর অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়াছিল। শচীন্দ্র বা মালতীকে সে দেখে নাই, কাজেই তাহারা কেন তাড়িত হইল তাহা জানিবার জন্য একটু কৌতূহল হইলেও বিশেষ কোন আগ্রহ হইল না। হৃদয়বাবুকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করাও সে সমীচীন মনে করিল না। সে নিজে দরিদ্রের সন্তান, আজীবন দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। সহসা বিনা আয়াসে এই অতুল সম্পত্তি তাহার করতলগত হওয়ার সম্ভাবনায় তাহার মন একদিকে

উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল, অন্যদিকে তাহার নব-উন্মেষিত অনুরাগ আসিয়া তাহাতে বাধা জন্মাইতেছিল। বহুক্ষণ দ্বন্দ্বের পর সীতাপতি নিজের মনকে বুঝাইল "এখন ত কলিকাতায় যাই, পরে হৃদয়বাবুকে বুঝাইয়া নীহারের সহিত বিবাহে সম্মত করাইব।"

সীতাপতি বলিল "আমার আর মত কি? বাবা যা ভাল বিবেচনা করেছেন, আপনি যা ভাল মনে করছেন, তার উপর আর আমি কি বল্‌ব? আপনাদের চেয়ে কি আর আমি বেশী বুঝি?"

হৃদয়বাবু অতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন "তবে আজ সন্ধ্যার সময় আমরা কল্‌কেতায় যাব। তৈয়ার থেক'। তুমি ডেপুটিবাবুর বাসায় কি ক'রে উঠ্‌লে?"

সীতাপতি সংক্ষেপে ঘটনাটা জানাইল। শুনিয়া হৃদয়বাবু বলিলেন "ওখানে উঠে ভাল কর নাই। তুমি জাননা বোধ হয় ডেপুটিবাবু ব্রাহ্ম। যা' হোক্, যা হয়ে গেছে তার আর উপায় নেই। আজই ওখান থেকে বিদায় নিয়ে আমার বাসায় চল।" এই বলিয়া হৃদয়বাবু তাঁর বাসাটা কোথায় তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

সীতাপতি বলিল "ডেপুটিবাবু এলেই আমি তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে আপনার বাসায় যাব।"

"আচ্ছা।" বলিয়া হৃদয়বাবু চলিয়া গেলেন। সীতাপতি সেই-খানে একটা গাছের গোড়ায় বসিয়া পড়িল। বসিয়া ইচ্ছামতীর তরঙ্গের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"তুষারলেখাকুলিতোৎপলাভে
পর্য্যশ্রুণী—"

কিরাতার্জ্জুনীয়ম্।

হিরণ্ময় খাতা ফিরাইয়া দিতে গিয়া দেখিল, নীহার কার্পেটে ফুল বুনিতেছে। সে দূর হইতে খাতাখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পলাইবার মতলব করিয়াছিল, কারণ ইহার আগে যেদিন সে আর একবার খাতাখানি চুরি করিয়া তাহার পিতাকে দেখাইয়াছিল, সেদিন নীহার তাহাকে প্রহার করিয়াছিল। আজ কিন্তু নীহারের মুখভাব সেরূপ দেখিল না। বরং নীহার নিজেই বলিল "খাতাখানা এনেছিস্? দে।"

হিরণ্ময় সাহস পাইয়া একটু অগ্রসর হইয়া হাত বাড়াইয়া খাতাখানা দিল। এক একবার পিছন দিকের উন্মুক্ত দ্বারের প্রতিও দৃষ্টি করিতেছিল, বেগতিক দেখিলে পলাইবে। কিন্তু আজ তাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। নীহার বলিল "বোস্ না। কেমন ফুল তুল্‌ছি দেখ্।"

হিরণ্ময় তখন নির্ভয়ে নীহারের গা ঘেঁসিয়া বসিল। নীহার জিজ্ঞাসা করিল "খাতা কোথা নিয়ে গিয়েছিলি?"

হি। সীতাপতি বাবুকে দেখাতে। তিনি সবটা পড়ে দেখেছেন। বেশ সুন্দর ক'রে পড়্‌তে পারেন। যেমনি তিনি পড়্‌তে লাগ্‌লেন, অমনি আমি তাঁর খবরের কাগজ থেকে সব ছবিগুলি কেটে নিয়েছি। একটা হাতীর যা ছবি পেয়েছি—দেখ—।

এই বলিয়া হিরণ্ময় একটা সুবৃহৎ হাতীর ছবি দেখাইল।

নীহার বলিল "প'ড়ে কি বল্‌লেন ?"

হি। বল্‌লেন খাতা দিয়ে এস। আমায় আবার লজঞ্জুস্ কিনে' এনে দেবেন। আমি কাউকে তার একটাও দোব না কিন্তু—সব একলা খাব।

নীহার সে কথায় কাণ দিল না। যন্ত্রচালিতের মত তাহার আঙ্গুলগুলি বুনিতে প্রবৃত্ত ছিল বটে, কিন্তু তাহার মন সেদিকে ছিল না। ছেলেবেলায় কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রত্যেক কাণ্ডের উপর যে সংস্কৃত শ্লোকটি পড়িয়া পড়িয়া মুখস্থ করিয়াছিল, তাহার দুইটি কথা তাহার মনের মধ্যে জাগিতেছিল—"সীতাপতিং সুন্দরম্।" কেন জাগিতেছিল তাহা সে নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই।

বেলা চারিটার সময় রুক্মিণীবাবু বাসায় আসিলেন। সীতাপতি তখন বাহিরের ঘরে বসিয়াছিল। রুক্মিণীবাবু কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া সীতাপতিকে জল খাইবার জন্য ভিতরে ডাকিলেন।

সীতাপতি এই সময় বিদায়ের কথাটা পাড়িল। নীহারও সেখানে ছিল। সীতাপতি বলিল "আমি আজ কল্‌কেতা যাব। যাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌বার অপেক্ষায় ছিলাম, তাঁর সঙ্গে আজ দেখা হয়েছে। আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই।"

রুক্মিণীবাবু। আজই যাবে? আর দু'দিন থেকে গেলে হ'ত না।

সীতাপতি পূর্ব্বেই রুক্মিণীবাবুকে বলিয়াছিল "আমাকে 'তুমি' বলেই কথা বল্‌বেন। 'আপনি' বল্‌লে লজ্জিত হই।"

সী। আজ্ঞে না। আমার আত্মীয় আজই যাবেন। তাঁর ইচ্ছা আমিও আমিও তাঁর সঙ্গেই যাই।

সীতাপতি দেখিল নীহারের মুখ ম্লান হইয়া গেল। রুক্মিণীবাবু বলিলেন "আমাদের ভুলে যেও না যেন। চিঠিপত্র লিখ।"

সী। নিশ্চয়ই লিখ্‌ব।

নীহার মনে মনে বুঝিল তাহার দু' একটা কথা এই সময় বলা উচিত, কিন্তু কি জানি কেন তাহার মুখ দিয়া একটিও কথা বাহির হইল না। বরং সে একটা অছিলায় সে স্থান হইতে চলিয়া যাইতে চাহিতেছিল। রুক্মিণীবাবু জল চাহিতেই সে চলিয়া গেল। কিন্তু সে নিজে জল আনিল না। ঠাকুরকে দিয়া পাঠাইয়া দিল।

সেইদিন অপরাহ্নে সীতাপতি যখন বিদায় লইয়া চলিয়া গেল রুক্মিণীবাবু তখন গেটের নিকট হিরণ্ময়ের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। হিরণ্ময়ের পকেট লজঞ্জুসে ভরা—একটা তাহার মুখে ছিল। সীতাপতি দেখিতে পাইল না জানালায় পর্দ্দার পাশে দাঁড়াইয়া নীহার সাগ্রহ-দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়াছিল।

সেইদিন রাত্রিতে নীহার কবিতার খাতাখানি বাহির করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কি লিখিল। যখন শুইতে গেল, তখন বৈঠকখানার ক্লক্ ঘড়িতে 'ঠং' করিয়া একটা বাজিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"নিয়তির্বিধায় পুংসাং প্রথমং সুখমুপরি দারুণং দুঃখম্।
কৃত্বালোকং তরলা তড়িদিব বজ্রং নিপাতয়তি॥"

হর্ষচরিতম্।

সকালবেলায় জেলের কয়েদীগণ হাজিরা দিবার জন্য সারবন্দী হইয়া দাঁড়াইতেছিল। হাজিরা হইয়া গেলে যে যার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।

কয়েদীগণের মধ্যে বয়স, আকৃতি ও চরিত্রগত বহু পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইতেছিল। যাহারা দাগী আসামী, পুরাতন কয়েদী তাহাদের চালচলনে হাবভাবে একটা নীচতার অন্তরালে ঔদ্ধত্যের ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। ইহারা নূতন ও দুর্ব্বল কয়েদীগণের প্রতি অত্যাচারপরায়ণ, জেলের রক্ষকদিগের পদানত কুক্কুর। নিজেদের অবস্থা তাহাদের সহিয়া গিয়াছিল। নিম্নস্বরে পরস্পরের মধ্যে হাস্য-পরিহাস করিতে করিতে তাহারা সার দিয়া দাঁড়াইতেছিল।

যাহারা এই প্রথম কোন অপরাধে জেলে আসিয়াছে, তাহারা অপমান ও লজ্জার ভাবটা কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। নীরবে, অনেকটা যেন আত্মগোপন করিবার মত তাহারা হেঁটমুখে সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইতেছিল।

দুইজন ওয়ার্ডার একটু তফাতে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতে-

ছিল। ইহারা দুইজনেই পুরাতন কয়েদী। ডাকাতী মোকদ্দমায় দণ্ডিত হইয়া জেলে আসিয়াছিল। পরে রক্ষকদের অজস্র তোষামোদ ও সাধারণ কয়েদীদের প্রতি কঠোর ব্যবহারের গুণে ওয়ার্ডারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একজন মুসলমান, নাম হোসেন আলি। অপরটি হিন্দু, নাম মুকুন্দ।

হোসেন বলিতেছিল "বাবু ব্যাটাকে কাল খুব জব্দ করে দিয়েছি। ব্যাটা এখানে আবার ভদ্রলোক সাজ্‌তে চায়। দেখায় যেন আমাদের চেয়ে উনি উঁচুদরের লোক। কাল একেবারে সিধে করে দিয়েছি।"

মু। কি রকম?

হো। কাল বাছাধনের কাপড়ের খুঁট থেকে তামাক বের করে দিলুম।

মু। ওকি তামাক খায় নাকি?

হো। তবে আর মজাটা কি? তামাক ত ও খায়ই না। কিন্তু তার প্রমাণ কি? ধরা পড়্‌তেই বেতের হুকুম হ'য়ে গেল। এ যে কার হাত সাফাই তা আর বুঝ্‌বে কে?

মু। বটে? ওসব ভদ্রলোক বাবুদের ঐ রকম হওয়াই চাই। তোরাও যে আমরাও সে। এর মধ্যে আবার ছোট বড় কে? শালারা—"

যাহার সম্বন্ধে ইহারা আলাপ করিতেছিল সে উমানাথ। সে তখন আসিয়া সারের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পাশে একজন বৃদ্ধ জ্বরে কাঁপিতেছিল। পূর্ব্বদিন রাত্রি হইতে তাহার জ্বর হইয়াছিল। আজ সকালে সে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, মাথা যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছিল। কিন্তু ওয়ার্ডার তাহাকে গুঁতা মারিয়া তুলিয়া দিল।

বলিল "চালাকি পেয়েছিস্? দাঁড়া বাইরে গিয়ে। ডাক্তার বাবু এসে দেখ্‌লেই ভিট্‌কিলিমি বেরিয়ে যাবে।"

অগত্যা বৃদ্ধ কাঁপিতে কাঁপিতে কম্বলখানা মুড়ি দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। হোসেন আলি গিয়া তাহাকে এক ধাক্কা দিয়া বলিল "এই সোজা হ'য়ে খাড়া হ'।" বৃদ্ধ একে জ্বরে কাঁপিতেছিল, তাহার উপর এই ধাক্কা খাইয়া একেবারে মাটিতে পড়িয়া গেল।

যাহারা পুরাতন কয়েদী, যাহাদের চক্ষের সম্মুখে এইরূপ ঘটনা কত ঘটিয়াছে, তাহারা চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু উমানাথ বসিয়া পড়িয়া বৃদ্ধকে তুলিয়া ধরিল। বৃদ্ধ ক্রন্দনপূর্ণ স্বরে বলিতে লাগিল "আমি আর দাঁড়াতে পারব না। আমি আর দাঁড়াতে পারব না।"

উমানাথ বলিল "তোমায় দাঁড়াতে হবে না। শুয়েই থাক।"

এই সময় দূরে জেলারবাবু আসিতেছিলেন দেখা গেল। প্রহরীরা সজাগ হইয়া উঠিল। হোসেন আলি উমানাথকে একটা গুঁতা মারিয়া বলিল "এই—ওঠ্—খাড়া হ'।"

রাগে উমানাথের চক্ষু দুইটি জ্বলিয়া উঠিল। বলিল "না—আমি উঠ্‌ব না।"

হোসেন আলি পুনরায় তাহাকে এক গুঁতা মারিয়া বলিল "ওঠ্—বল্‌ছি। তোর নিজের চরকায় তেল দে। শালা—"

উমানাথ লাফাইয়া উঠিল। পূর্ব্বদিনের সঞ্চিত সমস্ত ক্রোধ তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সে একলম্ফে হোসেন আলির ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহার টুঁটি চাপিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল ও নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে লাগিল।

ব্যাপার দেখিয়া জেলারবাবু দ্রুতপদে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আজ্ঞায় ৩।৪ জন প্রহরী উমানাথকে ছাড়াইতে গেল। কিন্তু উমানাথ তখন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে। সবলে সে হোসেন আলির গলা টিপিয়া ধরিয়াছিল। তাহার মুষ্টি হইতে কেহ হোসেন আলিকে তৎক্ষণাৎ ছাড়াইতে পারিল না। হোসেন আলির চক্ষু তখন কপালে উঠিয়াছে। শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে।

জেলারবাবু সক্রোধে হুকুম দিলেন "মারো শালাকো।" হুকুম পাইবামাত্র একজন প্রহরী রুল দিয়া উমানাথের মস্তকে সজোরে আঘাত করিল। উমানাথ সে আঘাতে সংজ্ঞা হারাইল। হোসেন আলির গলদেশ হইতে তাহার হাত শ্লথ হইয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তারবাবু আসিলেন। পরীক্ষার পর উমানাথ ও বৃদ্ধকে জেলের অন্তর্গত হাঁসপাতালে প্রেরণের আদেশ দিলেন।

রাত্রিতে উমানাথের সংজ্ঞা হইল। পাশের বিছানা হইতে কে কথা কহিতেছিল। উমানাথ বুঝিল সেই বৃদ্ধ কয়েদী। বৃদ্ধ আর একজন কয়েদীকে বলিতেছিল—

"ভাই তুমি আর সাতদিন পরে খালাস হ'বে। আমি মর্‌বার সময় দিব্যি দিয়ে যাচ্ছি—এ কাজটি ক'রো। আশা ছিল, খালাস পেয়ে আমি নিজেই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব। কিন্তু ভগবান আমায় একেবারে খালাস দিচ্ছেন। আমি আমার এক আপনার জনকে ঠকিয়ে মহাপাপ করেছি। তার দুটি মেয়ে। জানি না তারা কোথায়—বেঁচে আছে কি মরেছে। কিন্তু তাদের খোঁজবার ভার তোমার উপর। তাদের জন্য আমি টাকা জমিয়ে রেখেছি—এ কথা আর কেউ জানে না। দুশ' একশ টাকা নয়—অনেক টাকা। তাদের খোঁজ করতে পারলে, তারা এ টাকা পেলে তোমারও ভাল হ'বে। তোমার পরিশ্রম বৃথা

হ’বে না। কত টাকা জান? অনেক টাকা। শোন, কাণে কাণে বলি—”

উমানাথ কিছুক্ষণ আর কোন কথা শুনিতে পাইল না। খানিক পরে আবার শুনিল “মনে রেখো—দুই মেয়ে—হৃষীকেশ দত্ত। ভবানীগঞ্জে বাড়ী। যা বল্‌লুম ক’রো। নইলে ম’লেও আমি তোমায় ছাড়ব না।”

খানিকক্ষণ আবার সব চুপচাপ্‌। পরে বৃদ্ধ আবার বিড়্‌ বিড়্‌ করিয়া বকিতে লাগিল। সে বকার কোন অর্থ উমানাথ বুঝিতে পারিল না। আসন্ন মরণের স্পর্শে বোধ হয় তাহার মতিভ্রংশ হইয়াছিল। তাই অসংলগ্ন কত কি বকিয়া যাইতেছিল। তবে এইটুকু মনে হইল, বৃদ্ধ বোধ হয় এককালে সম্ভ্রান্তবংশীয় ছিল। অর্থের অভাবে ন্যায্য অধিকারীকে বঞ্চিত করিয়া ধন সম্পত্তি লাভ করে। পরে পুনর্ব্বার পাপপথেই ধন উপার্জ্জনের চেষ্টায় কারারুদ্ধ হয়। মুক্তির আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া বৃদ্ধ কেবল দিন গণিতেছিল—কবে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। আজ তাহার সকল ফুরাইল।

বৃদ্ধ গেঙ্গাইতে লাগিল। উমানাথ বলিল “কি, অমন কচ্ছ কেন?” বৃদ্ধ উত্তর দিল না। অপর কয়েদী বলিল “বোধ হয় অবস্থা খারাপ।”

উমানাথ চেঁচাইয়া ডাকিল “পাহারাদার।”

বাহির হইতে কোন শব্দ শুনা গেল না। পুনঃ পুনঃ ডাকাতে সুপ্তোত্থিত প্রহরী ক্রুদ্ধকণ্ঠে ধমক দিয়া বলিল “চুপ রহো। চিল্লাওগে ত ডাণ্ডা খাওগে।”

উমানাথ তবু বলিল “আরে বুড্‌ঢা মর্‌ যাতা হ্যায়।”

প্রহরী বাহির হইতে হাঁকিল “যানে দেও।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"হৃদয়ের অন্তঃপুরে নব বধূটির মত
ভালবাসা মৃদুপদে করে বিচরণ,
পশিলে আপন কাণে আপনার মৃদু গীত
সরমে আকুল হ'য়ে মরে সে তখন;
আপনার ছায়া দেখি দূরে দূরে সরি যায়,
অযুত অযুত ফুল ফুটে তার পায় পায়।"

কামিনী রায়

সীতাপতি ত চলিয়া গেল। কিন্তু নীহার আর আগেকার মত সে নীহার নাই। কন্দর্পদেবতাটি ত কাল্পনিক নন। ধনুঃশর তাঁহার ফুলময়—কারণ প্রণয়ের আঘাত কোমল। আবার সেই কোমল শরের আঘাতেই যুবজন-হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কঠিন অপেক্ষা কোমল আঘাতই অনেক সময় মর্ম্মভেদী। ব্যঙ্গবিদ্রূপের একটি বাণী যেরূপ মর্ম্মে লাগে, তীব্র গালিও সেরূপ লাগে না। বসন্ত, মলয় মদনের সখা, কারণ মদনোদয়ে শুষ্ক নীরস শীতসঙ্কুচিত মনঃ-পাদপও ফুলে ফলে ভরিয়া উঠে। ভ্রমরপংক্তিও তাই মদনের মৌর্ব্বী—তাহাদের গুঞ্জন বাস্তব জগত ভুলাইয়া স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করে। কন্দর্প-সৃজনকারী কবিপ্রতিভা বাস্তবের আলোক-সম্পাতে সমুজ্জ্বল।

নীহারের সমস্ত জীবন এখন নূতন হইয়া উঠিয়াছে। 'পরশমণি'র প্রবাদটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। নহিলে নীহারের আশৈশব অভ্যস্ত জীবন-প্রবাহ আজ একেবারে নূতন পথ ধরিল কেন? তাহার 'জীবনতটিনী' আজ দুকূল ভাঙ্গিতে চায় কেন? কন্দর্প ঠাকুরের বাহাদুরি আছে বলিতে হইবে।

বেথুন কলেজ বোর্ডিংএ সেই সখীদের লইয়া খেলা, রাঁধাবাড়া, তুচ্ছ তর্ক, পড়া শুনা লইয়া আপনাকে ভুলাইয়া রাখা আজ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কবিতার খাতাখানির শাদা পাতাগুলি আজকাল খুব শীঘ্র শীঘ্র ভরিয়া উঠিতেছে। কিন্তু সে কবিতাগুলির সহিত আর আগের কবিতাগুলির মিল নাই! যেন দুইভাগ দুইজনের লেখা। যেন কেন, বাস্তবিকই আগেকার লেখিকা আর বর্তমান নীহার সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র।

রুক্মিণীবাবু ও তাঁহার পত্নী প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন "তোর কি হ'ল রে?" নীহার বলে "কই, কিছু হয় নি ত।"

কলিকাতায় পৌছিয়া সীতাপতি রুক্মিণী বাবুকে একখানি পত্র দিয়াছিল। তাহাতে তাহার কলিকাতার ঠিকানা জানাইয়াছিল। নীহার সে চিঠিখানি সংগ্রহ করিয়াছিল।

এই সময় একদিন রুক্মিণীবাবু আসিয়া জানাইলেন যে, তিনি আলিপুরে বদলী হইয়াছেন। কলিকাতাতেই একটা বাসা ভাড়া করিবেন। এ সংবাদে নীহারের মন কত সম্ভাবনাই দেখিতে লাগিল। কলিকাতায় গেলে আবার সীতাপতির সহিত দেখা হইবে।

* * * * *

একদিন বেলা প্রায় তিনটার সময় সীতাপতি মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে একখানা দ্বিতল বাড়ীর বারান্দা হইতে কে তাহাকে ডাকিল "সীতাপতি বাবু।" সীতাপতি চমকিয়া উপরে চাহিয়া

দেখিল হিরণ্ময়। বিস্মিত হইয়া বলিল "কি খোকা? এখানে কবে এলে?"

হি। আমরা পরশু এসেছি। আপনি জানেন না? বাবা ত আপনাকে চিঠি দিয়েছিলেন।

সী। কই, আমিত চিঠি পাই নি। তোমার বাবা কি ছুটি নিয়েছেন? কারও অসুখ বিসুখ করে নি ত?

এই 'কারও' শব্দে যে আশঙ্কা সীতাপতির কথায় প্রকাশ পাইল, তাহা বুঝিবার ক্ষমতা হিরণ্ময়ের ছিল না। সে বলিল "বা-রে। অসুখ কর্‌বে কেন? মা, দিদি কারও অসুখ করে নি। বাবা যে বদ্‌লী হয়েছেন। আলীপুরে বদ্‌লী হয়েছেন। সেই যেখানে চিড়িয়াখানা আছে। বাবা বলেছেন আমাকে চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে যাবেন। সিঙ্গি-বাঘ সব দেখ্‌ব।"

সী। তোমার বাবা কাছারী গেছেন বুঝি?

হি। হাঁ। আপনি আসুন না।

সী। এখন যাই—কাজ আছে। সন্ধ্যার সময় আস্‌ব এখন। তোমার জন্য লজঞ্জুস্ আন্‌ব।

হি। আমার এক বোতল লজঞ্জুস্ আছে। বাবা কাল কিনে দিয়েছেন।

সী। তবে কি চাই?

হি। কিচ্ছু চাই না। আমার ঘুড়ি, লাটাই, কত কি বাবা কিনে দিয়েছেন। আসুন না, দেখাই।

সী। সন্ধ্যার সময় দেখ্‌ব এখন।

এই বলিয়া সীতাপতি চলিয়া গেল। যাইবার আগে তাহার উৎসুক

নয়ন একবার ঐ দ্বিতলের জানলার খড়খড়ির দিকে চাহিয়াছিল, যদি আর কাহাকেও দেখিতে পায়। কিন্তু সে আশা সফল হইল না।

সেইদিন হইতে হৃদয়বাবু দেখিতে পাইলেন যে সীতাপতির বেড়াইবার খুব সখ্ হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় তিন চার ঘণ্টা ত সে বাড়ীতে থাকিতই না, তার উপর প্রায়ই সকালবেলাও সে বেড়াইতে বাহির হইত। ঘরের গাড়ী থাকিতেও সে হাঁটিয়া বাহির হইত। হৃদয়বাবু এজন্য একদিন অনুযোগ করিলে সীতাপতি বলিয়াছিল "গাড়ী ক'রে বেড়ালে আর বেড়ান কি হ'ল? হাঁটাই দরকার।" কিন্তু এই দরিদ্রের পুত্র সীতাপতির এতাদৃশ বিলাস-বিমুখতার গূঢ় কারণটি অত বড় বিষয়ী হৃদয় বাবুরও চক্ষু এড়াইয়া গিয়াছিল। তিনি এটা একবারও ভাবেন নাই যে, কলিকাতায় প্রথম আসিয়া যে সীতাপতি গাড়ী ভিন্ন কখনও বাড়ীর বাহির হইত না, আজ সে হাঁটিয়া যাইতে এত উৎসুক কেন?

মস্‌জিদ বাড়ী ষ্ট্রীটেও একখানি বাড়ীর একটি জানালাতেও এক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। আগেকার ভাড়াটিয়াদের আমলে রাস্তার ধারের সে জানালাটি প্রায়ই খোলা থাকিত। এখন উহা বন্ধ থাকে, কেবল খড়্‌খড়ির পাকিগুলি ঈষৎ খোলা থাকে। প্রতিদিন সন্ধ্যার প্রারম্ভে কেশ-বেশ-প্রসাধনরতা এক তরুণীর উৎসুক চঞ্চল দৃষ্টি সেই খড়্‌খড়ির রন্ধ্র দিয়া রাজপথে কাহার প্রতীক্ষা করে। চীনাবাদাম বা চানাচুরওয়ালার ডাকেও যেমন তেমনি সান্ধ্যবায়ুসেবী কত বাবুর জুড়ী রাস্তা কাঁপাইয়া চলিয়া গেলে বা মাঝে মাঝে তীব্র শব্দে মোটর ছুটিয়া গেলেও তাহার ঔদাসীন্য সমানই পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু কোঁচান ধুতি পরা, পাঞ্জাবী গায়ে, সিল্কের চাদর উড়াইয়া ছড়ি হাতে যখন সীতাপতি আসিত, তখন তাহার তৃষিত লোচন সীতাপতির পরিচ্ছদের

প্রত্যেক ভাঁজটি হইতে তাহার কেশের ঈষৎ বিশৃঙ্খলতাটি পর্যান্ত একদৃষ্টিতে দেখিয়া লইত।

এইরূপে প্রায় একমাস কাটিল। সীতাপতি সঙ্কল্প করিল, যা হয় হউক, রুক্মিণীবাবুর নিকট নীহারকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিবে। একবার ভাবিল, হৃদয়বাবুকে জানাই। আবার মনে করিল, হৃদয়বাবুর কাছে এখন বিষয়টা গোপনই থাক। হৃদয়বাবুকে জানাইতে অনিচ্ছার আসল কারণটি যে কি, তাহা সে নিজেও একটু একটু যে না বুঝিয়াছিল তাহা নয়। হৃদয়বাবুর প্রকৃতির পরিচয় পাইতে তাহার বিলম্ব হয় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"Where are they ?···Echo answered 'Where' ?"

BYRON.

ভবানীগঞ্জের কাঁচা রাস্তার উপর দিয়া কৃষ্ণবর্ণ, শীর্ণকায় একজন লোক হাঁটিয়া যাইতেছিল। তাহার মাথায় ছাতা। পরিধানে একখানা লালপাড় কাপড়। গায়ে একটা সার্ট। কাঁধের উপর চাদর ফেলা। বাঁ'হাতে একটা পুঁটুলি। খালি পায়েই লোকটা হাঁটিতেছিল। হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলায় ভরিয়া গিয়াছিল। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে তাহার ললাট হইতে ঘাম ঝরিতেছিল। হাঁটিতে হাঁটিতে এক একবার বলিতেছিল "উঃ—আরও কতদূর ?"

খানিকটা দূরে একটা বটগাছের তলায় চার পাঁচজন কৃষাণ বসিয়া তামাক খাইতেছিল। নিকটেই তাহাদের ক্ষেত। বলদ ও লাঙ্গল ছাড়িয়া একটু বিশ্রাম করিবার জন্য তাহারা অল্পক্ষণ আগে ঐ গাছতলায় আশ্রয় লইয়াছিল। পথিক তাহাদের দেখিয়া সেই দিকেই চলিল। দ্রুত গমনের ইচ্ছা থাকিলেও তাহার ক্লান্ত-চরণ তাহাকে বেশী শীঘ্র অগ্রসর হইতে দিল না। যতদূর তাড়াতাড়ি পারিল, হাঁফাইতে হাঁফাইতে সেই গাছতলায় পৌঁছিয়া পুঁটুলিটি মাটির উপর ফেলিয়া ছাতাটা মুড়িয়া তাহার উপর রাখিল। পরে "বাবাঃ" বলিয়া বসিয়া পড়িল। গলার চাদর দিয়া মুখের ঘাম মুছিয়া চাদরখানা নাড়িয়া হাওয়া খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিল "ভবানীগঞ্জ আর কতদূর ?"

একজন কৃষাণ গাছে ঢাকা নিকটবর্ত্তী গ্রামখানি দেখাইয়া দিয়া বলিল "ঐ যে ভবানীগঞ্জ।"

আর একজন বৃদ্ধ কৃষাণ জিজ্ঞাসা করিল "ভবানীগঞ্জে আপনি কার বাড়ী যাবেন কত্তা?"

পথিক একটু কাসিয়া বলিল "হৃষীকেশ দত্তর বাড়ী।"

যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তার নাম কানাই। কানাই বলিল "কার বাড়ী?"

পথিক আবার বলিল "হৃষীকেশ দত্তর বাড়ী।"

কানাই বলিল "আপনি তার কেউ হন নাকি?"

প। না। জানাশোনা আছে।

কা। হৃষীকেশ দত্তর বাড়ী কি আর আছে? সেত অনেকদিন হ'ল দামোদরের গর্ভে গিয়েছে।

প। দত্তজা কি বেঁচে নাই?

কা। তিনি ঘর চাপা পড়ে ম'রেন। বান্‌নের সময়ও ঘরের মায়া ছাড়েন নি। পুরোণো ভিটে কাম্‌ড়ে পড়ে' ছিলেন। মেয়ে দুটোকে গ্রামের লোক টেনে বার কর্‌তে যায়। একটাকে পেয়েছিল। একটাকে আর পাওয়াই যায় নি। সেটাও ঘর চাপা পড়ে ম'রে।

প। কোন্ মেয়েটি মারা গিয়েছে? বড়টি না ছোটটি?

কা। ছোটটি। বড়টিকে তার মামাত ভাই বাঁচিয়েছিল। সে-ই তাকে নিয়ে গেছে?

প। তার মামার বাড়ী কোথা?

কা। আমরা কখন যাই নি। শুনেছি নদে' জেলায়। আপনার কি দরকার কত্তা?

প। আমি দত্তজার কাছে কিছু টাকা ধার করেছিলাম।

বিদেশে চাকরী করতে গিয়ে কোন খোঁজ খবর দিতে পারি নি, টাকাও শোধ করতে পারি নি। আজ টাকা শোধ করতে এসেছি। দত্তজা ত গেছেন—এখন তার মেয়েকে টাকাটা দিতে পারলেও আমার ঋণ শোধ হয়।

কা। আমাদের ভট্‌চায্‌ ম'শাই বোধ হয় তার ঠিকানা জানেন। একবার খোঁজ নিয়ে দেখুন না।

প। আমি ত চিনি না, তুমি বাপু যদি নিয়ে চল তা হ'লে তোমায় বক্‌শিশ্‌ দোব।

কা। বক্‌শিশ্‌ দিতে হবে না কত্তা, দত্তজার খেয়েই আমি মানুষ। তাঁর যদি কোন একটা উপকার করতে পারি তা হ'লেই আমার যথেষ্ট হবে। আসুন—ঐ ত ভট্‌চায্‌ ম'শায়ের বাড়ী।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আহারান্তে পাণ চিবাইতে চিবাইতে দাওয়ার উপর একখানি মাদুরে বসিয়া ডাবা হুঁকায় তামাক খাইতেছিলেন, এমন সময় কানাই ও পথিক সেখানে উপস্থিত হইল। উভয়ে প্রণাম করিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় মুখ হইতে এক রাশ ধূম বাহির করিয়া বলিলেন "কি খবর ?"

কানাই সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানাইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "দত্তজার মেয়ের বিয়ের সময় একখানা চিঠি পেয়েছিলুম। তার মামাত ভাই পীতাম্বর ঠিকুজি জান্‌তে চিঠি লিখেছিল।"

পথিক জিজ্ঞাসা করিল "এখন তারা কোথায় আছে জানেন কি ?"

ভ। তা ত' বল্‌তে পারি না। সে কি আজকের কথা ? বোধ হয় দশ বার বৎসরেরও বেশী হ'ল। তবে পীতাম্বরের চিঠিখানা বোধ হয় আছে। দেখি খুঁজে। বোধ হয় পেলেও পেতে পারি।

এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাড়ীর ভিতরে গেলেন। কানাই

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রসাদী কলিকাটি হুঁকার মাথা হইতে খুলিয়া পথিককে বলিল "কর্ত্তা, তামাক ইচ্ছা করুন।"

পথিক বলিল "না, থাক্।"

কানাই তখন কলিকাটি লইয়া সাগ্রহে টানিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় একখানি পুঁথি হস্তে বাহিরে আসিলেন। তাঁহার নাকের উপর চস্‌মা। তাহার ডাণ্ডা দুইটি অৰ্দ্ধেক ভাঙ্গা, একটা মলিন ফিতা দিয়া তাঁহার কেশবিরল মস্তকের পশ্চাতের সহিত চস্‌মাখানা বাঁধা ছিল। পুঁথিখানি "নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি"। কিন্তু এই-খানিই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টুক্‌রা কাগজের দপ্তর। এই পুঁথির সহিতই নিমন্ত্রণ-পত্র, অন্যান্য টুক্‌রা কাগজ, খাজনার রসিদ প্রভৃতি সযত্নে বাঁধা থাকিত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বসিয়া পুঁথিখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া অনেক টুক্‌রা কাগজ ঘাঁটিয়া একখানি পত্র বাহির করিলেন। বলিলেন "এই পেয়েছি। পীতাম্বর আমায় এই চিঠি লিখেছিল। সন দেখে বুঝ্‌তে পাচ্ছি চোদ্দ বৎসর আগে। চিঠিখানা পড়ি, শোন।" এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিম্নলিখিত পত্রখানা পাঠ করিলেন।

"প্রণামা শতকোটি নিবেদনঞ্চ বিশেষ।

বহুদিন হইল আপনার কোন সংবাদ না পাইয়া বিশেষ উৎকণ্ঠিত আছি। উপস্থিত আমার এক বিশেষ দায় উপস্থিত হইয়াছে। পিসা-মহাশয়ের কন্যা সুশীলাকে এখানে আনা অবধি তাহার ভরণ পোষণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হওয়াতে অন্য কোন উপায় না পাইয়া তাহার বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়াছি। পলাশ-পুরের হরিহর মিত্রের পুত্র গদাধর মিত্রের সহিত সুশীলার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে। বরপক্ষ কন্যার ঠিকুজী দেখিতে চান। আমার কাছে ত কোন ঠিকুজী নাই। যদি আপনার কাছে কোন ঠিকুজী থাকে, তাহা হইলে তাহা পাঠাইলে বিশেষ উপকৃত হই। পিসামহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম আপনি সুশীলার কোষ্ঠী

প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আমার নামে গ্রাম কানাইডাঙ্গা, জেলা নদীয়া, এই ঠিকানায় পাঠাইলেই আমি পাইব।

আমাদের গ্রামের ছোট তরফের বড়বাবু পশ্চিমে চাকরী লইয়া যাইবেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে যাইব। আমার ১০ বেতন নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বিবাহটা এই মাসের মধ্যেই দিয়া যাইতে চাই। কারণ সুশীলাকে আর কোথায় রাখিয়া যাইব? এই কারণেই এত অল্প বয়সেই সুশীলার বিবাহ দিতে হইতেছে। আপনি আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। আমাদের গ্রামের পণ্ডিত মহাশয়কে দিয়া এই পত্র লিখাইলাম। কৃপা করিয়া শীঘ্র পত্রোত্তর দিয়া চিরকৃতার্থ করিবেন। ইতি তারিখ—

সেবক

শ্রীপীতাম্বর ঘোষ।

তারিখটা ভট্টাচার্য্য মহাশয় পড়িলেন না। পথিক জিজ্ঞাসা করিল "এটা কতদিন আগের চিঠি?"

ভ। চোদ্দ বৎসর আগেকার।

প। আপনি ঠিকুজি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কি?

ভ। আমার কাছে ত ঠিকুজি ছিল না। দত্তজার কাছেই ছিল। সেটা আর পাওয়া যায় নি। আমার কাছে যে দিনক্ষণ লেখা ছিল, তাই দেখেই আমি একটা ঠিকুজি তৈরি ক'রে পাঠিয়ে দিই।

প। তারপর আর কোন সংবাদ পেয়েছিলেন কি?

ভ। হাঁ। তারপর আর একখানা চিঠি পাই। সেখানাও রেখে দিয়েছিলুম। এই সেই চিঠি।

এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় একখানা পোষ্টকার্ড বাহির করিলেন। চস্‌মাখানা খুলিয়া কোঁচার খুঁট দিয়া কাচ দুখানা মুছিয়া আবার চোখে লাগাইয়া পড়িলেন—

"প্রণামা শতকোটি নিবেদনঞ্চ বিশেষ

আপনার আশীর্ব্বাদে সুশীলার ঠিকুজির সহিত পাত্রের ঠিকুজির মিল হইয়াছে। আগামী ১৮ই অগ্রহায়ণ বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। আমি সুশীলাকে লইয়া হরিপুরে আমার এক কুটুম্বের বাড়ী গিয়া বিবাহ দিব। কারণ, আমার এখানে বিবাহ দিই এমন সঙ্গতি আমার নাই। পিসামহাশয়ের এত আদরের কন্যার কপালে যে এত দুঃখ ছিল তাহা আগে কে জানিত? এখন আশীর্ব্বাদ করুন, ভালয় ভালয় যেন বিবাহটি হইয়া যায়। ২৮ শে তারিখে আমি পশ্চিম রওনা হইব। আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। ইতি তারিখ ১০ই অগ্রহায়ণ।

সেবক

শ্রীপীতাম্বর ঘোষ।

পথিক জিজ্ঞাসা করিল "এর পর আর কোন চিঠিপত্র পেয়েছিলেন ?"

ভ। না।

প। তা হ'লে আমায় কানাইডাঙ্গায় আর পলাশপুরে সন্ধান নিতে হ'বে। সে ত এখানে নয়। ঋণটা শোধ না দিয়েই বা নিশ্চিন্ত হই কি ক'রে? ভট্‌চায্‌ ম'শায় আমায় চিঠি দু'খানা দিতে পারেন ?

ভ। তা নিয়ে যাও। এতে আর আমার কি হ'বে? তবে রেখে ছিলুম—যদি কখনও কোন কাজে লাগে। তাই আজ একটা উপকার হয়ে গেল। সুশীলা যদি তোমার কাছে কিছু টাকা পায়, তা হ'লে তার বিশেষ উপকার হ'বে।

প। সুশীলা এখন কত বড় হ'বে ?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন "সতের আঠার বছরের হবে। চার পাঁচ বৎসর বয়সে তার বিবাহ হয়। এখান থেকে যখন যায়, তখন তার বয়স তিন বৎসর হবে। তার এক বৎসর পরেই আমি এই চিঠি পাই।"

পথিক চিঠি দু'খানি সযত্নে পুঁটুলির ভিতর বাঁধিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পদধূলি লইল। বলিল "আজ্ঞে আসি' তা হ'লে। যদি কিছু দরকার হয়, আপনাকে চিঠি লিখে জানাব। একটু অনুগ্রহ রাখ্‌বেন।"

ভ। সে কি কথা? আমার দ্বারায় তোমার যতদূর উপকার হয়, কর্‌ব। দত্তজার কাছে কি কম উপকার পেয়েছি? এই বাড়ীখানি তাঁর জমীতেই করেছিলুম। তার দাম পর্য্যন্ত আমার কাছে নেন নি। দত্তজার কাছে উপকার পায় নি এমন লোক এ গ্রামে কে আছে?

পথিক ও কানাই চলিয়া গেলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় "হরি হে দীনবন্ধু" বলিয়া হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে দিতে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আজ দু'খানা চিঠি দ্বারা দত্তজার কন্যার একটা উপকার করিতে পারিলেন বলিয়া মনটা তাঁহার প্রসন্ন হইয়াছিল।

কানাই ক্ষেতে ফিরিয়া গিয়া লাঙ্গল ধরিলে তাহার সঙ্গে যে কৃষাণ কাজ করিত, সে বলিল "দাদা, আর একজন লোক হৃষীকেশ দত্তর খোঁজ নিতে এসেছিল। আমরা ঐ লোকটার কথা বলতে সে সব খবর নিতে লাগল। তার পর লোকটা ফিরবার আগেই চ'লে গেল। আমরা তোমার নাম ক'রে থাকতে বল্লুম, ভটচায্ ম'শায়ের কাছে যেতেও বল্লুম; কিন্তু লোকটা গা ঢাকা দিলে। লোকটার ভাবগতিক দেখে আমাদের কেমন স'ন্দ হ'ল।"

কানাই বলিল "খবর দিলি কেন? হয়ত ঠেঙ্গাড়ের চর। লোকটি টাকা শোধ দিতে এসেছিল। সঙ্গে টাকা আছে—সন্ধান পেয়েছে; রূপনগরের মাঠে আগ্‌লাবে। তুই যা, দৌড়ে গিয়ে সাবধান করে দিয়ে আয়। লোকটা এখনও বোধ হয় ভাঙ্গা মোড় পেরোয় নি।"

কৃষাণ দৌড়িয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কই তাকে দেখতে পেলুম নি।"

কানাই একটু চিন্তিতভাবে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "লোকটর বরাতে কি আছে কে জানে?" তার পরে কৃষাণকে বলিল "নে হাত কর। বেলা আর বেশী নেই। সন্ধ্যের আগেই এ ক্ষেতটা শেষ করতে হ'বে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধা-তলাৎ।"

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।

বলি বলি করিয়া সীতাপতি একদিন নীহারের সামনে কথাট পাড়িয়াই ফেলিল। সেদিন সীতাপতি একটু সকাল সকাল গিয়াছিল রুক্মিণীবাবু তথনও কাছারী হইতে আসেন নাই; হিরণ্ময়ও বাড়ী ভিতর গিয়াছিল। পশ্চিমের একটা জানালা দিয়া সজ্জিত কক্ষটি ভিতর থানিকটা রৌদ্র পড়িয়া কক্ষটিকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল বাহিরে রাস্তায় একজন ফিরিওয়ালা হাঁকিয়া গেল। একখানা মাল বোঝাই গরুর গাড়ী 'ক্যাচ্ কোঁচ্' করিতে করিতে চলিয়া গেল। কবি চক্ষে পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রণয়ের প্রথম প্রকাশের পক্ষে অনুকূল ন হইলেও, সীতাপতির তাহাতে কোন ব্যাঘাত ঘটিল না।

নীহার লজ্জাবনতমুখে কোন উত্তর দিল না। আবার জিজ্ঞাস করাতে মৃদুস্বরে বলিল "বাবাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

সী। আজই জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু তুমি বল—একটিবার বল যে তুমি আমায় অপছন্দ কর না?

নীহার 'না' বলিয়া সে কক্ষ হইতে চলিয়া গেল। ছি সীতাপতি কথা কহিতেও এখন শিখ নাই।

কিন্তু সীতাপতির সে সব চিন্তা আদৌ ছিল না। নীহার সম্ব

হইয়াছে—নীহার তাহাকে ভালবাসে। এই আনন্দেই তাহার চিত্ত ভরপুর হইয়া গিয়াছিল। কতক্ষণে রুক্মিণীবাবু কাছারী হইতে আসিবেন, সে উৎকণ্ঠিতচিত্তে তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

প্রায় ছয়টার সময় সেদিন রুক্মিণীবাবু ফিরিলেন। সীতাপতিকে দেখিয়া বলিলেন "বস, আমি কাপড় চোপড় ছেড়ে আসি।"

সীতাপতি বসিয়া রহিল। হিরণ্ময়ও আজ তাহার কাছে ছিল না। রুক্মিণীবাবুকে কথাটা বলিবার জন্য একদিকে তাহার যেমন আগ্রহ হইতেছিল; অপরদিকে তেমনি কি বলিয়া কথাটা পাড়িবে, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই রুক্মিণীবাবু আসিলেন।

রুক্মিণীবাবুর আসার পরই বেহারা আসিয়া চা ও জলখাবার দিয়া গেল। রুক্মিণীবাবু সীতাপতিকে এক পেয়ালা চা দিয়া নিজে এক পেয়ালা লইলেন। যতক্ষণ চা খাওয়া শেষ না হইল, ততক্ষণ সীতাপতি আর কথাটা পাড়িল না। চা খাওয়া হইয়া গেলে, বেহারা আসিয়া পেয়ালা, প্লেট্ ও জলখাবারের থালা সরাইয়া লইয়া গেলে, সীতাপতি বলিল, "আপনাকে একটা কথা বলব ?"

"কি ?" বলিয়া রুক্মিণীবাবু সীতাপতির দিকে চাহিলেন।

সীতাপতি যেমন গোছাইয়া কথাটা বলিবে মনে করিয়াছিল, কার্য্য-কালে তাহা পারিল না। একেবারেই বলিয়া ফেলিল "আমি যদি নীহারকে বিবাহ করতে চাই, তাহ'লে আমাকে তার উপযুক্ত মনে করবেন কি ?"

কথাটা শুনিয়া রুক্মিণীবাবুর ললাটে চিন্তার রেখা বিকাশ পাইল। রুক্মিণীবাবু একদিনের জন্যও ভাবেন নাই যে, এমন একটা সম্ভাবনা ঘটিতে পারে। অনেক ভাবিয়া, সীতাপতি আঘাত না পায় এমন

ভাবে তিনি মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন "দেখ, এমন প্রার্থনা যে তুমি করবে, এ কথা আমার মনে কখনও উদয় হয় নি। তাই হঠাৎ কথাটা পাড়াতে আমি একটু আশ্চর্য্য হয়েছি। শুধু আশ্চর্য্য নয়, কি বলব তাও ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। প্রথম কথা, নীহারের এখন বয়স হয়েছে। তার মতামতটাও একবার নিতে হয়।"

সীতাপতি অবনত মুখে বলিল "আমি আজ আপনি আস্‌বার আগেই নীহারকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তার অমত নেই।"

দুর্গের সেনাপতি যদি সহসা জানিতে পারে যে, তাহার অজ্ঞাতসারে দুর্গমধ্যে শত্রুতে গুপ্তপথ খনন করিয়াছে, তখন তাহার মনের অবস্থা যেরূপ হয়, রুক্মিণীবাবুরও সেইরূপ হইল। তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার সম্মুখেই এত বড় একটা কাণ্ডের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা তিনি ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই। ব্যাপারটা আর তাঁহার নিকট তত সহজ বলিয়া বোধ হইল না। নীহারের বয়স হইয়াছে। সে যদি সীতাপতিকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিষয়টা তুচ্ছ বলিয়া আর উড়াইয়া দেওয়া যায় না। রুক্মিণীবাবু বলিলেন "তা না হয় হ'ল, কিন্তু আমরা ব্রাহ্ম, তোমার আত্মীয় স্বজন কি তোমার এ বিবাহে সম্মতি দিবেন?"

সী। আপনার কাছে যদি আশা পাই, তাহ'লে আমি তাঁদের এ বিষয় জানাই। আপনার কাছে কোন আশা না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি তাঁদের কিছু জানাতে পাচ্ছি না।

রু। সেইটে জানাই আগে দরকার। যদি তাঁরা অসম্মত হন, তোমায় নিষেধ করেন, বাধা দেন, তাহ'লে তুমি কি করতে পার? অবশ্য তুমি নাবালক নও। ইচ্ছা করলে তুমি তাঁদের মত না নিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পার। কিন্তু তা কি তুমি পারবে?

সী। আমার বোধ হয় তাঁদের বুঝিয়ে বল্‌লে তাঁরা অমত করবেন না।

সীতাপতি মুখে একথা বলিল বটে, কিন্তু তাহার মন আশঙ্কায় পূর্ণ ছিল। তাহার পিতামাতা ত কথনই রাজী হইবেন না। আর হৃদয়বাবু —পাবনায় সীতাপতি রুক্মিণীবাবুর বাসায় থাকাতেই যিনি আপত্তি করিয়াছিলেন, তিনি কি রুক্মিণীবাবুর কন্যার সহিত সীতাপতির বিবাহ দিতে সম্মত হইবেন? কত আশা করিয়া তিনি সীতাপতিকে পোষ্যপুত্র লইয়াছেন। সেই আশার কি এইরূপে পূরণ হইবে?

রুক্মিণীবাবুও মনে মনে জানিতেন এ কাজটা সীতাপতি যত সহজ মনে করিতেছে, বাস্তবিক তত সহজ নয়। কিন্তু তাঁহার আর একটি গুরুতর কথা বলিবার ছিল। এইবার সেই কথাটি পাড়িলেন। সীতা-পতিকে বলিলেন "দেখ, ব্যাপার যখন এতদূর এগিয়েছে, তখন একটা কথা তোমায় খুলে বল্‌তে হ'ল। নীহার আমার কন্যা নয়।"

সীতাপতি বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে রুক্মিণীবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল "এঁ্যা? নীহার আপনার মেয়ে নয়?"

রু। না। শোন—অধীর হ'য়ো না। সব বল্‌ছি। আমি যখন রতনগঞ্জে ছিলুম তখন একদিন নৌকা ক'রে একটা তদন্তে যাই। ঝড় হ'বার সম্ভাবনা দেখে তীরে উঠি। কিন্তু ভীষণ ঝড়ে সেদিন নদীতে একখানা নৌকাডুবি হয়। কাউকে বাঁচাতে পারা যায় নি। আমার নৌকার দাঁড়ীমাঝিরা অনেক চেষ্টা ক'রে কেবল একটি ছোট মেয়েকে জল থেকে বাঁচায়। সে-ই এই নীহার।

সীতাপতি যেন কোন উপন্যাসের গল্প শুনিতেছে এইরূপ ভাবে অবাক হইয়া রুক্মিণীবাবুর দিকে চাহিয়া রহিল। রুক্মিণীবাবু বলিলেন "আমি অনেক সন্ধান করেছিলুম, কিন্তু মেয়েটির কোন বংশ পরিচয় পাই নি।

যেখানে নৌকাডুবি হয়, তার সাত আট ক্রোশের মধ্যে কেউ নয়। পরে থানায় থানায় খবর দিয়েছিলুম। তাতেও বিশেষ কিছু ফল হয়নি। তাই তাকে নিজের মেয়ের মতই পালন করেছি। আমার স্ত্রী ছাড়া এতদিন আর কেউ জান্‌ত না যে নীহার আমার মেয়ে নয়। নীহার নিজেও একথা জানে না। আর সত্যি কথা বল্‌তে কি, নীহার আমার মেয়ের চেয়েও বেশী। তুমি তাকে বিবাহ কর্‌তে চাচ্ছ। তোমার কাছে একথা গোপন করা চলে না। আমাদের সমাজে হ'তে পারে, কিন্তু তোমাদের সমাজে অজ্ঞাতকুলশীলা কন্যাকে কেহ গ্রহণ কর্‌বে কি? একথা শুনে তোমারই আর তাকে গ্রহণ কর্‌তে ইচ্ছা হবে কি? তোমার আত্মীয়স্বজনরা তাকে গৃহে স্থান দেবে কি? এটা নিশ্চয় জেন, নীহার আমার মেয়ে না হ'লেও, তার যাতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় তা আমি কখনও ঘট্‌তে দেব না।"

সীতাপতির চিন্তার অবধি ছিল না। সে রুক্মিণীবাবুর নিকট কোন অর্থ বা সাহায্য প্রত্যাশায় নীহারকে বিবাহ করিতে চাহে নাই। নীহারের নিজের রূপগুণেই তাহাকে ভাল বাসিয়াছিল। কিন্তু তাহার আশা ছিল, রুক্মিণীবাবুর মত পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত কুটুম্বিতা স্থাপনে হয়ত তাহার পিতামাতা, অন্ততঃ হৃদয়বাবু রাজী হইলেও হইতে পারেন। কিন্তু যার জাতির ঠিক নাই, পিতৃপরিচয়, বংশপরিচয় জানা নাই, তাহাকে গ্রহণ করিতে যে কেহই রাজী হইবে না, একথা সে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিল। রুক্মিণীবাবুকে বলিল "আমায় কিছু দিনের সময় দিন। আমি নিজে নীহারকে বিবাহ কর্‌তে প্রস্তুত। তবে আমার আত্মীয় স্বজনের মত জান্‌তে কিছু সময়ের দরকার হ'বে।"

রু। খুব ভাল কথা। যতদিন সময় চাও, ততদিন সময় নাও। যত বেশী সময় নাও ততই ভাল। এরকম একটা গুরুতর বিষয় হঠাৎ ক'রে

ফেলা কিছু নয়। হয়ত ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ ক'রে সমস্ত জীবন অনুতাপ করতে হ'বে। তোমার নিজের মন বোঝ। তোমার আত্মীয় স্বজনদেরও মত নাও। তারপর আমায় এসে জানিও।

সীতাপতি "যে আজ্ঞে।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আর বসিয়া আলাপ করিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। সে নির্জ্জনে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। রুক্মিণীবাবুর নিকট বিদায় লইয়া ফিরিবার সময় সে মনে মনে বলিতে লাগিল "নীহার কখনও নীচবংশোদ্ভূতা নহে। অমন রূপ, অমন গুণ নীচবংশে সম্ভব হয় না।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাম্"

উত্তররামচরিতম।

বেলা প্রায় চারিটা। পলাশপুর গ্রামে গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া লাউমাচা বাঁধিতেছিলেন, এমন সময় পথ হইতে কে তাঁহাকে ডাকিল। ফিরিতেই একজন লোক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল "বাঁড়ুয্যে মশায়, আপনার কাছে আমার একটু দরকার আছে।"

বাঁড়ুয্যে মশায় লোকটিকে দেখিয়া একটু থতমত খাইলেন। যেন তাহাকে কোথায় দেখিয়াছেন, অথচ চিনিতে পারিতেছেন না, তাঁহার এইরূপ ভাব দেখা গেল। খানিকক্ষণ এই রকম অবস্থার পর হঠাৎ বলিলেন "আরে কেও? গদাধর না? এতদিন ছিলে কোথা? কোন সংবাদ নেই? আমরা ত ঠাউরেছিলুম যে তুমি বেঁচেই নেই।"

লোকটি চমকিয়া উঠিল। বলিল "কি বল্‌ছেন? আপনি বোধ হয় ভুল কর্‌ছেন?"

বাঁ। ভুল কর্‌ছি কি হে? তোমায় আর আমি জানি নি? আর ভাঁড়ালে চল্‌বে না। সেই চেহারা—সেই সামনের দাঁত উঁচু। পেয়ারা গাছ থেকে পড়ে গিয়ে কপাল কেটে গিয়েছিল, সেই দাগ এখনও রয়েছে। তুমি লুকোচ্ছ কিসের জন্য? তোমার দেশ—নিজের বাড়ী ঘর। কোন্ দুঃখে ছেড়ে গেলে? তোমার বিয়েও হয়েছিল, শুনেছি। পরিবারই বা কোথায়? এতদিন কোনও খবরই বা দাও নাই কেন?

লোকটি বোধ হয় বুঝিল, আর আত্মপরিচয় গোপন করা বৃথা। বলিল "বাঁড়ুযো মশায়, চলুন। আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

বাঁ। চল চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে বসি। ওঃ—এ কি আজকের কথা হে। কতকাল হয়ে গেল। তোমার কাছে আমি সাঁতার কাটতে শিখি। মনে পড়ে? ব্যাপারটা কি? এতদিন কোন খোঁজ খবর নেই। ছিলে কোথা বল ত?

লোকটি ও বাঁড়ুয্যে মশায় চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া বসিলেন। লোকটি বলিল "আমাদের ভদ্রাসনখানার কিছু আছে কি?"

বাঁ। কি আর থাক্‌বে? সব ভেঙ্গে চূরে গেছে। সামান্য তৈজসপত্র যা ছিল, কে যে নিয়েছে তার ঠিক্ নেই। তবে তোমার বাবার বাক্সটি আমি এনে রেখেছিলুম। কাগজপত্র আছে। সেইটিই কেবল থাকবার মধ্যে।

লো। কাগজপত্রগুলি আছে তা হ'লে? ঐ গুলির জন্যই আমার আসা।

বাঁ। তা' আছে। যদি কখনও দরকার হয় মনে ক'রে আমি তার একখানিও ফেলি নি। বাক্সশুদ্ধ যেমন ছিল, তেমনি আছে। এনে দিচ্ছি।

এই বলিয়া বাঁড়ুয্যে মশায় বাড়ীর ভিতর গেলেন। গিয়া স্ত্রীকে বলিলেন "হরিহরের ছেলে গোবর্দ্ধন এতদিন পরে ফিরে এসেছে। তার বাক্সটা দাও ত।"

সেখানে গ্রামের আরও দুই চারজন প্রবীণা মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সবিস্ময়ে বলিলেন "এ্যা? ফিরে এসেছে। আমরা তখনই বলেছিলুম, যে এক সময় না এক সময় তারা আসবেই। বাপ বেটার

বিয়ে দিতে গেল, তারপর আর কারও খোঁজ খবর নেই। আহা, এসেছে, থাকুক। বাপের ভিটেয় বাতি পড়্‌বে।"

বাঁড়ুয্যে মশায় বাক্স লইয়া চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বসিলেন ও চাবিটি লইয়া লোকটির হাতে দিলেন। লোকটি বাক্সের চাবি খুলিয়া কাগজপত্রগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। বাঁড়ুয্যে মশায় জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বাপ বেঁচে আছেন কি ?"

লোকটি বলিল "না। অনেকদিন হ'ল তাঁর কাল হয়েছে। একটা বড় বিপদে পড়েই এখানে আস্‌তে হয়েছে। কাগজপত্রগুলি বিশেষ দরকার। কল্‌কেতায় বোধ হয় একটা মোকর্দ্দমা কর্‌তে হবে।"

বাঁ। তুমি আবার কা'র সঙ্গে মোকর্দ্দমা কর্‌বে ? তোমার ত তিনকুলে কেউ নেই হে।

লো। আমার শ্বশুর মশয়ের কিছু সম্পত্তির সন্ধান পেয়েছি। সেইটে উদ্ধারের চেষ্টা কর্‌ব ?

বাঁ। তোমার পরিবার কোথায় ?

লো। সে সন্ধানও পেয়েছি। সেই জন্যেই কলকাতা যেতে হবে।

ইতিমধ্যে গ্রামের সংবাদটা রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রামের মাতব্বরগণের মধ্যে অনেকেই বাঁড়ুয্যে মশায়ের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। বাঁড়ুয্যে মশায় একে একে পরিচয় দিতে লাগিলেন "এঁকে চিন্‌তে পাচ্ছ ত ? মুখুয্যে ম'শায়। ইনি ঠাকুর ম'শায়। এই যে গোবিন্দ চাটুয্যে।" লোকটিও তাঁহাদের প্রণাম করিতে লাগিল। মজা দেখিবার লোভে জনকতক বালক বালিকা অদূরে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণকায় লোকটির প্রতি একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিতেছিল।

প্রবীণ ঠাকুর ম'শায় লোকটিকে উপদেশ দিতেছিলেন "ভিটেটায় একটা ঘর টর তোল্‌বার ব্যবস্থা কর। পূর্ব্বপুরুষের ভিটেটা ছাড়া উচিত

নয়। তোমার ত বিবাহও হয়েছে। পরিবার এনে এখানে বাস ক'র।"

লো। আজ্ঞে, তা কর্‌বার ইচ্ছে আছে। তবে একটা মোকদ্দমায় পড়েছি। আমার শ্বশুর ম'শায়ের কিছু বিষয় উদ্ধার করতে হ'বে। মোকর্দ্দমাটা চুকে গেলে এখানেই এসে বাস কর্‌ব। পৈতৃক ভিটে—সে কি কথা? একবার ভিটেটা দেখে আসি।

"চল না।" বলিয়া বাঁড়ুয্যে ম'শায় ও সঙ্গে সঙ্গে আর আর সকলে উঠিলেন। বাঁড়ুয্যে ম'শায়ই আগে আগে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার পশ্চাতে লোকটি ও গ্রামের অন্যান্য লোকগণ। সর্ব্বশেষে ছেলের দল।

লোকটি একবার বলিল "এটা কার বাড়ী?" বাঁড়ুয্যে ম'শাই বলিলেন "গোঁসাইদের বাড়ী। ভুলে গেছ নাকি? এর সামনের আটচালায় গুরুম'শায়ের কাছে কতদিন বেত খেয়েছ'।" এই বলিয়া বাঁড়ুয্যে ম'শায় উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

লোকটিও ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "কতদিন দেখিনি। আমার সবই যেন নূতন মনে হচ্ছে।"

চলিতে চলিতে সকলে একটা পুকুরের পাড়ে খানিকটা খোলা জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জায়গায় জায়গায় কয়েকটা উঁচু ঢিবি ছিল। আশ পাশ ও উপর আগাছা ও জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে।

বাঁড়ুয্যে ম'শাই বলিলেন "এই তোমার ভিটা। যে অবস্থা হয়েছে, তাতে নূতন ক'রে ঘর তুল্‌তে বড় কম খরচ হ'বে না। বিশেষ আজ কাল যেরকম আক্রাগণ্ডার দিন।"

লোকটি একদৃষ্টিতে পরিত্যক্ত ভিটার দিকে চাহিয়া রহিল। বোধ হয় তাহার মনে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিতেছিল।

গ্রামের অপর প্রান্তে এক মুদীর দোকানে বসিয়া তখন আর একটি লোক বিশেষ আগ্রহের সহিত এই বহুদিন পরে প্রত্যাবৃত্ত গ্রামবাসীর কাহিনী শুনিতেছিল। গ্রামেরই একজন লোক মুদীর দোকানে মসলা কিনিতে গিয়াছিল। সে-ই গিয়া ঘটনাটা অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিতে-ছিল। বড়লোক হইয়া তাহাদের একজন গ্রামবাসী এতদিন পরে ফিরিয়াছে, শ্বশুরের বিষয় পাইয়া সাবেক ভিটায় পাকাবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিবে, এই সব কাহিনী বর্ণনা করিতেছিল। মুদীর দোকানে যে লোকটি বসিয়াছিল, সে এ কথায় বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। সে নিজেই দুই চারিটি প্রশ্ন করিতেছিল। যথাযথ উত্তর পাইয়া সে একবার গ্রামের দিকে গেল। বাঁড়ুযো ম'শায় গ্রামবাসী প্রভৃতি সকলে তখন ভিটা দেখিয়া ফিরিতেছিলেন। তাঁহাদের দেখিয়া আগন্তুক একটা বাঁশের ঝোপের আড়ালে লুকাইল। তাঁহারা চলিয়া গেলে সে ধীরে ধীরে মুদীর দোকানে ফিরিয়া গেল। তাহার ভাবভঙ্গীতে একটা নৈরাশ্যের চিহ্ন প্রকটিত। কি যেন ব্যর্থ প্রয়াসের বোঝা ঘাড়ে করিয়া সে ফিরিয়া গেল। মুদীর দোকানে রাত্রিযাপন করিয়া আরও কি অনুসন্ধান করিয়া পরদিন প্রত্যূষেই সে গ্রাম পরিত্যাগ করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

"কয়মস্থ বামা গতিঃ।"

গীতগোবিন্দম্।

সীতাপতি পিতাকে একখানা পত্র লিখিল। তাহাতে কোন কথাই গোপন করিল না। চিঠিখানা ডাকে দিয়া তাহার উত্তর প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল।

যেদিন উত্তর আসিবার কথা, সেদিন সীতাপতি কোন পত্র পাইল না। পরদিন হৃদয়বাবু তাহাকে ডাকাইলেন।

হৃদয়বাবু নিজের বসিবার ঘরে ফরাসের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া বসিয়াছিলেন। বামহাতে গড়গড়ার নল। সামনে একখানা খোলা চিঠি পড়িয়াছিল।

সীতাপতি ঘরে ঢুকিলে হৃদয়বাবু তাহাকে বসিতে বলিলেন। সীতাপতি ফরাসের একপ্রান্তে বসিল। হৃদয়বাবু চিঠিখানা তাহার দিকে আগাইয়া দিয়া বলিলেন, "পড়।"

সর্ব্বনাশ! এ যে তাহার পিতার চিঠি! তাহাকে উত্তর না দিয়া তাহার পিতা হৃদয়বাবুকে লিখিয়াছেন। সীতাপতি পত্রখানা পড়িতে লাগিল। অন্যান্য কথার পর তাহার বিবাহ সম্বন্ধে তাহার পিতা লিখিয়াছেন "সীতাপতির পত্র পাইয়া আমি প্রথমে বিশ্বাস করিতে

পারি নাই যে, পত্র তাহার লেখা। এখানে যতদিন ছিল, ততদিন তাহার এরূপ মতিগতি ছিল না। আপনার তত্ত্বাবধানেও সে এখানকার অপেক্ষা অধিক শাসনে থাকিবে সে ভরসা আমার সম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু কলিকাতা বড় ভয়ঙ্কর জায়গা। নহিলে আপনার বাড়ীতে থাকিয়াও এরূপ ঘটনা ঘটিবে কেন। কোথাকার কোন মেয়ে, জাতি, জন্ম, বংশের ঠিক নাই তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব যে আমার পুত্র করিবে, এ কথা আমি এখনও বিশ্বাস করিতে পারি না। আমি পত্র পাইয়াই কলিকাতা যাইতাম। কিন্তু পরের চাকরী করি—ছুটি পাইবার উপায় নাই। তবে এরূপ অবস্থায় ক্ষতি করিয়াও যাইতাম। কিন্তু আপনি যখন কলিকাতায় আছেন, তখন আর আমার বেশী চিন্তা নাই। আপনি সীতাপতির ভার লইয়াছেন, আমি তাহার ভার আপনার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত। আর এ বিশ্বাসও আমার আছে যে, আমার চেয়ে আপনি তাহাকে আরও সহজে এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করাইতে পারিবেন। সীতাপতি যদি এ কাজ করে, তাহা হইলে হয় আমাদের সমাজচ্যুত হইতে হইবে, নয় সীতাপতিকে ত্যাগ করিতে হইবে। সীতাপতির জননী এ সংবাদ শুনিয়া একেবারে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন। সীতাপতিকে বুঝাইবেন, আমরা যতদিন জীবিত আছি,ততদিন তাহাকে কখনও একাজ করিতে দিব না। আমাদের প্রতি তাহারও যদি বিন্দুমাত্র ভক্তি, শ্রদ্ধা বা ভালবাসা থাকে, তাহা হইলে সে যেন আর এইরূপ প্রস্তাব করিয়া আমাদের মর্ম্মান্তিক কষ্ট না দেয়।"

সীতাপতি পত্রখানা পড়িয়া রাখিয়া দিলে হৃদয়বাবু বলিলেন "এ সব কি ব্যাপার? কাকে তুমি বিয়ে কর্‌তে চাও?"

সী। পাবনায় আমি যার বাড়ীতে ছিলাম, সেই রুক্মিণীবাবুর পালিতা কন্যাকে।

হৃ। রুক্মিণীবাবু ত ব্রাহ্ম। তাঁর পালিতা কন্যাকে বিবাহ করবে কি রকম? মেয়ের বাপের নাম কি?

সী। তা জানিনা। তাকে রুক্মিণীবাবু নৌকাডুবি হ'তে বাচান। কার মেয়ে তা জান্‌তে পারেন নি।

হৃ। যার জাতজন্মের ঠিক নেই সেই মেয়েকে তুমি বিবাহ করবে? তোমার কি মতিচ্ছন্ন হয়েছে নাকি? রুক্মিণীবাবুর মেয়ে হলেও তার সঙ্গে তোমার বিবাহ হতে পার্‌ত না, এত পালিতা কন্যা।

সীতাপতি মৃদুস্বরে বলিল "আমার কথাটা একবার বিবেচনা করছেন না? আমার জীবনের সুখ-দুঃখের কথাটা একবার ভাবছেন না?"

হৃদয়বাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "দেখ, ও সব নভেলিয়ানা রেখে দাও। কি সর্ব্বনাশই যে এই সব উপন্যাসগুলো করছে, তা আর বল্‌তে পারি নি। তোমার জীবনের সুখ কিছু ঐ মেয়েটার সঙ্গে গাঁথা নেই। তোমার জীবনের সুখ যাতে ঘটে সেই জন্যই আমি, তোমার বাপ মা এ বিবাহে বাধা দিচ্ছি।" তারপর একটু নরম সুরে বলিলেন "দেখ, ছেলেমানুষি ক'রো না। এমন একটা কাজ করলে সমাজ তোমায় পরিত্যাগ কর্‌বে। সমস্ত জীবন তোমায় অনুতাপ করতে হ'বে। ও সব মতলব ছেড়ে দাও। এর পর নিজেই বল্‌বে—কি ভুলই করেছিলুম।"

সী। আজ্ঞে, তা কখনই বল্‌ব না। আমি ভাল করে নিজের মনকে না বুঝে এ প্রস্তাব করি নি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এতে আমি জীবনে সুখী হব।

হৃ। কতদিনের দেখা তার সঙ্গে যে তুমি এমন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ক'রে বসেছ বাপু?

সী। রুক্মিণীবাবু কল্‌কেতায় আছেন। তিনি এখন আলিপুরে বদ্‌লী হয়েছেন। আলাপ যতদিন হয়েছে তাই যথেষ্ট।

হৃ। তাই বুঝি সকাল বিকাল অত বেড়াবার ধূম পড়েছিল। আমি মনে করি' বুঝি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেই ঘুর্‌ছে। এদিকে এক আচ্ছা ফাঁদ পেতে তোমায় ভুলিয়েছে ত? বেহ্মজ্ঞানীদের অসাধ্য কাজই নেই দেখ্‌ছি। রুক্মিণীবাবু তোমার ঘাড়ে এই নটীটিকে চাপিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হ'তে চান। কি প্রলোভন দেখিয়েছেন? কত টাকা নগদ দেবেন?

সীতাপতি মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। একটু জোরের সহিত বলিল "এক পয়সাও না। আপনি কি মনে করেন, আমি পয়সার লোভে এ কাজ করছি। তেমন নীচ প্রবৃত্তি আমার যেন কখন না হয়।"

হৃ। শুধু রূপ দেখিয়েই ভুলিয়ে দিয়েছে? তুমি একটি আস্ত আহাম্মুখ। তারপর এই নটীটিকে রাখ্‌বে কোথায়?

সীতাপতি উত্তেজিত ভাবে বলিল "দেখুন, আমাকে যা ইচ্ছে বলুন, কিন্তু বিনা কারণে আমার সামনে ভদ্রলোকের কন্যাকে অপমান করবেন না।"

হৃদয়বাবু ধমক দিয়া বলিলেন "চোপ্‌ রাস্কেল। দুখানা নভেল পড়ে মাথা বিগ্‌ড়ে গিয়েছে। কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস্‌ জানিস্‌? আমি নিজের ছেলেকেই প্রশ্রয় দিই নি, তা আবার তোকে? ভদ্র-লোকের কন্যাই বটে তা না হ'লে সেজে গুজে মন ভোলাবার জন্য ফাঁদ পেতে ব'সে থাকে। এ ব্যবসা যাদের, তাদেরই মধ্যে কারুর মেয়ে।"

সীতাপতি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল

"দেখুন, আমি সেধে আপনার কাছে অন্নদাস হ'তে আসিনি। আপনি নিজেই আমায় এনেছিলেন। কিন্তু যে আমার পত্নী হবে, তাকে অপমান করবেন আর আমি ব'সে ব'সে তা শুনব, তা মনেও করবেন না।"

হৃদয়বাবু ব্যঙ্গমিশ্রিত স্থরে বলিলেন "তা পূনর্মূষিক হওগে যাও। রুক্মিণীবাবুকে বলগে যে তোমার বাপ মা তোমায় ত্যাগ করেছেন। আমিও তোমায় আমার বিষয় থেকে একটি পাই পয়সাও দোব না। দেখগে একথা শুনে তোমার রুক্মিণীবাবুই বা কি বলেন আর তোমার 'ভদ্রলোকের মেয়ে'ই বা কি উত্তর দেন? তারা আর তোমার মত কাঁচা-লোক নয়, বুঝেছ বাপু। আমার বিষয়টির দিকে লক্ষ্য করে এই 'ভদ্র-লোকের মেয়ে'টির টোপ্ ফেলেছে। তা আমার বিষয় আমি এরকম ক'রে উড়িয়ে দিতে রাজী নই, বুঝেছ?"

সীতাপতি বলিল "যে আজ্ঞে।" বলিয়া প্রণাম করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার এত রাগ হইয়াছিল, যে সে আর কোন কথাই উচ্চারণ করিতে পারিল না।

আধঘণ্টা পরে হৃদয়বাবু শুনিলেন যে সীতাপতি তাঁহার বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

* * * * *

রুক্মিণীবাবু বাহিরের বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন, এমন সময় সীতা-পতি বেগে প্রবেশ করিয়া একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। রুক্মিণীবাবু বলিলেন "কেমন আছ? ক'দিন দেখি নি যে?"

সীতাপতি আর এ সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। তাহার হৃদয়ে তখন ঝড় বহিতেছিল। বলিল "আমি আপনার কাছে আজ ভিক্ষা প্রার্থী। আমার যা কিছু আপনার ছিল, সব ছেড়ে এসেছি। বাপ

মা ছেড়েছি, বিষয় সম্পত্তির প্রলোভন ছেড়েছি। আমি একা—নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়েছি। হিন্দুসমাজ আমাদের গ্রহণ করবে না। আমি ব্রাহ্মমতে নীহারকে বিবাহ করব। আমি নিজে উপার্জ্জন করে তাকে খাওয়াব। বলুন, তাকে আমার হাতে সমর্পণ করতে আপনার আপত্তি নেই ? অস্বীকার করবেন না, তা হ'লে আমি বাঁচব না। আমার এখন এই একমাত্র অবলম্বন--এই একমাত্র সান্ত্বনা।"

রুক্মিণীবাবু সহজে বিচলিত হইবার মানুষ নন। কিন্তু সীতাপতির এই আবেগকম্পিত স্বরে উচ্চারিত কথাগুলি শুনিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। সাংসারিক অবস্থা, সীতাপতির ভবিষ্যৎ উপার্জ্জনের কথা নীহারের বিবাহিত জীবনের সুবিধা অসুবিধার বিষয় আর চিন্তা করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে কেবল এই তরুণযুবকের স্বার্থত্যাগ, আকুল আবেদন জাগিতে লাগিল। ভাবপ্রবণ না হইলেও তিনি কম্পিত স্বরে বলিলেন "নীহার তোমারই। ভগবান তাকে আশীর্ব্বাদ করুন, তুমি তার জন্য যে স্বার্থত্যাগ করলে, স্বেচ্ছায় যে দুঃখকষ্টকে বরণ করলে সে যেন তার উপযুক্ত হয়।"

সীতাপতি অবনতমস্তকে রুক্মিণীবাবুর পদধূলি গ্রহণ করিল।

এই সময় রামদিন নিশির দ্বারবান আসিয়া জানাইল "একঠো আদমী দেখা করনে মাঙ্গতা হ্যায়।"

রুক্মিণীবাবু বলিলেন "হিঁয়াপর লেয়াও।"

দশম পরিচ্ছেদ

"সুহৃদিব প্রকটয্য সুখপ্রদো প্রথমমেকরসামনুকূলতাম্।
পুনরকাণ্ডবিবর্ত্তনদারুণো বিধিরহো বিশিনষ্টি মনোরুজম্॥"

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।

ফট্ ফট্ করিয়া চটিজুতার শব্দ করিতে করিতে এক পা ধূলা লইয়া দীর্ঘাকার একজন লোক আসিয়া বৈঠকখানার সম্মুখে দাঁড়াইল। দরজার কাছে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ নামাইয়া ছাতিটা চৌকাটের গায়ে ঠেস দিয়া দাঁড় করাইয়া জুতা খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সামনেই একখানা পাপোষ ছিল তাহাতে উত্তমরূপে পা দুখানা ঘসিয়া ঘরের মধ্যে অগ্রসর হইয়া বলিল "রুক্মিণীবাবু কারু নাম?"

লোকটার পোষাক পরিচ্ছদ ও ব্যবহার দেখিয়া তাহার প্রতি রুক্মিণীবাবু বা সীতাপতির শ্রদ্ধা হইল না। কৃষ্ণবর্ণ কদাকার মূর্ত্তি। সামনের দাঁত উঁচু। একটা ময়লা জামা গায়ে, কাঁধে একখানা চাদর ফেলা। রুক্মিণীবাবু বলিলেন "আমারই নাম। তোমার কি দরকার?"

লোকটি নমস্কার করিয়া বলিল "আজ্ঞে, আমার একটু বিশেষ কথা আছে।"

রু। কি? বল।

লো। আজ্ঞে কিছু গোপনীয় কথা।

রু। এঁর সামনে বল্‌তে কি তোমার কোন আপত্তি আছে?

লো। আজ্ঞে আমার আপত্তি নেই। তবে আপনার যদি আপত্তি থাকে।

লোকটির কথার ভাবে রুক্মিণীবাবু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন "আমার কোন গোপনীয় কথা নেই। তুমি এঁর সামনে বল্‌তে পার। তোমার নাম কি ?"

লোক। শ্রীগদাধর মিত্র।

রু। বাড়ী কোথা ?

লোক। বাড়ী ঘর এখন আর কিছুই নেই। পলাশপুরে আমাদের বাড়ী ছিল। কাশীপুরে "গান্ এণ্ড সেল্ ফাক্টরী'তে মিস্ত্রীগিরি করে এখন কোন রকমে দিনপাত করি।

রু। তোমার দরকারটা কি তাই খুলে ব'ল।

লো। আজ্ঞে তাই বল্‌তেই ত আপনার কাছে এসেছি। এই বলিয়া লোকটা মেঝের কারপেটের উপরই বসিয়া পড়িল। একবার কোঁচার খুঁটটা দিয়া ঘর্ম্মাক্ত মুখ মুছিয়া বলিল "অল্প বয়সেই আমার বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের রাত্রির পরদিন হ'তে আর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। একটা দুর্ঘটনায় আর স্ত্রীর খোঁজ পাই নি। এতদিন পরে দৈবাৎ সন্ধান পেয়েছি। তাকে যাতে পাই সেই জন্যই আপনার কাছে আসা।

রু। তুমি কি নালিশ করেছ নাকি ? আমার কাছে যদি মোকর্দ্দমা এসে থাকে, তা হ'লে সে সম্বন্ধে আমি তোমার কোন কথা শুনতে পারব না। তুমি জান হাকিমের সঙ্গে এরকম বাসায় মোকর্দ্দমার কথা বল্‌তে এসেছ ব'লে তোমার সাজা হ'তে পারে ?

লো। আজ্ঞে, আমি নালিশ করিনি। আপনার হাতেই সব। আপনাকেই জানাতে এসেছি। আপনার কাছেই পরামর্শ

রু। আমি ওসব পরামর্শ দিতে পারব না। কোন উকীলের কাছে পরামর্শ নাওগে যাও।

লোকটা কিন্তু উঠিবার কোন লক্ষণ দেখাইল না। বলিল "প্রায় চোদ্দ বছর আগে আপনি একটি মেয়েকে নৌকাডুবি হ'তে বাঁচিয়েছিলেন কি ?"

সীতাপতি চমকিয়া উঠিল। রুক্মিণী বাবুও চেয়ারখানা সামনের দিকে আগাইয়া লইয়া বলিলেন "হাঁ, কেন ?"

লো। সেই মেয়েটি কি এখন আপনার কাছেই আছে ?

রু। হাঁ।

লো। তার বিবাহ দিয়েছেন কি ?

রু। না।

লো। হরি রক্ষে করেছেন। সেই মেয়েটিই আমার স্ত্রী।

সীতাপতি অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। রুক্মিণীবাবু সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "এ্যাঁ, কি বললে ?"

লোকটি মৃদু হাসিয়া বলিল "ব্যস্ত হবেন না। সেই মেয়েটিই আমার স্ত্রী। আমার শ্বশুর হৃষীকেশ দত্ত মহাশয় মারা গেলে তাঁর মামাত ভাই পীতাম্বর ঘোষ মহাশয় আমার স্ত্রী সুশীলাকে নিয়ে কানাইডাঙ্গায় যান। সুশীলার বয়স তখন চার বৎসর। পীতাম্বর ঘোষ মহাশয় বিদেশে চাকরী পেয়ে যাবার আগে সুশীলার বিবাহ দিতে মনস্থ করেন। আমার সঙ্গেই সম্বন্ধ হয়। ভবানীগঞ্জের রামরূপ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুশীলার কোষ্ঠী পাঠান। সেই কোষ্ঠীর সঙ্গে আমার কোষ্ঠীর মিল হ'লে বিবাহের দিন স্থির হয়। অগ্রহায়ণ মাস। হরিপুরে এক কুটুম্বের বাড়ী পীতাম্বর ঘোষ মহাশয় সুশীলাকে নিয়ে এলেন। পলাশপুর থেকে আমরাও গেলুম। বিবাহ হয়ে গেল।

তার পরের দিন বিকালে নৌকা করে রওনা হলুম। ঝড়ে নৌকা-ডুবি হ'ল, কে যে কোথায় গেল তার আর ঠিকানা পেলুম না। বাবা ও পুরুত মশায়ের মৃতদেহ অনেক দূরে পাওয়া যায়। বাড়ীতে আমার আর তিনকুলে কেউ ছিল না। আমিও সেই থেকে গ্রাম ছেড়েছি। চোদ্দ বচ্ছর পরে একবার দেশে গিছলুম। দৈবাৎ এক বুড়ো মাঝির মুখে শুনলুম একজন ডেপুটি বাবু জলে ডোবা থেকে একটি মেয়েকে বাঁচান। সে মাঝি সেই ডেপুটি বাবুর নৌকায় ছিল। অনেক খোঁজ করে, আপনার সন্ধান নিতে নিতে এখানে এসে পড়েছি। মনে বড় ভয় ছিল, হয় ত মেয়েটির আবার বিবাহ হয়ে থাকবে। কিন্তু ভগবান রক্ষে করেছেন।

সীতাপতি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল "মিথ্যে কথা। তুমি জালিয়াৎ। তোমার সঙ্গে নীহারের বিবাহ হয়েছিল, এ হ'তেই পারে না। কি চাও তুমি? কিজন্য এখানে এসেছ?"

লো। আজ্ঞে, নীহার ত নয়। আমার সঙ্গে সুশীলার বিয়ে হয়েছে। আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে তা খোঁজ নিলেই বুঝ্‌তে পারবেন। মিথ্যে পরিচয় দিয়ে আমার লাভ কি? আমার স্ত্রীকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।

সী। কি? নীহার তোমার সঙ্গে যাবে? আমি তোমায় খুন কর্‌ব। ক'রে ফাঁসী যাব। তা হ'লে নীহার তোমার হাত হ'তে উদ্ধার পাবে।

এই বলিয়া সীতাপতি লোকটার দিকে ধাবমান হইল। রুক্মিণী-বাবু তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। বলিলেন "কর কি সীতাপতি? স্থির হও। পাগ্‌লামি ক'রো না। স্থির হ'য়ে যদি না থাক্‌তে পার, বাড়ী যাও। আমি অনুসন্ধান করে সব জানছি।"

লোকটিও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলিল "নীহার নীহার কচ্ছেন কেন? নেশাটেশা করেছেন নাকি? লড়্তে চান ত আসুন না। এ হাতুড়ি পেটা হাত বুঝেছেন? আপনার মত ননীর দেহ নয়। টেরটা পাবেন এখন।"

সীতাপতি একথা শুনিয়া জোর করিয়া রুক্মিণীবাবুর হাত ছাড়াইয়া দৌড়িয়া লোকটির কাছে গেল। কিন্তু কোন মারামারি হইবার পূর্ব্বেই রুক্মিণীবাবু আবার তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। লোকটিকে বলিলেন "তুমি সরে দাঁড়াও।"

লোকটি কোনরূপ ভীতিভাব প্রকাশ করিল না। রুক্মিণীবাবুর কথায় একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া অর্থপূর্ণ হাস্যের সহিত বলিল "এ'র এত দরদ কেন? এ্যাঁ?"

রুক্মিণীবাবু সীতাপতিকে জোর করিয়া চেয়ারে বসাইলেন। বলিলেন "দেখ, ওরকম কর্‌লে চল্‌বে না। তোমার ও আমার দুজনেরই এখন স্থির হ'য়ে থাকা দরকার। কি প্রমাণ এনেছে দেখা যাক্।"

লোকটি বাহিরে গিয়া কোমরের ঘুন্‌শি হইতে একটা চাবি লইয়া ক্যাম্বিসের ব্যাগটি খুলিল। খুলিয়া কতকগুলি কাগজপত্র বাহির করিয়া আনিয়া রুক্মিণীবাবুকে দিল। বলিল "এই দু'খানা পীতাম্বর ঘোষ মহাশয়ের চিঠি। রামরূপ ভট্‌চায্‌কে কোষ্ঠীর জন্য লিখেছিলেন। এইটে আমার কোষ্ঠী। বাবার দপ্তরের এই সব কাগজ ও খাতা। এগুলি আমাদের প্রতিবেশী গোবর্দ্ধন বাঁড়ুয্যের কাছে ছিল। পলাশপুরে অনুসন্ধান কর্‌লেই সব জান্‌তে পার্‌বেন। আমায় সেখানে না চেনে কে?"

রুক্মিণীবাবু কাগজ-পত্রগুলি ভাল করিয়া দেখিলেন। বলিলেন "এগুলি আমার কাছে রেখে যেতে তোমার কোন আপত্তি আছে কি?"

লোকটি বলিল "আজ্ঞে, ঐটি মাপ করবেন। আপনি ঠিকানা লিখে নিন। সন্ধান করুন। নিজেই যান বা কোনও লোক পাঠিয়ে জানুন। আমায় সঙ্গে যেতে বলেন, তাতেও আমি রাজী আছি। কিন্তু কাগজ আমি হাতছাড়া করতে পারব না।"

রুক্মিণীবাবু কাগজপত্র দেখিয়া কতকগুলি নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইলেন। বলিলেন "তুমি দিন পনর' বাদে এস। আমি এর মধ্যে সন্ধান নোব। তোমার ঠিকানাও লিখে দিয়ে যাও। যদি দরকার হয়, তোমাকেও হয়ত আমি যে লোক পাঠাব তার সঙ্গে যেতে হবে।"

লোকটি "যে আজ্ঞে" বলিয়া কাগজগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া একবার দেখিল, সবগুলি ফেরৎ পাইয়াছে কি না। তারপরে সযত্নে সেগুলি ব্যাগে পূরিয়া চাবি বন্ধ করিল। পরে বলিল "আমার ঠিকানা দক্ষিণেশ্বর। পোঃ অঃ আড়িয়াদহ।" এই বলিয়া নমস্কার করিয়া লোকটি চলিয়া গেল।

লোকটি চলিয়া যাইবার পর অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল। সীতাপতি বা রুক্মিণীবাবু কেহই কোন কথা কহিলেন না। সীতাপতির তখনকার মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। কূলের নিকটে আসিয়া তাহার সাধ আহ্লাদ ভরা তরণী সলিলে ডুবিয়া গেল। তাহার নীহার পর-স্ত্রী! সে আর ভাবিতে পারিল না। কতকগুলো আবছায়া আবছায়া চিন্তা নিশীথে প্রদীপের আলোকে দেওয়ালে বিশৃঙ্খল ছায়ার মত হেথা সেথা ঘুরিতে ফিরিতেছিল। সে চিন্তার কোন সূত্র ছিল না। একবার মনে হইতেছিল, সে পাগল হইয়া যাইবে, আত্মহত্যা করিবে। আবার ভাবিতেছিল, তাহা হইলে নীহারের কি হইবে? এইরূপ সুন্দরী, শিক্ষিতা, গুণবতী কি ঐ পশুর গৃহিণী হইবে! তার চেয়ে উহাকে হত্যা করি। আবার এক একবার মনে করিতেছিল "ও ত দরিদ্র, ওকে কিছু

অর্থ দিলেই বোধ হয় চলিয়া যাইবে। সেই চেষ্টাই করি না কেন? এত দিন দেখা সাক্ষাৎ নাই—বিবাহের রাত্রির পরদিন হইতেই দুজনে পৃথক্‌ ইহাতে দোষই বা কি? কিন্তু রুক্মিণীবাবু তাহাতে সম্মত হইবেন কি? আর নীহার সে-ই বা এ ঘটনা শুনিলে কি ভাবিবে? কি করিবে?" একটা প্রলয়ের ঝড় আসিয়া যেন তাহার সাজান কল্পনাকানন আজ ধূলিসাৎ করিয়া দিল। উত্তাল ভাবনা সাগরে পড়িয়া সে কোন দিকে কূলকিনারা দেখিতে পাইতেছিল না।

রুক্মিণীবাবুও গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই কদাকার, মূর্খ স্বামী নীহারের? ইহার সহিত নীহার ঘর করিতে যাইবে? বাল্যকাল হইতে যাহাকে কত যত্নে, কত আদরে মানুষ করিয়াছেন, নিজ কন্যা অপেক্ষাও যাহার প্রতি তাঁহার অধিক স্নেহ, শতবিলাসসুখোচিতা নীহার কি এখন একজন মিস্ত্রীর ঘরে গিয়া তাহার বাকি জীবন যাপন করিবে? ভগবান তাঁহাকে এরূপ পরীক্ষায় ফেলিবেন একথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

অনেকক্ষণ পর তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। সীতাপতি উঠিয়া বলিল "আমি বাড়ী যাই।" রুক্মিণীবাবু বলিলেন "এস।" এই সংক্ষিপ্ত কথার ভিতর দিয়াই উভয়ে বুঝিতে পারিলেন, উভয়ের মনে কি ঘোরতর বিপ্লব সংসাধিত হইয়াছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

"আসীৎ স দোলাচলচিত্তবৃত্তিঃ।"

রঘুবংশম্।

রুক্মিণীবাবু ও সীতাপতি বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। রুক্মিণীবাবুর অনুসন্ধান শেষ হইয়া গিয়াছে, যতদূর জানিতে পারিয়াছেন; তাহাতে যথার্থই লোকটি নীহারের স্বামী বলিয়া তাঁহার প্রত্যয় হইয়াছে। সীতাপতিও অনুসন্ধান করিয়াছিল। সেও বুঝিতে পারিয়াছে যে লোকটা জালিয়াৎ নয়। এখন ভাবনা—কর্ত্তব্য কি?

আজ নীহারকে রুক্মিণীবাবু সকল কথা খুলিয়া বলিয়াছিলেন। শুনিয়া অবধি নীহার আড়ষ্টভাবে বসিয়াছিল। কোন কথা কয় নাই। তাহার পাণ্ডুবর্ণ মুখখানি দেখিয়া রুক্মিণীবাবুর অন্তরে শেলবিদ্ধ হইতেছিল। সীতাপতিরও একেবারে বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। যন্ত্রচালিতের মত সে চলাফেরা কথাবার্ত্তা কহিতেছিল।

এই সময় দ্বারবান আসিয়া তাঁহাদের চিন্তার বিষয়ীভূত লোকটির আগমন সংবাদ জানাইল। লোকটি আসিয়া রুক্মিণীবাবুকে নমস্কার করিয়া বলিল "আপনি খোঁজ নিয়েছিলেন কি?"

রু। হাঁ। যা খোঁজ পেলুম, তাতে তোমার কথা সত্য ব'লেই আমার বিশ্বাস হয়েছে। এখন তুমি কি করতে চাও ব'ল।

লো। আমি আর কি করতে চাইব? আমার স্ত্রীকে আমি নিয়ে যেতে চাই।

রু। দেখ, আমার একটা কথা বল্‌বার আছে। তোমার স্ত্রী এত-

দিন আমার বাড়ীতে আছে। আমার বাড়ীতে খেয়েছে। আমরা ব্রাহ্ম। তোমার স্ত্রীর জাত গিয়েছে। এরকম অবস্থায় তুমি তাকে গ্রহণ করবে কি ?

লো। নিশ্চয়ই। না জেনে খেলে দোষ হয় না। যদিই কিছু হয়ে থাকে, একটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নোব।

রু। শোন, বিষয়টা ভাল করে বোঝ। তোমার স্ত্রীকে আমি এতদিন নিজের মেয়ের মত পালন করেছি। সে লেখাপড়া শিখেছে, চিরদিন সুখে স্বচ্ছন্দে থেকে এসেছে। এখন সে গিয়ে কি তোমার বাড়ীতে থাক্‌তে পার্‌বে ?

লো। থাক্‌তে তাকে হবেই। আপনি বড়লোক, যদি কোন গরীবের ঘরে মেয়ের বিয়ে দেন, তাহ'লে কি মেয়ের কষ্ট হ'বে ব'লে মেয়েকে স্বামীর ঘর কর্‌তে দেবেন না।

রু। আমি সে কথা বল্‌ছি না। আমি বল্‌ছি—এখন তোমার স্ত্রী আমার বাড়ীতেই থাক্। তোমার যদি টাকার অভাব থাকে, আমি তোমাকে টাকা দিচ্ছি। তুমি যে কাজ কচ্ছ তা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন একটা কাজ ক'র। তার যোগাড়ও আমি ক'রে দোব। তারপর একটা ভাল বাড়ীটাড়ী ক'রে তোমার পরিবারকে নিয়ে যেও।

লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। কি যেন ভাবিতে লাগিল। তাহার পর বলিল "আজ্ঞে, আমি গরীব বটে, কিন্তু আমারও একটা ধর্ম্ম আছে। এতদিন না জেনে আমার স্ত্রী আপনার বাড়ী ছিল—খাওয়া-দাওয়াও করেছে। কিন্তু এখন জেনে শুনে আমি আমার স্ত্রীকে আর আপনার বাড়ী থাক্‌তে দিতে পারি না। আর চাকরীর কথা যা বল্‌ছেন—সেটা আপনার অনুগ্রহ—কিন্তু আমি যে চাকরী করি, তাতেই আমাদের দুজনের খাওয়া পরা চ'লে যাবে। আপনার

টাকাকড়ি নিয়ে আমি বড়মানুষি করতে চাই না। আর তা পারবও না। চিরটাকাল একভাবে কেটে গেল, এখন আর বড়মানুষি আমার সইবে না।"

রুক্মিণীবাবু এই কথাগুলি শুনিয়া লোকটিকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সীতাপতিও বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। এমন কথা এই দরিদ্র কদাকার মিস্ত্রীটার মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে, এ কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই।

রুক্মিণীবাবু বলিলেন "দেখ, তোমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে যেতে চাইবেন কি না সেটা একবার তাকে জিজ্ঞাসা করতে হয়?"

লো। স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে যেতে চাইবে না কেন?

রু। তুমি কি তার সঙ্গে দেখা করতে চাও?

লোকটি একটু সঙ্কুচিত ভাবে বলিল "তা যদি দরকার মনে করেন—তা'হ'লে—না হয়—"

রু। দরকার বই কি? সে-ও তোমায় দেখে নি। একবার দেখা সাক্ষাৎ হওয়াই ভাল।

লোকটি আবার সঙ্কুচিত ভাবেই বলিল "আচ্ছা তা হ'লে—"

রুক্মিণীবাবু বলিলেন "তুমি বোস। আমি আসছি।"

নীহার পাশের ঘরেই দাঁড়াইয়াছিল। একখানা চেয়ারের হাতল দুই হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া তাহার উপর নিজের শরীরের সমস্ত ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রুক্মিণীবাবু বৈঠকখানা হইতে বাহির হইতেই তাহাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া বুঝিলেন যে, সে তাঁহাদের কথোপকথন সমস্তই শুনিয়াছে। বলিলেন "মা! একবার দেখা করবে কি?"

নীহার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "হ্যাঁ।"

রুক্মিণীবাবু বাহিরে গিয়া লোকটিকে ডাকিয়া আনিলেন। নীহারের

সম্মুখে উপস্থিত করাইয়া দিয়া রুক্মিণীবাবু বৈঠকখানায় গেলেন। সীতা-পতির আর এ সব সহ্য হইতেছিল না। রুক্মিণীবাবু যাইতেই সে বলিল "আমি যাই।" রুক্মিণীবাবুও তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহাকে থাকিবার জন্য জিদ করিলেন না।

লোকটি গৃহে প্রবেশ করিলে নীহার তাহাকে প্রণাম করিল। পরে আগেকার মত চেয়ারের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল। তাহার পা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

সেই অষ্টাদশবর্ষীয়া তরুণীর দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া লোকটি অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিল। বোধ হয় তাহার জীবনে এরূপভাবে পতি পত্নীর সাক্ষাতের কথা কখনও সে শুনে নাই। সে যে কি বলিবে তাহা খুঁজিয়া পাইল না। গৃহে প্রবেশ করিয়া একবার মাত্র তরুণীর দিকে চাহিয়াছিল। তার পর বালক অপরাধ করিলে যেমন শাস্তি-প্রত্যাশায় অবনতমুখে দাঁড়াইয়া থাকে, তেমনই অন্তদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নীহার বলিল "আপনি বসুন।"

লোকটি যেন তাহাই চাহিতেছিল, নিকটেই যে চেয়ারখানা ছিল, তাহার উপরেই বসিয়া পড়িল! কিন্তু কোন কথা কহিল না।

নীহার আবার বলিল "আপনি আমায় নিয়ে যেতে এসেছেন। কিন্তু আমার একটা কথা বল্‌বার আছে। আমি জান্‌তুম না যে আমার বিবাহ হয়েছে। আমার আবার বিবাহের সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল। বোধ হয় আর কিছুদিন গেলে বিবাহ হ'য়েই যেত। এটা আপনার জানা দরকার। সীতাপতি বাবুর সঙ্গেই আমার বিবাহের কথা হয়েছিল—আর আমিও তাকে—"নীহার আর বলিতে পারিল না।

লোকটি সেইরূপ মুখ নীচু করিয়া চেয়ারের একটা বেতের টুক্‌রা

টানিয়া ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিল "ঐ বাবুটি বুঝি? যাকে আমি বাইরে দেখে এসেছি।"

নীহার বলিল "হাঁ। সেইজন্য আমার একটা প্রার্থনা, আমার মন দুর্ব্বল। হয়ত বশে আন্‌তে পারব না। আপনি যদি এ কথা জেনেও আমায় নিয়ে যেতে চান—আমি যাব—কিন্তু একটি প্রতিশ্রুতি আপনাকে কর্‌তে হ'বে।"

লো। কি?"

নীহার বলিল "আমি আপনার সেবা শুশ্রূষা সবই করব। কিন্তু—কিন্তু—" নীহার একবার গলাটা পরিষ্কার করিল—তারপর বলিল "আপনি আমার অসম্মতিতে অঙ্গস্পর্শ কর্‌বেন না। তা হ'লে হয়ত আমার বিদ্রোহী মনকে আর বশে রাখ্‌তে পার্‌ব না।"

লোকটি বলিল "তাতে আমার আপত্তি নেই। আমি প্রতিশ্রুত হচ্ছি। তোমার অনিচ্ছায় আমি কখনও তোমার অঙ্গস্পর্শ কর্‌ব না।"

"তা হ'লে যত শীঘ্র পারেন আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। এই বলিয়া নীহার সে কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

লোকটি ধীরে ধীরে বাহিরের ঘরে গেল। রুক্মিণীবাবুকে বলিল "আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে যেতে রাজী হয়েছে। এখন আপনি অনুমতি দিলেই আমি যাবার ব্যবস্থা করি।"

রু। কোথায় নিয়ে যাবে?

লো। দক্ষিণেশ্বরে আমার বাসা। সেইখানেই নিয়ে যাব।

রুক্মিণীবাবু বলিলেন "আচ্ছা, কাল সকালে এস।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"রম্যানাং বিকৃতিমপি শ্রিয়ং তনোতি।"

কিরাতার্জ্জুনীয়ম্।

বেলা প্রায় তিনটার সময় একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী দক্ষিণেশ্বরের একখানা মৃণ্ময় গৃহের সম্মুখে আসিয়া থামিল। শকটচালকের পার্শ্বে নীহারের স্বামী বসিয়াছিল। গাড়ীর উপর একটা তোরঙ্গ, বিছানা ও একটা বড় পুটুলি। গাড়ীর ভিতর নীহার।

এককালে দক্ষিণেশ্বরে তেলের কলের খুব প্রসার হইয়াছিল। নানা কারণে সেগুলি এখন উঠিয়া গিয়াছে। সেইরূপ পরিত্যক্ত সুবৃহৎ কলের এক প্রকাণ্ড আটচালার প্রান্তে দুইখানি ছোট ঘর নীহারের স্বামী ভাড়া লইয়াছিল। মাটির দেওয়াল, খোলার চাল। ঘর দুইখানি কলেরই এক অংশ। ইচ্ছা করিলে ঘর হইতে পরিত্যক্ত কলের সর্ব্বত্রই যাওয়া যাইত।

নীহার গাড়ী হইতে নামিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। চারিদিক অপরিষ্কার। বোধ হয় বহুদিন ঝাঁট পড়ে নাই। মাচার উপর ও ঘরের কোণে মাকড়সার জাল ও ঝুল। একটা দড়ির উপর খান দুই কাপড়, একটা কোট ও একখানা চাদর ঝুলিতেছিল। ঘরের এককোণে একটা মাটীর কলসী—তার মুখে একখানা ছোট মাটির সরা চাপা। একটা কলাইকরা গেলাস তাহার পাশে উপুড় করিয়া বসান আছে। একখানা

পুরাতন কাঠের তক্তপোষ কয়েকখানা ইটের উপর বসান। তাহার উপর একখানা মাদুর, একটা ছেঁড়া তোষক ও একটা বালিশ পড়িয়া আছে। তক্তপোষের নীচে খানকতক বাসন বিশৃঙ্খলভাবে স্থাপিত। ঘরের এক-পাশে একটা তোরঙ্গ। একটা খুঁটির গায়ে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ ঝুলিতেছে।

নীহারের স্বামী গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকাইয়া দিলে গাড়োয়ান চলিয়া গেল। নীহার অবসন্নভাবে তক্তপোষখানার একপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। গাড়ীখানার চলিয়া যাওয়ার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সুখ, সৌভাগ্য, আহ্লাদ সবই যেন চলিয়া গেল। কয়েদী যেন জগৎ ছাড়িয়া কারাগারে প্রবেশ করিল। এ কয়দিন নীহার নিজের মনের সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম করিয়াছে কিন্তু এই গৃহে ঢুকিয়া তার পরাজয় মানিবার উপক্রম হইল। কর্ত্তব্যের আহ্বানে সে জীবনের সমস্ত সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। সে যদি শিক্ষিতা না হইত তাহা হইলে বোধ হয় এতটা করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইত না। কিন্তু শিক্ষিতা হওয়াতে তাহার ক্লেশও গুরুতর হইয়াছিল। সাধারণ অশিক্ষিতা হিন্দুকন্যা এতকাল পরে সহসা স্বামী পাইয়া হয়ত সহজভাবে স্বামীগৃহে নিজ স্থান অধিকার করিয়া লইতে পারিত। কিন্তু নীহারের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। সে যেরূপে শিক্ষিতা হইয়া যেরূপ জীবনযাপন করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে এখন তাহার বিবাহ হইলে পুরোহিতের দুইটা মন্ত্র উচ্চারণে অজ্ঞাতপূর্ব্ব কাহাকেও একেবারে প্রাণমন উৎসর্গ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। হিন্দুর গৃহে বালিকা বয়সে বধূ হইয়া স্বামীর গৃহে আসিয়া ধীরে ধীরে শত ক্ষুদ্র ঘটনায়, আদর যত্ন, সোহাগে যে বঙ্গবধূ স্বামীকে আপনার বলিয়া চিনিতে পারে, নীহারের অদৃষ্টে তাহাও ঘটিবার উপায় নাই। যে বয়সে বঙ্গবধূ প্রায় গৃহিণী হইয়া পড়ে সেই বয়সে সে স্বামীর গৃহে আসিল। আর

আসিল কি মন লইয়া ? আগে হইতে সে একজনকে ভাল বাসিয়া নিজ হৃদয় নিবেদন করিয়া ফেলিয়াছিল। চিত্তপটে তাহার মূর্ত্তি আঁকিয়া পূজা করিয়াছিল। তাহার সহিত ভবিষ্যৎ জীবনযাপনের কত সুখের চিত্র কল্পনা করিয়াছিল। বালিকার ক্ষণিক আকর্ষণ, কিশোরীর অকিঞ্চিৎকর মোহ নহে, যে বয়সে রমণী ভালবাসা বুঝিতে পারে সেই বয়সেই তাহার হৃদয়ে সীতাপতি নিজমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কর্ত্তব্যের আহ্বানে নিজ মনকে সংযত করিবার প্রয়াস সে প্রাণপণে করিতেছিল বটে, কিন্তু সে শক্তি তাহার কতদূর আছে তাহা একবারও সে ভাবিয়া দেখে নাই। সুন্দর বসন ভূষণ বা সজ্জিত কক্ষের অভাব তাহাকে ব্যথিত করিতেছিল না। দৈহিক পরিশ্রমে সকল গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে, এ চিন্তাতেও সে বিচলিত হইতেছিল না। কিন্তু কেবল মনে হইতেছিল—সীতাপতিকে সে ফিরাইয়া দিয়াছে। আসিবার আগে সীতাপতি একবার দেখা করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু নীহার এক বার শেষ দেখা পর্য্যন্ত করিতে দেয় নাই। নীহার মনে মনে বুঝিতে পারিতেছিল যে, এ চিন্তাও তাহার পক্ষে পাপ—কিন্তু উপায় ছিল না। কালনাগিনীর মত এই চিন্তা তাহার মনকে শত পাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। ঘুরিতে ফিরিতেই সে তাহার পেষণ অনুভব করিতেছিল। এই নিরানন্দময় গৃহে ঢুকিয়া অবসাদে তাহার চিত্ত পূর্ণ হইয়া গেল। সীতাপতিকে ফিরাইয়া দিয়াছে—দেখা পর্য্যন্ত করিতে দেয় নাই, তবু তাহার অবোধ মন কেবলি ভাবিয়াছে, সীতাপতি নিশ্চয়ই জোর করিয়াও একবার দেখা করিবে। কিন্তু সে প্রত্যাশা যখন তাহার সফল হইল না, তখন কেবল তাহার অশান্ত মন বারবার অধীর শিশুর মত বিদ্রোহের সুরে কাঁদিয়া উঠিতেছিল "কেন, একবার শেষ দেখা করিলাম না ?"

এইরূপ মন লইয়া নীহার যে কিরূপে সংসার করিবে, কিরূপে স্বামীর

সেবা করিবে তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না। যে সঙ্কল্পের বশে সে দৃঢ়চিত্তে রুক্মিণীবাবুর বাড়ী ত্যাগ করিয়া সমস্ত দুঃখ কষ্টকে বরণ করিতে আসিয়াছিল, এই গৃহে প্রবেশ করিয়া একদিকে যেমন তাহার মনে হইল যে, সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে—কর্ত্তব্যের খাতিরে সে সব করিতে পারিয়াছে, অপরদিকে তেমনি তাহার মন অবসাদ ও নৈরাশ্যে পূর্ণ হইয়া গেল। এতক্ষণ একটা কাজ আছে মনে করিয়া উত্তেজিত ভাবে সে সেই কাজের পিছনে ছুটিতেছিল, এখন সেই কর্ত্তব্যকাজটা সমাধা হইয়া গিয়াছে। তাই তাহার শরীর ও মনও সঙ্গে সঙ্গে অসাড় হইয়া গেল। আর্দ্র অন্ধকারময় কুটীরের মধ্যে সে নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিল। তাহার জীবনের সার্থকতা যেন ফুরাইয়া গিয়াছে। এই তাহার স্বামী, ইহার সহিত তাহাকে একত্র থাকিতে হইবে, এ কথা সে ভাবিতে পারিতেছিল না। সে ত এ আকর্ষণে বাহির হইয়া আসে নাই। এ কথা ভাবিলে হয় ত সে আসিতেই পারিত না। রুক্মিণীবাবুকে, রুক্মিণী-বাবুর পত্নীকে, হিরণ্ময়কে—আর—আর সীতাপতিকে ছাড়িতে হইবে—যেমন করিয়া হউক ছাড়িতেই হইবে—এই কথাই সে বার বার ভাবিয়া এতক্ষণ নিজ উদ্ধত মনকে কশাঘাত করিতেছিল। সেই কশাঘাতে উত্তেজিত মনও অন্ধ অশ্বের মত এতক্ষণ এক পথে ছুটিয়া আসিয়াছিল। এখন অতলস্পর্শ গহ্বরে পড়িয়া গেল। উদ্ধারের আর উপায় নাই!

নীহারের স্বামী ঘরের এক কোণ হইতে তামাক, হুঁকা, কলিকা, দিয়াশলাই সংগ্রহ করিয়া ইতিমধ্যে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া ফেলিয়াছিল ও ঘর হইতে বাহিরে গিয়া অপর ঘরখানির দাওয়ায় বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে ধূমপান করিতেছিল। তাহার মুখের ভাব প্রসন্ন। কি একটা কঠিন কাজ যেন উদ্ধার করিয়া ফেলিয়াছে, এই ভাবে রহিয়া বসিয়া, ইদু একবার কাশিয়া, মাঝে মাঝে থুথু ফেলিয়া, চক্ষু ঈষৎ মুদ্রিত করিয়া

সে আয়েসে ধূমপান করিতেছিল। নীহার কি করিতেছিল, সে দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখে নাই। অবশেষে কলিকার সমস্ত তামাকটুকু নিঃশেষ হইয়া যখন গুল পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম হইল, তখন হুঁকায় দুই চারিটা নিষ্ফল টান দিয়া সে হুঁকাটিকে ঘরের দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিল ও সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

সেটা রান্নাঘর। সেই ঘর হইতে একটা কলসীতে করিয়া জল ও একটা ঘটি বাহির করিয়া দাওয়ায় রাখিয়া নীহারের ঘরে গিয়া বলিল "জল দিয়েছি। হাত মুখ ধুয়ে ফেল।"

নীহার যে একথা শুনিল তাহা বোধ হইল না। তাহার স্বামী আবার বলিল "শুন্‌ছ?"

নীহার চমকিয়া উঠিয়া বলিল "এ্যাঁ? কি বল্‌ছেন?"

তাহার স্বামী বলিল "দেখ, আমাদের ঘরে স্ত্রীরা স্বামীকে তুমি বলেই কথা ব'লে! 'আপনি' 'মশাই' ক'রে কথা বলা কেন?"

নী। আমার কেমন বাধ-বাধ ঠেকে। আমি তা বল্‌তে পারব না।

"আচ্ছা, তুমি যা ইচ্ছা তাই ব'লো। এখন ওঠ, হাত পা ধুয়ে নাও। কিছু জলখাবার কিনে আন্‌ব? রাত্রিতে কি রান্না হবে? আজ রাঁধবে? না খাবার টাবার খেয়েই কাটাবে? বাসন তোমায় মাজ্‌তে হবে না। একজন ঠিকা ঝি-কে বলে রেখেছি। তাকে মাসে দু'টাকা করে দিতে হবে। সে দুবেলা এসে বাসন মেজে ঘর ঝাঁট দিয়ে যাবে। আমি ত সমস্ত দিন বাড়ীতেই থাক্‌ব না। আটটার সময় আমাদের হাজিরা। ভোরে উঠে খেয়েই বেরিয়ে যাব। রাত আটটা, ন'টায় আস্‌ব। দোকান থেকে কিছু আন্‌তে হ'লে ঝিই এনে দেবে। আমিই রাঁধ্‌ব এখন। কি ব'ল? তোমার ত অভ্যেস্ নেই?"

নী। আমি রাঁধ্‌তে জানি। আমিই রাঁধ্‌ব।

ধীরে ধীরে নীহার এই কথাগুলি বলিল। তাহার বর্ত্তমান অবস্থাটা ক্রমশঃ তাহার মনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। কি কঠিন পরীক্ষার সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে, তাহার কতক আভাস সে এতক্ষণে পাইল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া সে উৎফুল্ল হইয়াছিল, সে প্রফুল্লতা এক নিমেষেই অন্তর্হিত হইয়া গেল। তাহার স্বামীকে "তুমি" সম্বোধন করিতে হইবে, এই সামান্য কথাটিতেই সে বুঝিতে পারিল যে, কি কঠিন পরীক্ষায় সে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। মন যাহাকে ভালবাসে না, কখনও দেখে নাই, শুনে নাই—আর একজনের চিন্তায় এখনও মগ্ন, সেই অপরিচিতকে আজ কি করিয়া পরিচিত করিয়া লইবে? আপনার জনের মত তাহাকে রাঁধিয়া বাড়িয়া দিবে? খাওয়াইবে? রোগ হইলে শুশ্রূষা করিবে?

"আচ্ছা, তবে আমি জলখাবার আনি। তুমি হাত মুখ ধোও। ঐ সামনের ঘরটা রান্নাঘর।"

নী। আমি কিছু খাব না। আপনার মত খাবার আনুন।

"আমার এখন খাওয়া অভ্যেস নয়। তোমার পাছে কষ্ট হয় তাই বলছিলুম। আমি সেই ভোরে ভাত খেয়ে বেরুই, আর রাত্রিতে এসে ভাত খাই। তুমি যদি না খাও, তাহ'লে আর খাবার আনার দরকারই নেই। রাত্রিতে শোবার ব্যবস্থা তাহ'লে কি রকম হ'বে?"

নীহারের সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। এ সম্ভাবনাটা ইহার আগে তাহার মনে জাগ্রত হইয়া দেখা দেয় নাই। সে তাহার স্বামীকে প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইয়াছে যে তাহার স্বামী তাহার অঙ্গস্পর্শ করিবে না। কিন্তু —কিন্তু—সে তাহার স্বামী। নীহারের মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না।

নীহারের স্বামী নিজেই বলিল "তুমি এই চৌকীর উপর বিছানা

ক'রে শোবে এখন। তোমার বিছানা ত' সঙ্গেই এনেছ। আমার বিছানা আমি রান্নাঘরে নিয়ে যাচ্ছি। ও ঘরেই এক পাশে শোব। তোমার একলা শুতে ভয় কর্‌বে বলে আমি ঝিকে বলে রেখেছি, সে রাত্রিতে এসে তোমার ঘরের মেঝেয় শুয়ে থাক্‌বে। তুমি মশারি খাটিয়ে নিও, নইলে মশার কামড়ে ঘুমুতে পার্‌বে না।"

নীহার একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। কিছুতেই তাহার মন তাহার স্বামীকে আপনার জন বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। যদি তাহার স্বামী এ প্রস্তাব না করিত তাহা হইলে সে যে কি করিয়া বসিত, তাহার বিদ্রোহী মন যে কি অঘটন ঘটাইত, সেই চিন্তাতে সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহার স্বামী নিজেই যে প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া এতদূর ভাবিয়া রাখিয়াছে, তাহার জন্য সে কৃতজ্ঞ না হইয়া পারিল না। সে জোর করিয়া উঠিল ও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন করিয়াই হোক্, নিজের বিদ্রোহী মনকে সে দমন করিবার চেষ্টা করিবে।

"বাবাঠাকুর; বাড়ী আছেন নাকি?" এই বলিয়া ঠিক্ এই সময় বাহিরে কে ডাকিল। নীহারের স্বামী বলিল "ঐ ঝি এয়েছে। ওর সঙ্গে সব ঠিকঠাক ক'রে নাও।"

নীহার বাহিরে গেল। বাহিরে এক বৃদ্ধা ও এক যুবতী দাঁড়াইয়াছিল। উভয়েই তাহাকে প্রণাম করিল। বৃদ্ধা বলিল "মা ঠাকরুণ-আমার নাম তুলসীর মা। এই আমার মেয়ে তুলসী। তুলসী রাত্রিতে এসে শুয়ে থাক্‌বে। দিনের বেলার কাজ কোনদিন আমি কোনদিন তুলসী করে দিয়ে যাব। আমরা ঠিকা খেটে খাই। বুঝ্‌লে মা ঠাক্‌রুণ। অনেক বাড়ীর কাজ করি, তা' তোমার কোন কষ্ট হ'বে না মা। আমরা একজন না একজন এসে তোমার কাজ করে দিয়ে যাব।"

তুলসী অবাক্ হইয়া নীহারের রূপলাবণ্য দেখিতেছিল। নীহারের স্বামীর পৃথক শয়নের ব্যবস্থা শুনিয়া সে আগে হইতেই আশ্চর্য্য হইয়াছিল, এখন নীহারকে দেখিয়া তাহার বিস্ময় আরও শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। নীহার তাহার রকম সকম দেখিয়া একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল "কি ? অমন হাঁ ক'রে দেখ্‌ছিস্ কি রে ?"

তুলসী অপ্রতিভ হইয়া মাথা নীচু করিল। তুলসীর মা বলিল "ওর ঐ রকম স্বভাব গো মা ঠাকরুণ। একটু ভোলা—রকমের মানুষ। তা কাজে কোন দোষ পাবে না মা। সেদিকে সব ক'রে দেবে। এই ভট্‌চায্‌ ম'শায় সেদিন বলছিলেন—সম্পর্কে ঠাকুরদাদা হন কি না—আমার শিবের শ্মশানও অন্নপূর্ণার হাতে গোছাল হ'য়ে উঠেছে।"

তুলসী তাড়াতাড়ি বলিল "তুই থাম্ মা। কবে কে কি বলেছিল সেই সব অনাছিষ্টি কথাও এত তোর মনে থাকে ?"

নীহার উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল "বোস। বোস। দুটো কথা কই।"

মেঘের উপর ঈষৎ রৌদ্র ফুটিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

"আজও তার সেই মন্ত্র, সেই তার উদার নয়ান
ভবিষ্যের পানে
একদৃষ্টে চেয়ে আছে, সেথায় সে কি দৃশ্য মহান্
হেরিছে কে জানে ?
অশরীর হে তাপস, শুধু তব তপোমূর্ত্তি ল'য়ে
আসিয়াছ আজ,
তবু তব পুরাতন সেই শক্তি আনিয়াছ ব'য়ে
সেই তব কাজ।"

রবীন্দ্রনাথ।

প্রসন্নসলিলা জাহ্নবীর জলরাশি দক্ষিণেশ্বরের রাণী রাসমণির মন্দিরের সম্মুখস্থ সোপানতলে লুটাইয়া পড়িতেছে। কোন্ সে শিল্পী ধ্যানের সুষমায় আকার দিয়া এ মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছে কে জানে ? নিভৃত পল্লীর প্রান্তদেশে কলনাদিনী ভাগীরথীর তটে রম্য উদ্যান রচনা করিয়া স্তরে স্তরে দ্বাদশটি শিবমন্দির স্থাপনা করিয়াছে। পশ্চাতে গগনচুম্বি রাধা-কৃষ্ণ ও কালীর মন্দির। প্রশস্ত নাটমন্দির ও সুবিশাল প্রাঙ্গন একদিকে বিশালতায় যেমন বিস্ময় জাগাইয়া দেয়, অপরদিকে বিহঙ্গকাকলী ও শীকরস্নিগ্ধ সমীরবাহিত তরঙ্গের মৃদু নাদ তেমনি শ্রবণ নয়ন রঞ্জন করিতে থাকে। পুণ্যব্রত ভারতের অধিবাসিগণ ধর্ম্মের তরে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া ভারতের নানাস্থানে যে শিল্প-সুষমার অক্ষয় নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে,

দক্ষিণেশ্বরের এই মন্দিরগুলি আকারে বা আয়তনে তাহাদের সমতুল্য না হইলেও অবস্থান ও রচনানৈপুণ্যে তাহাদের কোনটির অপেক্ষা-হীন নহে। প্রতিষ্ঠাত্রীর অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া আজ মন্দিরগুলি সমুন্নত-শীর্ষে দণ্ডায়মান। সরকার হইতে প্রদত্ত না হইলেও রাসমণির রাণী উপাধি আজ সকলের মুখে।

ভক্তির আবেগে, ভাবের উচ্ছ্বাসে বুঝি বা শিল্প এমনই আকার ধারণ করে। মোগলযুগের বহুমূল্য মর্ম্মর বা প্রস্তরাদি ইহাতে নাই, মন্দিরগাত্র সূক্ষ্ম সুনিপুণ চিত্র বা মূর্ত্তিমণ্ডিত নহে, তথাপি কালবশে মলিন এই মন্দিরগুলির যে প্রসন্ন গম্ভীর সৌন্দর্য্য তাহা বুঝি নবাবদের কোটিমুদ্রা-গঠিত বিলাসভবনেও নাই। কেবল ভাবুকের চক্ষে ভক্তের চক্ষে নহে, গঙ্গাবক্ষে তরণীর উপর হইতে নিত্যকর্ম্মরত নাবিকেরাও প্রভাতকিরণোজ্জ্বল মন্দির শোভার দিকে বিস্ময়বিস্ফারিত-লোচনে চাহিয়া থাকে।

সেরূপ সংস্কার নাই, যত্ন নাই, মন্দিরগাত্র স্থানে স্থানে ভগ্ন। শৈবালোদ্গমে হরিদ্বর্ণ, কোথাও বা মসীমলিন। ইহাতেই যেন রূপ আরও ফুটিয়াছে। কত প্রাচীনকালের স্মৃতি বহিয়া কত লক্ষ যাত্রীর ভক্তিপূর্ণ লুণ্ঠিত শীর্ষের পরশ লাভ করিয়া মন্দির যেন জাগ্রত। নাট-মন্দিরের গাত্রে আধুনিক ফ্যাসনে বাবুদের পেন্সিলে লিখিত অসংখ্য নাম রূপ কলঙ্ক মন্দিরের গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিতে পারে নাই। সেকালে লোক মন্দিরদর্শনে যাইত—নিজে ধন্য হইতে, এখন যায় নিজের নাম খুঁজিয়া আসিতে।

আর যে শুভ সুযোগে রাণী রাসমণি তাঁহার মন্দিরে এক মহাপুরুষ পাইয়াছিলেন, তাহাও স্মরণীয়। একনিষ্ঠ ভক্তি ও সাধনায় বুঝি দেবতাকেও জাগ্রত করিয়া এই সাধক দেশদেশান্তর হইতে ভক্তমণ্ডলী আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। আজ তাই শুধু ভারতে নহে, সমগ্র জগতে

তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী পরিব্যাপ্ত। এই মহা-প্রচারের আদিম কেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরসংলগ্ন নিভৃত কুঞ্জ পঞ্চবটী ও সাধনার ক্ষেত্র বটমূল।

এখনও সেই পশ্চিমদুয়ারী ক্ষুদ্র কক্ষখানি বিদ্যমান। এখনও তাহাতে সেই ক্ষুদ্র, সামান্য শয্যা তেমনি বিস্তৃত। সাধারণ মানুষ যেমন বাস করে, এই কক্ষটি দেখিয়া তাহার অতিরিক্ত কিছু মনে হয় না। কিন্তু এই সাধারণভাবে জীবনযাপনের মধ্যেই রামকৃষ্ণ পরমহংস যে অসাধারণ সাধন করিয়াছিলেন তাহার ফল আজ সমগ্র জগতে ধীরে ধীরে পরিব্যাপ্ত হইতেছে।

নীহার যেদিন তাহার স্বামীর সহিত দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেল, সীতাপতি সেদিন একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু নীহার তাহাতে সম্মত হয় নাই। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে সীতাপতি ফিরিয়া গিয়াছিল। তাহার আর কোন কাজ—কোন কর্ত্তব্য আছে বলিয়া মনে হইতেছিল না। অন্তরের সমস্ত ইচ্ছা একত্রিত করিয়া যাহাকে আশ্রয় করিয়াছিল আজ সে চলিয়া গিয়াছে। পিতামাতার সহিত বিবাদ, অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ, সমাজত্যাগে প্রতিজ্ঞা সব আজ ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয়ে সে কয়েকদিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আজ কিসের আকর্ষণে ষ্টীমারে চড়িয়া সে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

ষ্টীমারঘাট হইতে নামিয়া জেটি পার হইয়া পথে উঠিতেই একখানা দোকানের পার্শ্বে সীতাপতি লোকের জনতা দেখিতে পাইল। সীতাপতি সকৌতূহলে অগ্রসর হইয়া দেখিল, নিদারুণ বসন্তরোগে জর্জ্জরিত-দেহ এক রোগী ভূতলে পড়িয়া আছে। দর্শকেরা কেহ তাহার নিকটে ঘেঁসিতে সাহস করিতেছে না। দূর হইতে তাহার অবস্থা দেখিয়াই চলিয়া যাইতেছে।

লোকটি জাতিতে ডোম। কুলীর কাজ করিতে আসিয়াছিল। যার বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল সে তাহার রোগ দেখিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। কলিকাতায় তাহার কে দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিল তাহার নিকট যাইবার জন্য ষ্টীমারঘাটে আসে। কিন্তু তাহার সংক্রামক রোগ দেখিয়া তাহাকে ষ্টীমারে লয় নাই। লোকটি তাই ঘাটের নিকট পড়িয়াছিল।

সীতাপতি বলিল "একে হাঁসপাতালে নিয়ে গেলে হয় না?"

রোগী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "আমি হাঁসপাতালে যাব না। এখানে ম'রে যাই তাও ভাল। মা গঙ্গার জলে মরব।"

সীতাপতিই একলা দাঁড়াইয়াছিল। খুব ভীড় হইতেছিল বটে কিন্তু সে ভীড় এক দল লোকের নহে। এক এক দল লোক ষ্টীমার হইতে নামিতেছিল, একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়াই আবার চলিয়া যাইতেছিল। আবার আর একদল আসিয়া দাঁড়াইতেছিল। লোকটির অবস্থা দেখিয়া সীতাপতির অত্যন্ত কষ্ট হইল কিন্তু সে কি করিবে তাহা স্থির করিতে পারিল না।

এই সময় দু'জন যুবক আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। রোগীটিকে দেখিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল সে কে, তাহার এমন অবস্থা কেন? কোথায় যাইবে?

রোগী ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল। তখন তাহাদের মধ্যে একজন অপরকে বলিল "বিমল তুমি তাহ'লে একে নিয়ে যাও। একখানা নৌকা ঠিক কর।"

"এখানে ত নৌকা একখানাও নেই। রাসমণির ঘাটে বোধ হয় আছে।"

"চল আমি একে তুলে নিয়ে যাচ্ছি।" এই বলিয়া বক্তা জামা খুলিয়া বিমলের হাতে দিল ও দুইহাতে জড়াইয়া রোগীটিকে কাঁধে তুলিয়া লইল।

পরে আগে আগে বিমল, তারপর সে ও পশ্চাতে সীতাপতি চলিতে লাগিল।

রাণী রাসমণির মন্দির-সম্মুখে গঙ্গাগর্ভে যে সোপানাবলী নামিয়া গিয়াছিল, সেখানে পৌঁছিয়া দু'খানি নৌকা পাইল। একখানি বিমল ভাড়া ঠিক করিয়া রোগীটিকে তাহার উপর তুলিয়া লইল। নৌকা ছাড়িয়া দিল।

যে রোগীকে কাঁধে লইয়া গিয়াছিল, সীতাপতি তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল তাহার দেহে রোগীর বসন্তগুটিকার ছাপ লাগিয়াছে। যুবক তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। সীতাপতি আরও দেখিয়া বিস্মিত হইল যে যুবকের গলায় যজ্ঞোপবীত। সে ডোমকে ছুঁইতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করে নাই!

সীতাপতি যুবকের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক হইল। যুবক তখন গঙ্গাতীরে বসিয়া সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকা মাখিতেছিল। সীতাপতি তখন অগ্রসর হইয়া বলিল "একে কোথায় পাঠালেন?"

যু। বেলুড় মঠে। সেখান থেকে ওর ব্যবস্থা হ'বে।

সী। আপনি কি মঠেই থাকেন?

যুবক স্নান করিতে করিতে বলিল "কখন কখন।"

সী। আপনি কি রামকৃষ্ণ মিশনের?"

যু। তা ঠিক্ বলতে পারি নি। তবে মিশনে ঢুকতে ইচ্ছা আছে বটে।

যুবক স্নান সমাপন করিয়া মাথা মুছিয়া সিক্তবস্ত্র নিংড়াইয়া বাঁধান বটবৃক্ষমূলে আসিয়া বসিল। সীতাপতিও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

সীতাপতি বটবৃক্ষমূলের একপ্রান্তে বসিয়া বলিল "আচ্ছা, এ মিশনের মূল উদ্দেশ্য কি?"

যুবক বলিল "তা আমি বল্‌তে পারি নি। তবে আমি যতটুকু বুঝেছি সেবাই মিশনের প্রধান কর্ত্তব্য। আমি পরমহংসদেবকে দেখিনি, বইয়ে পড়ে' যা কিছু বুঝেছি তাতে মনে হয় তিনি যে আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন তা যদি আমরা অনুসরণ করি তা হ'লে শুধু আমরা কেন, দেশও ধন্য হয়।"

সী। কিন্তু লোকে যে তাঁকে অবতার ক'রে তুল্‌ছে। তাঁর মত ভুলে গিয়ে একটা দল বাঁধবার চেষ্টা করছে।

যু। আপনি ভুল বুঝেছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস কোন দল বাঁধ্‌তে আসেন নি। দলাদলি ভাঙ্গাই তাঁর মূল মন্ত্র। তিনি নিজেকে অবতার বলে ঘোষণা করেন নি, কোন নূতন ধর্ম্ম প্রচার ক'রে অসংখ্য ধর্ম্মপূর্ণ এই ভারতে নূতন ভেদের সৃষ্টি করেন নি! ভেদ দূর করাই তাঁর সাধন ছিল। তিনি হিন্দু হ'য়ে গায়ত্রী জপেছেন, খৃষ্টান হ'য়ে গির্জ্জায় গিয়েছেন, মুসলমান হ'য়ে নমাজ পড়েছেন। বৈষ্ণবমতে, শৈবমতে, শাক্তমতে— সকল সম্প্রদায়ের সব সাধনই তিনি নিজের জীবনে ক'রে গেছেন। বলে গেছেন, সব ধর্ম্মই ভগবানলাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ। কেউবা সদর দরজা দিয়ে ঢুকে, কেউ বা খিড়কী দুয়ার দিয়ে। ইয়োরোপে যে Toleration মন্ত্র প্রচারিত, তার মধ্যেও এমন উদার বাণী নাই। তার অর্থ 'আমাদের ধর্ম্মই সত্য, তবে অন্যধর্ম্ম সহে যাও।' কিন্তু পরমহংস-দেবের বাণী 'সব ধর্ম্মই সত্য।'

সী। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন যে উদ্দেশ্য নিয়ে কার্য্য করছে তার সঙ্গে পরমহংসদেবের মতের সাদৃশ্য কি ?

যু। ভেদাভেদ জ্ঞান দূর কি এক কথায় হয়। আমাদের দেশের লোক অন্য দেশের লোক অপেক্ষা ধার্ম্মিক এ কথা সকলেই বলেন। কিন্তু কথাটা কতদূর সত্য ? বৈরাগ্যধর্ম্মটা খুব মুখে শোনা যায় বটে।

সকলেই বেদান্তে পণ্ডিত। চাষার মুখেও "পিতামাতা সুত, জায়া, এ জগৎ সকলই মায়া" গান শোনা যায়। কিন্তু এটা কেবল বিষয়ীর মালা ঠক্‌ঠকানর মত। যেখানে মুখের কথা ও কার্য্যের সামঞ্জস্য নেই, সেখানে আন্তরিক কোন ধর্ম্ম বিশ্বাসও নেই। পাঠশালার ছেলেও দুটো আধ্যাত্মিক তত্ত্বের শোনা বুলি তোতাপাখীর মত আবৃত্তি করবে কিন্তু এ দেশে কারও যথার্থ বিশ্বাস আছে কি? ভারতের বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন ধর্ম্মের ভেদজ্ঞান দূর করতে হ'লে অনেক রকম পথ অবলম্বন করতে হয়। তারই একটা পথ পরমহংসদেবের শিষ্য বিবেকানন্দ দেখিয়ে দিয়েছেন, সেটা এই সেবাধর্ম্ম।

সী। সেবাধর্ম্মে ভেদ জ্ঞান দূর হ'বে কি ক'রে?

যু। সেবায় লোক বা ধর্ম্মের প্রভেদ মানা হয় কি? হিন্দু হোক্, মুসলমান হোক, খৃষ্টান হোক সকলেরই সেবা করতে হ'বে। হিন্দুদের শত শত ক্ষুদ্র সম্প্রদায়, যে সেবা করে তার পক্ষে সকলেই সমান। যাদের অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য বলে লোকে নাক সিঁটকে চ'লে যায়, তারও সেবা করতে হ'বে। এই সেবাব্রতে ব্রতী হ'লে ভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন সম্প্রদায়, ভিন্ন জাতির দ্বেষ দূর হ'বে। ক্রমে ক্রমে যারা সেবা পাবে তাদেরও মনে এ ভাব জাগ্‌বে। এমন দিন আস্‌তে পারে যাতে ভারতে, শুধু ভারতে কেন সমস্ত জগতে এইরূপে নীতি ও ধর্ম্মগত বিদ্বেষ দূর হ'বে।

সী। এক সেবাধর্ম্ম ছাড়া কি আর কিছু নাই?

যু। তা থাক্‌তে পারে। কিন্তু আমরা এইটেই বুঝেছি, এইটেই শিখেছি। যাঁরা অন্য পথ ধরতে চান ধরুন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের বিবাদ নাই। এ দেশ বড় দুঃখী—হিংসাদ্বেষে জর্জ্জরিত। এদের দুঃখ যদি দূর করতে পারি, হিংসা দ্বেষ যদি কিছু কমাতে পারি তা হ'লেই

ঢের হ'ল। যে দেশে দুবেলা লোক পেট ভ'রে খেতে পায় না, রোগ হ'লে ঔষধ পথ্য পায় না, সে দেশের লোক আবার অন্য কথা ভাব্‌বে কখন? আমাদের কিছু নাই, অন্তরে সব পাবার প্রবল বাসনা, কিন্তু পাই না বলে মুখে বুলি বলি "আমরা ত্যাগী।' আমরা ঘোর তমোগুণে অভিভূত, উৎসাহ উদ্যম রহিত—নির্জীব জড়প্রকৃতি, অথচ মুখের বড়াইটুকু আছে 'আমরা সত্বগুণে গুণী, তাই কর্ম্মহীন।' নিজেদের চোখের এই ঠুলি না খুল্‌লে আমাদের আর উপায় নেই। দেশে আর দরিদ্র না থাকে, পেট ভরে সকলে দুটো খেতে পায়, রোগে ঔষধ পথ্য পায় তা' হ'লেই আমাদের যথেষ্ট।

সী। আপনাদের উদ্দেশ্য মহৎ। আমার সাধ হয় আপনাদের সঙ্গে এইরকম কাজ ক'রে জীবনটাকে সার্থক করি। আমি বড় দুঃখী। আমার জীবন লক্ষ্যহীন—উদ্দেশ্যহীন। আমায় আশ্রয় দেবেন কি?

যু। অবিবাহিত ও ব্রহ্মচারী না হ'লে সেবাকার্য্যে কাউকে নেয় না। বিবাহিত গৃহস্থ অর্থসাহায্য করতে পারেন, কিন্তু সেবা-ব্রত গ্রহণ করে যখন তখন ভারতের একপ্রান্ত হ'তে আর একপ্রান্তে ছুটে যেতে পারেন না। বন্ধ থাকলেই সঙ্কুচিত গতি হয়। তাই বন্ধনহীন যুবকেরাই সেবাধর্ম্মে নিয়োজিত হয়।

সী। আমি অবিবাহিত, কখনও যে বিবাহ কর্‌ব, সে সম্ভাবনাও নাই। আমায় আপনারা নেবেন কি?

যু। আমি বলতে পারি না। আমি এখনও মিশনে ঢুকি নি। শীঘ্রই ঢুকবো। তা আপনাকে মঠে নিয়ে যাই চলুন। সেখানে যা হয় একটা স্থির হবে। আপনি একটু বসুন, আমি একবার পরমহংস দেবের ঘর থেকে আসি।

সী। আমার যেতে কোন বাধা আছে?

যু। কিছু না। আসুন।

উভয়ে গিয়া জুতা খুলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন কক্ষে আর কেহ ছিল না। উভয়ে কক্ষতলে উপবেশন করিল। অধিকাংশ দরজা জানালা বন্ধ থাকায় ঘরটি ঈষৎ অন্ধকার। শয্যার উপর বালিশে হেলান দেওয়া পরমহংসদেবের প্রতিকৃতি। যুবক নয়ন নিমীলিত করিয়া বসিয়া রহিল। ঈষৎ অন্ধকার কক্ষটির নীরবতায় সীতাপতিও একটা অনির্ব্বচনীয় ভাব অনুভব করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ এইরূপে কাটিয়া গেল।

সহসা যুবক সীতাপতির হাত ধরিয়া মৃদুস্বরে বলিল "আপনি তবে কৃতসংকল্প ?"

সীতাপতির শরীর রোমাঞ্চিত হইল। বলিল "হাঁ।"

যু। তবে চলুন—যে মহাশক্তির উৎস থেকে দিকে দিকে আজ সহস্র প্রচার-সরিৎ ধাবিত, সেই শক্তির আকরকে প্রণাম ক'রে যাই। আমরা সেবায় লোক বশ কর্‌ব, বলে নয়। ভালবাসায় হিংসাদ্বেষ দূর ক'রে ভারতের লোককে একত্রিত কর্‌ব, ভয় দেখিয়ে নয়। থাক্ বিভিন্ন জাতি, থাক্ না বিভিন্ন ধর্ম্ম, আমাদের এক সেবাধর্ম্ম সব ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতের ধর্ম্মরূপে কোটি কোটি মানবের চিত্ত জয় কর্‌বে। আমাদের অন্য কোন কামনা নাই। ভারতের সব ধর্ম্মাবলম্বী সব জাতি এক সেবাধর্ম্মে মিলিত হয়ে 'ভাই ভাই' হোক্। সকলের দুঃখ সকলে অনুভব করুক। সকলে আজ পরমহংসদেবের উদ্দেশে বলুক—

"সেদিন শুনিনি কথা,—আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব

কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সৰ্ব্বদেশ
ধ্যান মন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী-বসন,
দরিদ্রের বল,
'এক ধৰ্ম্মরাজ্য হবে এ ভারতে'' এ মহাবচন
করিব সম্বল।"

তৃতীয় খণ্ড

ঝড়

প্রথম পরিচ্ছেদ

"ঢাল্ সুরা ঢাল্, ঢাল্ পুনর্ব্বার।"

অবকাশরঞ্জিনী।

নীরেন্দ্রের বড় টাকার দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। কয়েকমাস হইতে কলিকাতার যে সব বড়লোকদের ছেলের সঙ্গে সে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিল, টাকা না হইলে আর তাহাদের কাছে মান থাকে না। বাবার কাছে টাকা পাইবার উপায় নাই। গঙ্গাধর বাবু সে সব খরচের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতেই পারিবেন না—আর সকল খরচের কথা তাঁহাকে বলাও যায় না। সামান্য সামান্য দু একটা পোষাক পরিচ্ছদ বা গাড়ী ভাড়ার বাবৎ টাকা চাহিতে যাইয়াই নীরেন্দ্র পিতার নিকট শুনিয়াছে "এরকম খরচ ত রাজা রাজড়ারাও করে না। আমাদের গেরস্ত ঘরে এ সব কেন?" অথচ তাহার বাবাই ত বড় ঘরের ছেলেদের সহিত মিশিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। শনিবারে, রবিবারে গার্ডেন পার্টি হয়, খানার খরচ, মদের খরচ, বাইজীর মজুরা—তাহার বন্ধুরা না হয় বরাবর দিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহার ত চক্ষু লজ্জা আছে? নিজে দু' একটা পার্টির খরচ না দিতে পারিলে কি আর চলে?

নীরেন্দ্র মায়ের নিকট কিছু টাকা পাইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। সুশীলাসুন্দরীর হাতে বেশী টাকা ছিল না। গঙ্গাধর বাবু কখনও বেশী টাকা কড়ি নিজ পত্নীকে দিতেন না। সামান্য

দু' পাঁচ টাকা হইতে নীরদাসুন্দরী জমাইয়া কিছু পুঁজি করিয়াছিলেন। সুদে খাটাইয়া তাহা কিছু বাড়াইয়াও ছিলেন। সেই টাকার দিকে নীরেনের লক্ষ্য পড়িল। তাহার বিশেষ পীড়াপীড়িতে একদিন সুশীলাসুন্দরী তাহাকে ১০০৲ টাকা দিলেন।

টাকাটা পাইয়া নীরেন্দ্র বিশেষ প্রফুল্ল হইল না। স্পষ্টই অসন্তোষের ভাব জানাইয়া বলিল "একশ' টাকায় আমার কি হ'বে? ও তুমি ফিরে নাও।"

সু। সে কি রে? একশ' টাকায় হ'বে না? তোর কিসের খরচ শুনি।

নী। গার্ডেন পার্টি হবে।

সু। সে আবার কি?

নী। বাগানে ভোজ হ'বে। সেখানে বন্ধু বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াব।

সু। কত লোক খাবে?

নী। দশ বারজন আমার বন্ধু, আর—আর সব অন্য অন্য লোক—এই চাকর বাকর বিশ ত্রিশজনই ধর।

সু। তাতে আর কত খরচ পড়্‌বে? আমাদের ত' দক্ষিণেশ্বরের বাগানখানা কেনা হয়েছে। ঘরটর ত সাজানই আছে। চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোক খাওয়াতে আর কত পড়্‌বে?

নী। তাই যদি তুমি বুঝ্‌তে পারবে তা হ'লে আর ভাবনা কি? বড় বড় লোকের ছেলেরা সব খেতে আস্‌বে তাদের কি ডাল ভাত খাওয়াব নাকি? হোটেল থেকেই ত'—

বলিতে বলিতে নীরেন্দ্র জিভ্‌ কামড়াইয়া সাবধান হইয়া গেল। বলিল—"ভাল ভাল সব খাবার কর্‌তে হ'বে ত। আর গানবাজনা

হ'বে। যে গাইতে আস্‌বে তাকে কিছু দিতে হবে। আর ঘরটর থাক্‌লেই বুঝি হ'ল। তা সাজাতে হবে না। আমায় যখন তারা নিমন্ত্রণ ক'রে, তখন দেখেছি এক একটা ভোজে চার পাঁচশ' টাকা খরচ হ'য়ে যায়। আর আমি মোটে একশ' টাকায় ভোজ দোব? আমার মানটা কোথায় থাক্‌বে বল দেখি?

সু। তা তারা না হয় বড়লোক। বেশী খরচ ক'রে। তুই না হয় কিছু কমই কর্‌লি।

নীরেন্দ্র অভিমানের সুরে বলিল "তা বুঝি হয়। তা হ'লে আমায় ছোট লোক বল্‌বে না? আমাকে আর তাদের সঙ্গে মিশ্‌তেই দেবে না। এমনি আমায় কত ঠাট্টা ক'রে। বলে 'নীরেন যে ভোজের আয়োজন কর্‌ছে একবার দেখে নিও। অমনটি আর কেউ পার্‌বে না।' যদি ওদের কাছে আমার মানই না থাক্‌বে, তবে ওদের সঙ্গে মেশাই বা কেন? কাল থেকে খালি গায়ে আমাদের সরকারের ছেলের সঙ্গে বেড়াতে বেরোব এখন।"

সু। আচ্ছা, তোর যখন সখ্‌ হয়েছে—এত ক'রে বল্‌ছিস্‌ তখন আর একশ' টাকা নে। দুশ' টাকায় খুব হ'য়ে যাবে। আমি সরকার মশাইকে বলে দিচ্ছি, সে ওরই মধ্যে বেশ গুছিয়ে ব্যবস্থা ক'রে দেবে।

নী। এ কি আর তোমার আলু পটল কেনা নাকি? সরকার মশাই তার কি বুঝ্‌বে? আমায় টাকা দাও, আমি নন্দীকে দিয়ে সব কিনিয়ে আনাব। নন্দী বড় চালাক ছেলে, জান মা। এই কল্‌কেতার বাজারের নাড়ীনক্ষত্র সব সে ঠিক্‌ জানে।

সু। আচ্ছা, তাই তুই কর্‌ বাপু। কিন্তু আর আমার কাছে টাকা নাই তা বলে' দিচ্ছি। দু'দিন বাদে যে আবার টাকা চাইবি তা হ'বে না।

নীরেন্দ্র এ কথায় কোন জবাব দিল না। দু'শ' টাকা লইয়া আনন্দিতচিত্তে চলিয়া গেল।

রাত্রিতে গঙ্গাধর বাবু পত্নীকে বলিলেন, "নীরেন না কি বাগানে গার্ডেন পার্টি দেবে?"

সু। তোমায় কে বল্‌লে?

গ। গোবিন্দ বল্‌ছিল। তুমি বুঝি নীরেনকে টাকা দিয়েছ?

সু। আহা ছেলেমানুষ, ওর কি একদিন সখ্ যায় না? দু'জন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে একদিন আমোদ আহ্লাদ ক'রে খাবে দাবে তাতে আর দোষ কি?

দোষ যে কি তাহা গঙ্গাধর বাবু বিলক্ষণ জানিতেন, কিন্তু সে কথা বলিবার উপায় নাই, কারণ তিনি নিজেও বহু গার্ডেন পার্টিতে মত্ত হইতেন, একথা সুশীলাসুন্দরী ভালরূপেই জানেন। কাজেই গার্ডেন পার্টি ব্যাপারটা যে কতদূর গড়াইতে পারে, নিজের দোষ ঢাকিবার জন্য গঙ্গাধর বাবু সে কথা চাপিয়া গেলেন। শুধু বলিলেন "এ রকম ক'রে টাকাগুলো বরবাদ কর্‌তে দিও না। আমি গোবিন্দকে বলেছি, সে যেন পার্টিতে উপস্থিত থাকে।"

সুশীলাসুন্দরী এ কথা শুনিয়া প্রীতা হইলেন। বলিলেন "তা যাক্ না, বুড়ো মানুষ, অনেক জানা শোনা আছে। নীরেনকে দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পার্‌বে।"

সেদিন রাত্রিতে খুব সমারোহেই গঙ্গাধর বাবুর নবক্রীত জাহ্নবী তীরবর্ত্তী উদ্যানে ভোজ সম্পন্ন হইয়া গেল। ঝাড় ও দেওয়ালগিরির আলোকসমুজ্জ্বল উদ্যান মধ্যস্থিত কক্ষটি সারেঙ্গের মধুর নিক্বণে, বাঁয়া তবলার

সঙ্গতে বাইজীর সঙ্গীতে ও তাহার পায়ের ঘুঙ্গুরের রবে মুখরিত হইয়া উঠিল। প্রমত্ত বান্ধবদের "বা—হ—বা" ধ্বনিতে ঘরখানি মাঝে মাঝে কাঁপিতে লাগিল। অভিভাবকরূপে প্রেরিত গোবিন্দ পেট ভরিয়া হোটেলের খানা খাইয়া তাহার উপর দু' এক গ্লাস্ হুইস্কি টানিয়া একেবারে যোড় হাতে নীরেন্দ্রের উদ্দেশে স্তব আরম্ভ করিল "আজ্ঞে এমনটি আর কেউ করতে পারে নি। খোকাবাবু যা কর্‌লেন—"

প্রমত্ত নীরেন্দ্র তাহার নাকের উপর এক ঘুঁসি মারিয়া বলিল "Damm your eyes. তোর খোকাবাবু কে রে শালা? ফের যদি 'খোকা' 'খোকা' কর্‌বি তা হ'লে তোকে মজা দেখিয়ে দোব।"

ঘুসির চোটে বৃদ্ধ গোবিন্দ একেবারে কাত হইয়া পড়িল। একজন ইয়ার চীৎকার করিয়া উঠিল "Bravo-Bravo একটা তান ধর বাবা। একটু চাঙ্গা হয়ে নিই।"

বিলাত হইতে সদ্য প্রত্যাগত এক বড়লোকের ব্যারিষ্টার জামাতা স্খলিত চরণে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অঙ্গভঙ্গী করিয়া বলিল "আমি কারও কথা শুন্‌ব না। আজ David Garrick প্লে কর্‌ব বাবা।"

ইয়ারেরা অট্টহাস্য করিয়া হাততালি দিতে লাগিল।

উদ্যানখানি যে রাস্তার উপর অবস্থিত তাহার অপর পার্শ্বে কুটীরে নীহার জাগিয়াছিল। তুলসী অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মাঝে একবার চীৎকারে জাগিয়া উঠিয়া নিদ্রাজড়িত স্বরে বলিয়াছিল "মাগো, মদ খেয়ে সব চেঁচামেচি কর্‌ছে।" তারপর আবার পাশ ফিরিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। নীহার তাহার কথায় কোন উত্তর দেয় নাই। কারণ তাহার মন তখন অন্য চিন্তায় নিমগ্ন ছিল।

বড় গরম বলিয়া রাস্তার দিকের জানালাটা খোলা ছিল। বাগানের ফটকের পাশের একটা চাঁপা গাছ হইতে সুমিষ্ট গন্ধ আসিতেছিল।

আর মাঝে মাঝে যখন বাইজি গাহিয়া উঠিতেছিল, তখন সে হিন্দীগানের অর্থ বুঝিতে না পারিলেও তাহার সুরটি বেশ মিষ্ট লাগিতেছিল। একবার উঠিয়া আসিয়া সে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দূরে স্থিত আলোকোজ্জল কক্ষটির প্রতি চাহিয়া দেখিয়াছিল। তার পর আবার শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কে জানে কেন, এই সমীরণবাহিত চম্পকের সৌরভ, সঙ্গীত-নিনাদ তাহার মনে কোন্ এক চিরতরে পরিত্যক্ত সুখের স্মৃতি জাগাইয়া দিয়াছিল। তাহার এখনকার দৈনন্দিন কার্য্যে, হাতাবেড়ী ধরার সঙ্গে সে জীবনের কোন সাদৃশ্য নাই। আবার সেই সীতাপতির-কথাই তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। সে প্রাণপণ শক্তিতে সে চিন্তা দমন করিয়া অন্য কথা ভাবিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহা পারিল না। ঘুমাইতে চেষ্টা করিল, ঘুমও আসিল না। নিশাবসানে চন্দ্র পশ্চিমে ঢলিয়া তাহার বিনিদ্রবদনে একবার কোমল পরশ দিয়া সরিয়া গেল। তাহার একটু পরেই পাখীরা ডাকিয়া উঠিল। নীহার শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"কিমপি হৃদয়ে সম্মোহো মে তদা বলবানভূৎ।"

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।

"একটা কথা রোজই আপনাকে বল্‌ব মনে করি কিন্তু সাহস করতে পারি না। আজ বলেই ফেল্‌ব।"

"কি কথা? বল না কেন?"

"আপনি আমাদের অনেক করেছেন। পূর্ব্বজন্মে আপনি বোধ হয় আমাদের কেউ ছিলেন, নইলে মানুষ মানুষের হঠাৎ এতটা ক'রে না। আমি হাঁসপাতালে অচৈতন্য হয়ে পড়ে, আমার নিকটতম আত্মীয়েরা—যাঁদের একটা মুখের কথায় আমার মত দশজন রোগীর তাঁদের বাড়ীতেই সেবার ব্যবস্থা হ'তে পারত তাঁরা আমায় হাঁসপাতালে পাঠালেন—কাকের মুখেও একটা খবর নিলেন না—আর আপনি আমায় কখনও দেখেন নি শোনেন নি; আমি কায়স্থ, আপনি ব্রাহ্মণ। আমায় হাঁসপাতাল থেকে এনে নিজের বাড়ীতে রেখে প্রাণে বাঁচিয়েছেন। ভাইটার জেল হয়েছিল, আপনার স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়ে তাকে খালাস করবার জন্য আপীল করেছিলেন। আপীলে কোন ফল হ'ল না। আমার মা নিরাভরণা হলেন। ছোট বোন্‌টি শ্বশুরালয় হ'তে তাড়িত—আপনি তাকে নিজের মেয়ের মত নিজের বাড়ীতে রেখেছেন। আপনার এত দয়া, তাই আমি আপনাকে বল্‌তে সাহস পাচ্ছি না—পাছে আমায়

অকৃতজ্ঞ মনে করেন। কিন্তু আপনি ব্রাহ্মণ আপনার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি, আমি অকৃতজ্ঞ নই।"

এই বলিয়া রঘুনাথ নীলমাধবের চরণ স্পর্শ করিল। নীলমাধব ত্রস্তে পা সরাইয়া লইয়া বলিল "থাক্, থাক্, ও কি কর? কি বল্‌বে বল।"

"আমাদের ঋণ আর বাড়াবেন না। এমনই যে উপকার করেছেন, বোধ হয় একজন্মে এ ঋণের শোধ হয় না। আমি ভাল হয়েছি, আর লেখাপড়া ক'রে কি করব? আমার মত গরীবের আর লেখাপড়া কেন? যাদের সহায় মনে করে, মুরুব্বি ভেবে লেখাপড়া করছিলুম তাদের চিন্‌তে আর বাকি নেই। আমি আর লেখাপড়া করব না। ভাইটার কোন উদ্দেশ পেলুম না। সে বোধ হয় লজ্জায় আমায় মুখ দেখাবে না ব'লে দেশত্যাগী হয়েছে। দুটো বোন্—তা একটির ভাবনা নেই—সুখেই আছে। স্বামীপুত্র নিয়ে সুখেই থাক্। আর একটি—তা তার ছেলে পুলে নেই—আমি তাঁর খাওয়া পরার ভার নিতে পারব। আমায় অনুমতি দিন। আমি মালতীকে নিয়ে এখান থেকে বিদায় হই।"

নী। সে কি কথা? কোথা যাবে তুমি? অমন পাগলের মত কথা ব'ল না। কোথায় এখন চাকরী বাকরী পাবে? আর পেলেই বা তার মাইনে কত হ'বে? এ বছরটা গেছে। আর একটা বছর পড়। বি, এ টা পাশ করলে অনেক বিষয়ে সুবিধা হ'বে।

র। না, আপনি আমাদের অনেক করেছেন, মা বাপেও এমন ক'রে না। কিন্তু, কিন্তু আমি আর থাক্‌তে পার্‌ব না। আমায় মাপ করবেন।

নী। কেন? থাক্‌তে তোমার বাধা কিসের?

র। আমায় ক্ষমা করুন। কাল আপনি মার সঙ্গে যে কথা

কচ্ছিলেন আমি তা আড়াল থেকে শুনেছি। আপিসের বাবুরা আপনার বিরুদ্ধে লেগে আপনার চাকরী ঘোচাবার চেষ্টা কচ্ছে। একটা মিথ্যা অপবাদে আপনি সাস্পেণ্ড হয়েছেন। আপনি ও মা একবেলা খেয়ে আমাদের খাওয়াবেন বলেছেন। আপনি দেবতা, আপনার সঙ্গে এক আসনে বস্‌তে পেলেও স্বর্গ লাভ। কিন্তু—আমি এ অবস্থায় আর থাক্‌তে পার্‌ব না। আমি কল্‌কেতায় বাসা ঠিক্ করে এসেছি। ট্রামের কণ্ডাক্‌টারের একটা চাকরীও আজ যোগাড় করে এলুম। আমায় ও মালতীকে আজ ছেড়ে দিতেই হবে।

নীলমাধব বিবর্ণমুখে বসিয়া রহিল। তাহার ঠোঁট কি যেন বলিবার জন্য কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু কথা ফুটিল না। রঘুনাথ বলিল "তবে আমি যাই, গাড়ী ডেকে আনি। আপনি মাকে বলুন। তাঁকে বল্‌তে আমার সাহস হয় না।" এই বলিয়া রঘুনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল।

নীলমাধব রঘুনাথের হাত ধরিল। বলিল "যেও না। ব'সো। আমি কে তা জান? আমি দেবতা? আমি চোর। আমি তোমাদের সর্ব্বনাশ করেছি, তোমাদের এই অবস্থায় ফেলেছি। অনন্তকাল নরক-বাসেও আমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'বে না? আমি দেবতা? আমি কি করেছি তা জান?"

রঘুনাথ নীলমাধবের উদ্‌ভ্রান্ত ভাব দেখিয়া ভীত হইল। নীলমাধব বলিল "তোমার ভগ্নীপতি গঙ্গাধর বাবু আমাদের আপিসের বড়বাবু ছিলেন। তাঁর অনুগ্রহেই আমি আপিসে চাকরী পাই। কিন্তু এই কৃতজ্ঞতার যে মূল্য তিনি আদায় করেছেন তা মনে কর্‌তে আমার শরীর শিউরে উঠ্‌ছে। তোমার বাপ যেদিন মারা গেলেন আমি সেদিন গঙ্গাধর বাবুর সঙ্গে জনাইয়ে যাই। আপিস্ থেকে তিনি আমায় ডেকে নিয়ে যান। রাত্রিতে তোমার বাবা মারা গেলেন। তোমরা শবদাহ

কর্‌তে শ্মশানে চ'লে গেলে। গঙ্গাধর বাবু তখন কি কর্‌লেন জান? আমাকে বৈঠকখানায় বসিয়ে আলো নিবিয়ে দিয়ে গেলেন। বল্লেন "তুমি বোস। আমি আস্‌ছি।" অনেকক্ষণ কেটে গেল। সন্দেহে আমার মন পূর্ণ হ'য়ে গেল। বাড়ীর ভিতর মেয়েদের কান্নার স্বর শুনতে পাচ্ছিলুম। ঘড়িতে সাড়ে দশটা, এগারটা, সাড়ে এগারটা বেজে গেল। আমি আর থাক্‌তে পারলুম না। উঠে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় পা টিপে' টিপে' গঙ্গাধর বাবু একটা পুঁটুলি হাতে করে এলেন। আমার হাতে পুঁটুলিটা দিয়ে বল্‌লেন "নীলমাধব, এইটে নাও। আজ রাত্রিতে মুদীর দোকানে শুয়ে থাকগে' যাও। কাল সকালে উঠে এইটে নিয়ে বাড়ী চ'লে যেও। খবরদার, কাউকে কোন কথা বলো না। যদি কারও সঙ্গে দেখা হয়, যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে ব'লো যে তুমি কল্‌কেতার ডাক্তারের সঙ্গে এসেছিলে। পুঁটুলিতে ওষুধ পত্র আছে।' আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। খানিকক্ষণ চুপ্‌ করে থেকে কি যেন বল্‌তে যাচ্ছিলুম, গঙ্গাধর বাবু আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বল্‌লেন "কথা ক'য়ো না। আমি তোমার অনেক করেছি। তুমি আমার এই কাজটি ক'রো।" এই বলে ঠেলে আমায় রাস্তায় বার ক'রে দিলেন। আমার যে কি মতিচ্ছন্ন হয়েছিল তা বল্‌তে পারি না। সয়তান আমার ঘাড়ে চেপেছিল, আমি একেবার মুদীর দোকানে গিয়ে পড়্‌লুম। সেখানে পুঁটুলিটা রেখে রাতের মত শুয়ে রইলুম। কিন্তু আমার চোখে কি ঘুম আসে? অতবড় একটা পাপ করে এসেছি—ভগবান আমায় তখন থেকেই শাস্তি দিতে আরম্ভ কর্‌লেন। সমস্ত রাত শয্যাকণ্টকির মত ছট্‌ ফট্‌ কর্‌লুম। ভোরে উঠেই তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে চলে এলুম। পাছে মুদী আমায় ভাল করে দেখে, পাছে দেখে পরে চিনিয়ে দেয়, এই ভয়ে তার দিকে ফিরেও চাইলুম না। রেলগাড়ীতে উঠে দেখি সর্ব্বনাশ!

আমার হিসাবের খাতাখানা ফেলে এসেছি। তাতে আমার নাম, ঠিকানা লেখা ছিল। ক্ষণে ক্ষণে মনে হ'তে লাগ্‌ল, এতক্ষণে হয়ত চুরি ধরা পড়েছে, এতক্ষণে হয়ত পুলিশের লোক মুদীর দোকানে খোঁজ করে খাতাখানা পেয়েছে—আমায় ধর্‌তে আস্‌ছে। বাড়ীতে ফির্‌ব না অন্য কোথাও যাব তাই ভাব্‌তে লাগ্‌লুম। যদি ধরা পড়ি, গঙ্গাধর বাবু যদি নিজেকে বাঁচাতে আমাকেই চোর ব'লে ধরিয়ে দেন—ওঃ—কত আর বল্‌ব—আগুনের শিখার মত এই সব চিন্তা মাথার ভেতর দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলছিল। আমি একেবারে গঙ্গাধর বাবুর বাড়ীতে গেলুম। তখনও তিনি আসেন নি। আমি আহার নিদ্রাত্যাগ করে তাঁর বাড়ীতে বসে রইলুম। সেই দিনই তিনি সপরিবারে এলেন। বৈঠকখানার দরজা বন্ধ ক'রে আমার সামনে পুঁটুলিটা খুল্‌লেন। তাতে একতাড়া নোট ও অনেক গহনা ছিল। আমায় দেখিয়ে বল্‌লেন 'নীলমাধব, আজ যাও। তোমার উচিত ভাগ আমি দোব।' তখন আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম। বল্‌লুম 'না, না। আমার কিছু চাই নি। আপনার কথাতে আমি এনেছি, আপনিই নিন।' গঙ্গাধর বাবু হাস্‌লেন। বল্‌লেন 'আচ্ছা যাও, খেয়ে দেয়ে ঠাণ্ডা হওগে যাও।' পরে বিবেচনা করা যাবে। আমি চলে এলুম। সেই থেকে—উঃ—কি বল্‌ব তোমায়—আমার সুখ শান্তি সব চলে গেল। পরিবারকে একথা বল্‌তে পারি নি—পাছে সে আমায় ঘৃণা করে। দিনের পর দিন কেটে গেল। যাতনা যেন একটু কম্‌ল। কিন্তু যেদিন শুন্‌লুম, তোমার বোনের গহনা চুরি করে এনেছিলুম, তার জন্যে তোমাদের সঙ্গে তার শ্বশুর সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছে ; যখন বুঝ্‌লুম গঙ্গাধর বাবু তোমায় যে আশ্রয় দিয়েছে সে লোকদেখান, চাকরবাকরও তোমার চেয়ে স্বচ্ছন্দে আছে, তখন আবার মনে আগুন জ্বলে উঠ্‌ল। তারপর তোমার হাসপাতালে যান—উমা-

নাথের জেল—আমার সঙ্গে মালতীর সেই মাকে শেষ দেখা দেখ্‌তে যাওয়া। আমার একরাত্রির পাপের বীজে এত বড় গাছ জন্মে গেল। মালতীকে তার শ্বশুরের অমতে লুকিয়ে মাকে দেখ্‌তে নিয়ে গিয়ে তার শ্বশুরের আশ্রয় ঘোচালুম। শুধু আশ্রয় ঘোচান নয়, যখন হৃদয়বাবু বল্‌লেন 'কোথায় কার সঙ্গে রাত্রিবাস করে এসে হাজির হয়েছ, তার সঙ্গেই যাও।' অভিমানিনী মা আমার গাড়ীতে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়্‌লেন আমি পাগলের মত হয়ে গেলুম। তাকে এখানে আন্‌লুম। তোমায় এখানে আন্‌লুম। অনেক চেষ্টা করেও উমানাথের কোন খোঁজ পেলুম না। কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লুম তোমাদের যে সর্ব্বনাশ করেছি প্রাণ দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব। আমার সে সংকল্প তুমি পূর্ণ কর্‌তে দেবে না? ফাঁকি দিয়ে পালাবে? আমায় আবার সেই রকম যন্ত্রণায় পাগল করে তুল্‌বে? আমি বেঁচে থাকতে তা হ'বে না। আমায় ধরিয়ে দাও—চোর বলে ধরিয়ে দাও। আমি জেলে যাই। আমার পরিবার পথে পথে ভিক্ষা করুক। আমি শান্তি পাই। তুমি তারপর যা খুসী ক'র।"

উন্মাদের মত নীলমাধব এই কথাগুলি এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিয়া হাঁফাইতে লাগিল। রঘুনাথ নিজের কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে কি সত্যই এসব কথা শুনিতেছে? সত্য বৈ কি? তাই তাহার পিতার প্রেতাত্মার গল্প প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল—তাই গহনার বাক্সর চাবি পাওয়া যায় নাই—তাই গহনার বাক্সে গহনা পাওয়া যায় নাই। অতীত ঘটনাগুলি কুজ্‌ঝটিকার অপগমে নৈসর্গিক দৃশ্যের ন্যায় তাহার মনে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সকল রহস্য অপসৃত হইয়া গেল।

কিন্তু এখন তাহার কর্ত্তব্য কি তাহা সে স্থির করিতে পারিল না। শুধু এইটুকু বুঝিল যে আজ তাহার এ স্থানত্যাগ করা হইবে না। নীলমাধব আবার বলিয়া উঠিল "কথা কচ্ছনা যে, কি করবে আমার বল?"

র। আপনি যদি কিছু করে থাকেন, তার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। তবে আজ থাক্। আমি কাজে যোগ দিই। তারপর যা' হয় একটা করব।

নীলমাধব ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল "তুমি ট্রামের কণ্ডাক্টার হবে? তা আমি সহ্য করতে পারব না। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ আমার মন বলবে আমার পাপে আজ তুমি শাস্তি পাচ্ছ; মালতী শাস্তি পাচ্ছে। আমার কথা যদি না শোন, আমায় যদি প্রায়শ্চিত্ত করতে না দাও, তাহলে আমি মরব। আমি ব্রাহ্মণ, পৈতে ছুঁয়ে বলছি, আমি গলায় দড়ি দোব। তুমি কোথাও যেতে পাবে না। আমি যতদিন পারি, মোট বয়ে পারি, যেমন করে পারি, নিজে না খেয়ে তোমাদের খাওয়াব। আমি ম'লে তোমরা যেখানে খুসী যেও, যা ইচ্ছে ক'রো। আমি ব্রাহ্মণ, তোমায় জোড় হাত কচ্ছি। বল আমার কথা রাখবে, নইলে আমি মাথা খুঁড়ে মরব।"

রঘুনাথের অন্তর গলিয়া গেল। বলিল "আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন। আপনি না বললে আমি কোথাও যাব না। আর ও কাজও ছেড়ে দোব। কিন্তু চাকরী আমায় করতেই হবে। আপনার এ রকম অবস্থায় আমি ব'সে ব'সে খেতে পারব না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"ন সো সব্বেসু টানেসু পুরিসো হোতি পণ্ডিতো।
ইত্থি পি পণ্ডিতা হোতি তত্থ তত্থ বিচক্খণা॥"

ধর্ম্মপাল।

দুপুর বেলায় তুলসী আসিয়া মাধুরী ও মালতীকে লইয়া নীহারের বাড়ী গেল। আগেই তুলসীর মুখে মাধুরী ও মালতী নীহারের কথা শুনিয়াছিল। তুলসী নীহারকেও মাধুরী ও মালতীর কথা বলিয়াছিল। আজ তাই দেখা করিবার জন্য মাধুরী ও মালতী নীহারের বাড়ী গেল।

নীহার ইচ্ছা: করিলে এতদিন গ্রামের অনেকের সহিত আলাপ করিতে পারিত, কিন্তু তাহার যেরূপ মনের অবস্থা তাহাতে সে একাকিনী থাকিতেই ভালবাসিত। এটা বুঝিত না যে পাঁচজনের সঙ্গে মিশিলে তাহার মনটা অনেকটা বিক্ষিপ্ত হইয়া শান্তিলাভ করিতে পারিত। কিন্তু মিশিবার একটা ভয়ও ছিল—পল্লীগ্রামে তাহার পূর্ব্বজীবন-কথা প্রচারিত হইলে বিধর্ম্মীর ন্যায় তাহার স্পর্শও হয়ত সকলে ঘৃণা করিবে। সেটা নীহার সহ্য করিতে পারিত না।

নীহার মাধুরী ও মালতীকে বসিবার আসন দিল। তুলসীও অদূরে বসিল।

মালতী বলিল "অনেকদিন থেকে আস্‌ব আস্‌ব মনে কচ্ছি তা আসা আর ঘটে উঠে নি।"

নীহার একটু হাসিয়া বলিল "আমারও ইচ্ছা আপনাদের সঙ্গে

আলাপ করি, কিন্তু কি মনে করেন ভেবে সাহস ক'রে উঠ্‌তে পারি নি।"

মাধুরী। কি আর মনে করব? আপনি কতদিন এসেছেন?

এ প্রশ্নের উত্তর মাধুরী তুলসীর নিকটই শুনিয়াছিল। তবু আর একবার জিজ্ঞাসা করিল।

নীহার উত্তর দিল। তার পর ঘর-সংসারের কত কথাই হইতে লাগিল।

সহসা দরজায় কে কড়া নাড়িল। তুলসী উঠিয়া দেখিতে গেল। ক্ষণপরে আসিয়া বলিল "বাবু এসেছেন।"

এমন সময় গদাধরের আসিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহার অতর্কিত আবির্ভাবে নীহার বিব্রত হইয়া পড়িল। মাধুরী ও মালতী উঠিল। বলিল—"আজ যাই। আর একদিন আস্‌ব।"

গদাধর একটু সরিয়া দাঁড়াইল। মাধুরী, মালতী ও তুলসী চলিয়া গেলে সে বাড়ীতে প্রবেশ করিল। নীহারের সামনে গিয়া বলিল— "একটা বিশেষ কাজে আজ এখনই আসতে হ'ল।" এই বলিয়া এক-খানা ষ্ট্যাম্প কাগজ বাহির করিয়া বলিল—"এইখানে একটা সই করে দাও ত।" এই বলিয়া আঙ্গুল দিয়া একটা জায়গা দেখাইয়া দিল।

নীহার বলিল—"কিসের কাগজ?"

গদাধর। ও বিশেষ কিছু নয়। আমার দেশে যৎসামান্য সম্পত্তি আছে তাই তোমার নামে লেখাপড়া করে দোব।

নীহার। তাতে আমার সই করতে হবে কেন? সে ত আপনি কর্‌লেই হবে।

গদাধর মাথা চুলকাইতে লাগিল। বলিল—"ঠিক তা নয়। আরও একটা দরকার আছে। আমার শ্বশুর মহাশয়ের কিছু সম্পত্তির সন্ধান

পেয়েছি। সেইটে উদ্ধারের চেষ্টা করব। ধরতে গেলে তুমিই তাঁর ওয়ারিশ। তাই উকীল বলেছেন তোমার সই নিতে।"

এ কথাটাও নীহার বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল—"তা কাগজখানা লিখিয়ে আনুন না। পড়ে দেখে সই ক'রে দোব।"

গ। সে আর তুমি দেখে কি করবে। আর তাতে দেরী হ'য়ে যাবে। আজ সই না করলেই নয়। তাই আমি আফিস কামাই করে ছুটে এলুম। নাও, চট্ করে একটা সই করে দাও। আমি ষ্টিমারে করে এখনই কলকেতায় যাব।

নীহার বলিল—"না দেখে শুনে সাদা কাগজে সই করাটা কি ভাল হবে?"

গদাধর রাগিয়া গেল। বলিল—"তুমি কি আমায় বিশ্বাস কর না? সই কর বলছি।" বলিয়া আবার নরম সুরে বলিল "সে উকীলরা ইংরেজীতে লিখ্বে, তুমি তার বুঝবেই বা কি?"

নী। ইংরেজীতে লিখলেও আমি বুঝ্তে পারব।

গ। তা হ'লে তুমি সই করবে না?

নীহারের মন একটা আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাই সে দৃঢ় স্বরে উত্তর করিল "না।"

গদাধর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "বটে? আচ্ছা তোমায় মজা দেখাচ্ছি।" এই বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

গদাধরের ক্রোধ দেখিয়া নীহারের সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইল। সে প্রতিজ্ঞা করিল, না দেখিয়া কখনও কোন কাগজে সই করিবে না।

গদাধরও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল নীহার সহজেই সই করিয়া দিবে। বাঙ্গালীর সংসারে সাধারণতঃ অশিক্ষিতা

যে সকল রমণীর সহিত তাহার পরিচয় তাহাদেরই মাপকাটিতে সে নীহারের বিচার করিয়াছিল। তা না হইলে উকীলের দুর্বোধ ইংরাজীর প্রসঙ্গ তুলিয়া সে নীহারকে ভয় দেখাইতে সাহস করিত না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"অথার্দ্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে"

রঘুবংশম্।

টাকার বড়ই টানাটানি। নীরেন্দ্র গোবিন্দকে বলিল—"শুনেছি হ্যাণ্ডনোটে নাকি টাকা ধার দেয়? আমায় দু' একটা তেমন দালাল যোগাড় করে দিতে পার?"

ঘুসি খাইয়াও গোবিন্দ তাহা বেমালুম হজম করিয়া ফেলিয়াছিল। ভাবিয়াছিল "গঙ্গাধর আর কত দিন? এই বেলা থেকে ছেলেটাকে হাত কর্‌তে পার্‌লে ভবিষ্যতে আর ভাবনা থাক্‌বে না।" তাই সাগ্রহে বলিল "তার আর ভাবনা কি বাবু। আমি আজই তা যোগাড় করে দিতে পারি। কিন্তু তার চেয়েও একটা সহজ উপায় আছে। তাতে কিছু বিপদের ভয় অবশ্য আছে তবে বুঝে চল্‌তে পার্‌লে আমাদের কোন আশঙ্কা নেই। যদি রাজী হন ত বলি।"

নীরেন্দ্র দিন রাত টাকার স্বপ্নই দেখিতেছিল। বলিল "কি? কি? বেশ ত, কোন রকমে কিছু টাকা এলেই ভাল।"

গোবিন্দ। দেখুন। একজন লোক রূপো পেলে টাকা তৈরি করে দিতে পারে। যত টাকার রূপো কিনবেন তার ডবল টাকা হবে। প্রথমে অল্প-পুঁজি হলেও ক্ষতি নেই। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেড়ে যাবে। তার হাতে পয়সা নেই বলেই সে আমাদের সাহায্য চাচ্ছে।

নীরেন্দ্র। সে কি করে ?

গো। সে সামান্য চাকরী করে।

নী। সে নিজে তা হ'লে, এতদিন বড়লোক হয়ে যেত।

গো। সে টাকা চালাবে কি ক'রে বাবু ? আপনি যে রকম দশ বিশ হাজার চালাতে পারবেন সে কি তা পারবে ? দশটাকা বিশটাকা চালাতে গেলেই ধরা প'ড়ে জেলে যাবে।

নী। আমিই বা চালাব কি ক'রে ?

গো। সে ভাবনা আপনাকে করুতে হ'বে না। আমিই সব ঠিক করে দোব। যদি বলেন ত সে লোকটার সঙ্গে আপনার দেখা করিয়ে দিই।

নী। কোথায় ? সে কি এখানে আস্‌বে ?

গো। এখানে কি সুবিধে হবে ? যদি কর্ত্তাবাবুর সামনে পড়ে কি বাড়ীর আর দশজনে দেখে। এ সব কাজ যত কম জানাজানি হয় ততই ভাল।

নী। কোথায় তবে যেতে বল ?

গো। কেন ? দক্ষিণেশ্বরের বাগানখানাই ত রয়েছে। আপনি আজ সেখানে চলুন। রাত্রিতে আমি আপনার সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দোব। কিছু রূপো যদি সঙ্গে নিয়ে যান, সে তাহ'লে টাকা করে দেখিয়েও দিতে পারে।

নী। আমি কোথায় রূপো কিন্‌তে যাব ?

গোবিন্দও তাহাই চাহিতেছিল। তা না হইলে আর তাহার লাভ কি ? বলিল—"আপনি কিন্‌তে যাবেন কেন ? আমায় টাকা দিন। আমিই কিনে নিয়ে যাব।"

নী। আমার কাছে ত বেশী টাকা নেই। গোটা পঞ্চাশেক টাকা হবে।

গো। বেশ ত, তাই দিন। প্রথমে একদিন দেখুনই না কেন, লোকটা কি করে?

নীরেন্দ্র পঞ্চাশটি টাকা আনিয়া দিল। গোবিন্দ বলিল—"আপনি তা হ'লে বিকেলেই যাবেন। কাউকে সঙ্গে নেবেন না। আমি আপনার সঙ্গে যাব না। লোকে সন্দেহ করতে পারে। আমি বড়বাজার থেকে রূপো কিনে সন্ধ্যের ষ্টীমারে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে সব ঠিকঠাক ক'রে লোকটাকে নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব।"

নীরেন্দ্র বলিল—"আচ্ছা।"

* * * *

রাত্রি প্রায় নয়টা। উৎকণ্ঠিতচিত্তে নীরেন্দ্র বাগানের বারান্দায় একখানা ঈজি চেয়ারে বসিয়া গোবিন্দের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। বারান্দায় আলোক ছিল না। ঘরের ভিতর আলোক জ্বলিতেছিল। তাহার রশ্মি বারান্দার এক পার্শ্বে আসিয়া পড়িয়াছিল। নীরেন্দ্রের আহার হইয়া গিয়াছিল। ভৃত্য ও মালীদের শয়ন করিতে যাইবার আদেশ দিয়া সে উৎসুকচিত্তে বসিয়াছিল। তাহার অল্প বয়স—ইহার আগে কখনও দুঃসাহসিক কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় নাই। একদিকে এই অভিনব ব্যাপারে তাহার যেমন কৌতূহল জাগিতেছিল, অপরদিকে তেমনি ভয়েও হৃদয় এক একবার কাঁপিয়া উঠিতেছিল। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়াও যখন কেহ আসিল না তখন নীরেন্দ্রের তন্দ্রা আসিল। বাগানের গোলাপ ফুলগুলির সুমিষ্ট গন্ধ আঘ্রাণ করিতে করিতে তন্দ্রাঘোরে সে চেয়ারের উপরই ঘুমাইয়া পড়িল।

"বাবু।" ক্ষীণস্বরে নীরেন্দ্রের গা ঠেলিয়া কে ডাকিল "বাবু।"

নীরেন্দ্র চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। দেখিল গোবিন্দ। গোবিন্দ বলিল—"বাবু, এনেছি।"

নী। কই?

গো। ঐ যে। এস এদিকে।

অন্ধকারের মধ্যে এক দীর্ঘাকৃতি ছায়ামূর্ত্তি অগ্রসর হইয়া আসিল। সেদিন আকাশে চাঁদ ছিল না। লোকটা বারান্দার যে অংশ অন্ধকার সেইখানেই আসিয়া দাঁড়াইল।

নীরেন্দ্রের বুক কাঁপিয়া উঠিল। বলিল—"সব ঠিক হয়েছে।"

লোকটি বলিল—"সব ঠিক। এখন আপনি গেলেই হয়।"

নী। কোথায় যাব? এখানে হবে না?

লোক। আজ্ঞে, এখানে কি হয়? যন্ত্রপাতির কাজ।

নী। কতদূর যেতে হ'বে।

লোক। এই যে সামনেই কলবাড়ীতে।

"চল।" বলিয়া নীরেন্দ্র উঠিল। লোকটি আগে আগে, তারপর গোবিন্দ, পিছনে নীরেন্দ্র চলিতে লাগিল।

বাগান পার হইয়া রাস্তা অতিক্রম করিয়া লোকটি একটি মৃণ্ময় গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইল। চাবি বাহির করিয়া দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিল। গোবিন্দ ও নীরেন্দ্র তাহার পশ্চাতে প্রবেশ করিলে সে কবাটে খিল দিয়া অগ্রসর হইল। দুই পাশে দু'খানা ঘর। তাহার মধ্য দিয়া সকলে অগ্রসর হইয়া গেল।

অনেকটা অগ্রসর হইয়া লোকটি বলিল "সাবধানে আস্‌বেন। হোঁচট্ খাবেন না।" কিন্তু সতর্ক হইয়াও নীরেন্দ্র একটা প্রকাণ্ড লোহার চাকার উপর অন্ধকারে পড়িয়া গেল। লোকটি তাহাকে টানিয়া তুলিল। বলিল "আমার হাত ধ'রে চলুন।"

চারদিকে ভাঙ্গা কাঠ, মাটির গামলা, লোহার টুকরা প্রভৃতি বিক্ষিপ্ত। একটা উৎকট দুর্গন্ধও নীরেন্দ্রের নাসিকায় প্রবেশ করিতেছিল। বার বার তাহার পদ স্খলিত হইতে লাগিল। শেষে লোকটির হাত ধরিয়া এক ছোট চালাঘরের সামনে উপস্থিত হইল। লোকটি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি প্রদীপ জ্বালিল।

গোবিন্দ ও নীরেন্দ্র সেই ঘরে প্রবেশ করিলে, লোকটা মাটির উপর হইতে কতকগুলি আবর্জ্জনা, কাঠের টুকরা প্রভৃতি সরাইয়া ফেলিল। তাহার নীচে দু'খানা চওড়া তক্তা ছিল। তাহাও তুলিয়া ফেলিল। তক্তার নীচে হাপর, মুচি, কয়লার ঝুড়ি, প্রভৃতি ছিল। যন্ত্রপাতি গোছাইয়া লোকটি কয়লা ধরাইয়া আগুন জ্বালিল। হাপরের সাহায্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই আগুন বেশ ধরিয়া উঠিল। তখন লোকটি বলিল "দিন।"

গোবিন্দ রূপার বাট বাহির করিয়া দিল। তাহার পর লোকটি যন্ত্রপাতি লইয়া মেকিটাকা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। নীরেন্দ্র একদৃষ্টিতে লোকটির কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে লোকটি হাপর ছাড়িয়া আগুন নিবাইয়া একটা জলে ভরা মাটির গামলার ভিতর গরম কতকগুলি ধাতুখণ্ড ফেলিল। জল সোঁ সোঁ করিয়া উঠিল। তার পর সেই জলে হাত ডুবাইয়া কতকগুলি টাকা বাহির করিয়া নীরেন্দ্রকে দিতে গেল। বলিল "এই নিন।" কিন্তু তাহার মুখের কথা শেষ না হইতেই ভয়ে তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। বলিল—"এ্যাঁ—এ কি? তুমি—তুমি এখানে কেন?"

নীরেন্দ্র চমকিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিল। কম্পিত দীপালোকে দেখিল এক পরমসুন্দরী যুবতী। বদন অবগুণ্ঠনাবৃত নহে, মাথার উপর দিয়া সাড়ীর আঁচল ঘুরিয়া গিয়াছে। তাহার নিম্ন দিয়া দু একটি

কুঞ্চিত অলকগুচ্ছ গণ্ডের পার্শ্ব দিয়া নামিয়া আসিয়াছে। বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে সকলের দিকে একবার চাহিয়া যুবতী দুই এক পা পিছাইয়া গেল।

লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে নীরেন্দ্র ও গোবিন্দ উঠিল। লোকটি বলিল "যাও ঘরে যাও। আমি যাচ্ছি।"

যুবতী সরিয়া গেল। লোকটি প্রদীপ নিবাইয়া বলিল "চলুন আপনাদের বার করে দিয়ে আসি। এই টাকা কটা নিন্।

নীরেন্দ্র টাকা লইল। পরে অতি ক্লেশে আবার সমস্ত রাস্তা পার হইয়া দ্বারের নিকট পৌঁছিল। খিল খুলিয়া লোকটি নীরেন্দ্র ও গোবিন্দকে বাহির করিয়া দিল। বলিল—"আপনারা যান্। আমি পরে দেখা কর্‌ব।" গোবিন্দ ও নীরেন্দ্র রাস্তা পার হইয়া বাগানে প্রবেশ করিল।

লোকটি তখন আবার দ্বার বন্ধ করিয়া পার্শ্বের এক কক্ষে গেল। সে কক্ষে নীহার দাঁড়াইয়াছিল।

সেদিন তুলসী আসে নাই। তাহার জ্বর হইয়াছিল তাই তাহার মা-ও আসিতে পারে নাই। গদাধর নীহারকে বলিল—"তুমি ওখানে গিয়েছিলে যে? তোমার কি লজ্জা সরম একেবারে নেই?"

নীহার স্থির কণ্ঠে বলিল—"আপনি ওখানে কি কচ্ছিলেন?"

গ। আমি যাই করি না কেন সে খোঁজে তোমার দরকার কি? তোমায় যা জিজ্ঞাসা কচ্ছি তারই উত্তর দাও।

নী। দরকার আমার আছে। আমি সব দেখেছি—সব বুঝেছি। আপনি মেকি টাকা তৈরি কচ্ছিলেন?

গ। তা বেশ কচ্ছিলুম। তুমি ওখানে কেন গিয়েছিলে বল ত?

নী। আমি দেখ্‌তে গিয়েছিলুম আপনি এত রাত্রিতে কি কচ্ছিলেন।

গ। বটে? খুব সাহস ত তোমার। যখন দেখেই ফেলেছ তখন আর লুকিয়ে ফল কি? এখন সোজাপথে এস।

এই বলিয়া একটা বাক্সের ভিতর হইতে গদাধর আবার সেই ষ্ট্যাম্প-কাগজখানি বাহির করিল। বলিল "নাও, সই কর।"

নী। আমি সই কর্‌ব না।

গ। তোর ঘাড় কর্‌বে। কিছু বলিনি ব'লে তোর বড় বাড় বেড়েছে, নয়? সই কর্‌ বল্‌ছি।

নী। কখনও কর্‌ব না।

গদাধর বলিল—"বটে।" বলিয়া সজোরে নীহারের হাত চাপিয়া ধরিল।

নীহার ঝাঁকি দিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—"আমার অঙ্গস্পর্শ কর্‌বেন না।"

গদাধর বলিল "যদি ভাল চাস্‌ ত সই কর্‌ বলছি, নইলে তোর সব ভিট্‌কিলিমি বার করে দোব।

এই বলিয়া গদাধর আবার নীহারের হাত চাপিয়া ধরিল। নীহার আবার ঝাঁকি দিয়া হাত ছাড়াইতে গেল, কিন্তু পারিল না। গদাধর বজ্রমুষ্টিতে তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়া বলিল "সই কর্‌বি?"

নীহার তখনও বলিল "না।"

গদাধর নীহারের গলা টিপিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই পিছন হইতে কে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। গদাধর পিছন ফিরিতে গেল। শুনিল পরিচিত কণ্ঠে কে বলিল "শ্যামচাঁদ—তোমার লীলা ফুরিয়েছে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"For there is neither East nor West,
border nor breed nor birth,
When two strong men come face to face,
though they come from the ends of the earth."

—*Rudyard Kipling.*

গদাধর প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তখন যে তাহাকে ধরিয়াছিল, সে নিজেই তাহাকে ছাড়িয়া দিল। তখন গদাধর ও আগন্তুক সামনা-সামনি হইয়া দাঁড়াইল। গদাধর চিনিল—উমানাথ।

উমানাথ নীহারকে সম্বোধন করিয়া বলিল "মা—ওঠ। তোমার কোন ভয় নেই। এ তোমায় প্রতারণা করেছে। আমার চোখে পর্য্যন্ত ধূলো দিয়েছিল। এ তোমার স্বামী নয়। এর নামও গদাধর নয়। এ একজন জেলের কয়েদী, নাম শ্যামচাঁদ। তোমার এক আত্মীয় জেল হাঁসপাতালে মরবার সময় একে টাকার সন্ধান বলে যান। তোমার অনুসন্ধান করতে বলেন। তোমায় ঠকিয়ে এ সেই টাকা পাবার লোভে তোমার স্বামী সেজে এসে দাঁড়িয়েছে। তোমার বিবাহই হয় নি। বিবাহ দিতে তোমার মামাত ভাই পীতাম্বর তোমায় নৌকা

করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে নৌকাডুবি হয়। বিবাহের পূর্ব্বেই এ ঘটনা। যার সঙ্গে তোমার বিবাহের কথা হয়, সেও নৌকাডুবি হয়ে মারা যায়। এ পাজী তার নাম ক'রে তোমায় ঠকিয়েছে। আমিও প্রথমে মনে করেছিলুম, কয়েদী হ'লেও সত্যই এ তোমার স্বামী। তাই এতদিন কেবল সন্ধানই কর্‌ছিলুম। আমি এতদিনে সব প্রমাণ সংগ্রহ করেছি। তুমি ওঠ মা। আমি এ পাজীর বিধান করছি!"

শ্যামচাঁদ বুঝিল, তাহার ঘোরতর শত্রু আজ সম্মুখে। এ জীবিত থাকিলে তাহার আর রক্ষা নাই। সে একবার স্থিরদৃষ্টিতে উমানাথের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। পরে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

উমানাথ এজন্য প্রস্তুত ছিল। তাহার অসীম শক্তি সে প্রয়োগ করিল। শ্যামচাঁদও মরণপণ করিয়া যুঝিতে লাগিল। উমানাথ বলিল "শ্যামচাঁদ, পুলিসে বাড়ী ঘিরেছে। আর বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা বৃথা।"

এই কথা শুনিয়াই শ্যামচাঁদ উমানাথকে ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। একলম্ফে ঘরের বাহির হইয়া দৌড়িয়া কলবাড়ীর ভিতর অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে আর তাহার পদশব্দ শোনা গেল না।

নীহার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। গদাধর তাহার স্বামী নয়? তবে কিসের জন্য সে সীতাপতিকে ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছে? কিসের জন্য তাহার সাধ-আহ্লাদ, সুখ-শান্তি বিসর্জ্জন করিয়াছে? এখন তাহার দু'দিকই গেল। যে কর্ত্তব্য-পালনে সে ছুটিয়া আসিয়াছিল, সে কর্ত্তব্য ত তাহার পালন করিবার দরকার ছিল না। কিন্তু এখন ফিরিবারও ত পথ নাই। সীতাপতিকে সে

ছাড়িয়াছে। পরের স্ত্রী হইয়া বাস করিয়া এখন আর তাহার ফিরিবারও উপায় নাই।

উমানাথ বলিল "চল, মা, এখান থেকে বেরিয়ে যাই। পুলিশ আসেনি। আমি ওকে মিছে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছি। এখানে আজ রাত্রির মত আশ্রয় দিতে পার, এমন কোন জায়গা আছে কি? শ্যামচাঁদের সঙ্গে আরও লোক আছে। আজ রাত্রিতেই আর দুজন লোককে দেখেছি। তারা এই সামনের বাগানে গেছে। যদি বুঝ্‌তে পারে পুলিস আসেনি, তাদের নিয়ে আবার ফিরে আসতে পারে। এ রকম অবস্থায় আমাদের খুন কর্‌তেও সে পশ্চাৎপদ হবে না। তিনজন হলে আমি একা তোমাকে রক্ষা করতে পারব না। তুমি কি এখানে এমন কাউকে চেন, যার বাড়ী আজ রাত কাটাতে পার।"

নীহার তখনও প্রকৃতিস্থ হইতে পারে নাই। এ কে? কেন আসিল? সত্য বলিতেছে কি মিথ্যা বলিতেছে, তাহাও সে বুঝিতে পারিল না। কেবল বলিল "আমি কেবল একজনদের বাড়ী চিনি। একদিন গিয়েছিলুম।"

"তবে চল। আর দেরী করো না।"

উভয়ে পথে বাহির হইয়া পড়িল। অন্ধকার পথে দুই একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিল। নীহার পথ দেখাইয়া একখানা বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। উমানাথ সবলে সেই বাড়ীর দরজার কড়া নাড়িতে লাগিল।

ভিতর হইতে একজন বলিল "কে?"

"উমানাথ। একবার বেরিয়ে আসুন। বিশেষ দরকার।"

একটা লণ্ঠন হাতে লইয়া একজন আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

উমানাথ তাহাকে দেখিয়া দুই পা পিছাইয়া গেল। বলিল—"কে ? দাদা ?"

রঘুনাথ উমানাথকে জড়াইয়া ধরিল। বলিল—"এতদিন কোথায় ছিলি ?"

উমানাথ বলিল—"বড় বিপদ। এ কার বাড়ী ? এঁকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাও। বাড়ীতে মেয়ে ছেলে আছে ত ?"

রঘুনাথ। মালতী আছে।

এই বলিয়া নীহারের দিকে চাহিয়া বলিল—"আসুন। ভিতরে আসুন।"

মালতীর শয়নকক্ষের সামনে গিয়া দুইজনে ডাকিল "মালতী।" "দিদি।"

মালতী বাহির হইয়া আসিল। উমানাথ তাহাকে প্রণাম করিল। মালতী সবিস্ময়ে বলিল "তুই কোথা থেকে এলি ?" তার পর নীহারকে দেখিয়া বলিল—"এ কি ? আপনি এমন সময় এখানে কেন ?"

নীহার কোন উত্তর দিল না। সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া সেখানে পড়িয়া গেল। রঘুনাথ শশব্যস্ত হইয়া নীলমাধবকে ডাকিল। মাধুরীও উঠিল।

ঘোর মানসিক বিপ্লবে নীহারের শরীর আর তাহার আয়ত্তাধীন ছিল না। অনেকক্ষণ শুশ্রূষার পরও যখন তাহার চৈতন্য হইল না, তখন রঘুনাথ উদ্‌ভ্রান্তভাবে ডাক্তার ডাকিতে ছুটিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"প্রায়ঃ সরলচিত্তানাং জায়তে বিপদাগমঃ।
ঋজুর্যাতি যথা চ্ছেদং ন বক্রঃ পাদপস্তথা॥"

যশস্তিলকম্।

দিল্লীর একটা হোটেলে গোবিন্দ, নীরেন্দ্র ও শ্যামচাঁদ বসিয়া পরামর্শ করিতেছিল। শ্যামচাঁদ দিল্লীতে পলাইয়া আসিয়াছিল। তাহার পরামর্শে গোবিন্দ ও নীরেন্দ্রও আসিয়া জুটিয়াছিল। তিনজনে স্থির করিয়াছিল, এইখানে বসিয়াই মেকি টাকার ব্যবসা চালাইবে।

গোবিন্দ বলিল—"বাবু একটা মস্ত সুবিধা হয়েছে। শচীন বাবুকে আজ এখানে দেখ্‌তে পেলুম। তিনি এখানে একটা মস্ত ফারমের ম্যানেজার। হাজার হাজার টাকা রোজ তাঁর হাত দিয়ে লেনদেন হয়।—আপনার আত্মীয়। আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করুন। এ সব কথা না ভেঙ্গে টাকা দিয়ে তাঁর কাছ থেকে নোট আনালেই হবে।"

নীরেন্দ্র। আমি কি ব'লে নোট চাইব?

গোবিন্দ। একটা ফন্দি কর্‌তে হবে। বল্‌বেন "আমি কনট্রাক্টের কাজ কর্‌তে এখানে এসেছি। নগদ টাকা বেশী পাচ্ছি। নোট না হ'লে কল্‌কেতায় পাঠাবার সুবিধা হচ্ছে না।" তাহ'লে নিশ্চয়ই শচীন বাবু তার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।

"আচ্ছা আমি আজই তার সঙ্গে দেখা কর্‌ব। আফিসে যাব না বাসায় দেখা কর্‌ব?"

গো। বাসায় দেখা করাই ভাল। আমি বাসা দেখে এসেছি। আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দোব।

শ্যামচাঁদ বলিল "আমার থাকাটা তাহ'লে কোথায় হবে? একটা সুবিধামত জায়গা আমি ঠিক করেছি।"

গো। কোথায়?

শ্যা। তোগলকাবাদে। প্রকাণ্ড মাঠ, তার ওপর ক্রোশের পর ক্রোশ ভাঙ্গা কেল্লা আর সহর। তার মধ্যেই আমার কাজের খুব সুবিধে হবে। আমি সেখানে থাক্‌ব। বাবু সহরেই থাকুন। গোবিন্দ বাবু যাতয়াত কর্‌বেন।

গো। সেই কথাই ভাল।

* * *

সন্ধ্যার সময় শচীন্দ্র নিজ বাসায় ফিরিয়া পোষাক ছাড়িয়া একখানা হাতপাখা নাড়িয়া হাওয়া খাইতেছিল, এমন সময় তাহার বেহারা আসিয়া বলিল—একজন বাঙ্গালী বাবু দেখা করিতে আসিয়াছেন।

শচীন্দ্র বাবুকে উপরে আনিতে বলিল। যে আসিল সে নীরেন্দ্র।

নীরেন্দ্রকে দেখিয়া শচীন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বলিল—"কি হে? হঠাৎ কোথা থেকে?"

নী। একটা দরকারে দিল্লী এসেছিলুম। শুনলুম আপনি এখানে আছেন তাই একবার দেখা কর্‌তে এলুম।

শ। বেশ, বেশ। বস। এই মিশির। দো আদ্‌মিকা লুচি বানাও। গোস্ লায়া হ্যায়?

রান্নাঘরের ভিতর হইতে মিশিরজি বলিল—"জি মহারাজ।"

শ। তারপর, খবর সব ভাল ত?

নী। হাঁ। আপনার?

শচীন্দ্রের মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। বলিল—"তোমার মাসীর কোন খবর জান কি ?"

নী। না। তাঁর কোন খবর ত আমরা পাই নি। আপনিও কি কোন খবর জানেন না ?

শচীন্দ্র মাথা নাড়িয়া জানাইল "না।"

কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব রহিল। অন্য কথা পাড়িবার ছলে নীরেন্দ্র নিজের কথাটা বলিয়া ফেলিল। শচীন্দ্র সহজভাবে বলিল "তার আর কি ? যত টাকার নোট দরকার হয়, নিও।"

শচীন্দ্র মুখ হাত ধুইতে উঠিয়া গেল। নীরেন্দ্র উঠিয়া বাড়ীটির চারিদিক দেখিতে লাগিল। অন্ধকারময় একটি গলির মধ্যে বাড়ীখানি। বাড়ীতে ঢুকিতে হইলে রাস্তার দুই পাশের খোলা নর্দ্দামার দুর্গন্ধে অনেকখানি পথ নাক টিপিয়া আসিতে হয়। নীচের তলায় মালের গুদাম। উপরে তিনখানি ঘর ও একটু খোলা ছাদ। উপরে উঠিতে হইলে রসি ধরিয়া খাড়া সিঁড়ি বাহিয়া অতি সাবধানে উঠিতে হয়। উপরে একখানা বসিবার ঘর। একটা কেরাসিন কাঠের টেবিল ও দুখানা চেয়ার তাহার ভিতর পড়িয়া আছে। দেওয়ালের গায়ে একটা আলমারী। সেটা বই ও কাগজে ভর্ত্তি। তাহার মধ্যে একটা ষ্টোভ, একটা চায়ের টিন ও পেয়ালা চামচও আছে। টেবিলের উপরও একরাশ বই ও কাগজ।

একটা ভাঙ্গা দোয়াত ও একটা কলম টেবিলের উপর একখানা ব্লটিংয়ের পাশে পড়িয়া আছে।

নীরেন্দ্র শচীন্দ্রের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষটির একদিকে একখানা নেয়ারের খাটিয়া। তার উপর একটা তোষক। তার উপর একখানা চাদর পাতা। মাথায় একটা বালিশ এক দিকে পড়িয়া

আছে। আর একদিকে একখানা কাল বার্ণিশ করা টেবিল, তার উপর মখমলের উপর সাঁচ্চা কাজ করা একখানা টেবিলক্লথ্। টেবিলক্লথের উপর সোণার ফ্রেমে বাঁধান একখানা ফটো। ফটো মালতীর। তলায় শচীন্দ্রের হাতে লেখা—"অভিমানিনী।"

এই টেবিল, টেবিলের সাজসজ্জা ও ফটোফ্রেম ঘরটির অন্য আস-বাবের সহিত তুলনায় অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হইতেছিল। নীরেন্দ্র জানিত না, মালতীর সন্ধানে দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া শচীন্দ্র শেষে হতাশহৃদয়ে তাহার স্মৃতিমাত্র বুকে ধরিয়া জীবন যাপন করিতেছে। তাহার সমস্ত জীবন দাবানলদগ্ধ অরণ্যের মত। এই স্থলটিই কেবল ফলে ফুলে ভরা। থাকিবার মধ্যে আছে কেবল এই স্মৃতি।

শচীন্দ্র আসিতেছে দেখিয়া নীরেন্দ্র সে ঘর হইতে বাহির হইয়া বসিবার ঘরে গেল। শচীন্দ্র আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বাবা কেমন আছেন?"

নী। তিনি ত পাগল হয়ে গেছেন। কোন কথার ঠিক নেই—কাজের ঠিক নেই। হঠাৎ দেখ্‌লে কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু দু চারদিন কাছে থাক্‌লেই বেশ ধর্‌তে পারা যায়। রাত্রিতে শুনেছি একেবারেই ঘুমান না। দিনের বেলায় দুপুরে ঘণ্টাখানেক কোনদিন ঘণ্টা দুয়েক ঘুমান। মাঝে একবার পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন শুনেছেন ত? সে-ও তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে। তার পর থেকেই কেবল উইল লিখ্‌ছেন আর ছিঁড়ে ফেল্‌ছেন। তবে শান্ত পাগল। কোনরকম উপদ্রব নেই।

শচীন্দ্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। সে তাহার পিতাকে ভাল-বাসিত। ত্যজ্যপুত্র করিলেও তাহার মন হইতে পিতার প্রতি স্নেহ অপসৃত হয় নাই।

শচীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "চিকিৎসার কি বন্দোবস্ত হচ্ছে ?"

নী। চিকিৎসার কোন ক্রুটি হচ্ছে না। কল্‌কেতার যত বড় বড় কবরেজ সকলকে আনিয়ে একটা বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু কবিরাজেরা বল্‌ছে রোগীর মনের অবস্থা ভাল না হ'লে বিশেষ কিছু ফল পাওয়া যাবে না। আপনাকে খবর দেওয়ার প্রস্তাবও হয়েছিল। কিন্তু আপনার প্রসঙ্গ উঠ্‌লেই তিনি আরও বেশী ক্ষেপে উঠেন। তা'ছাড়া আপনি কোথায় আছেন তাও কেউ জানে না।

শচীন্দ্র চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে বলিল— "তুমি আজ এখানেই খাবে। কোথায় এসে উঠেছ ?"

নী। হোটেলে উঠেছি।

শ। এইখানেই এস না কেন। এই ঘরেই তোমার একটা বিছানা হ'তে পারবে। আমার একটা ঘরেই চলে যাবে। তবে খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হবে। তা হোটেলের চেয়ে এখানেই ভাল। কি বল ?

নীরেন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। শচীন্দ্র কথাটা অন্যরকম বুঝিল। বলিল "তা যদি অসুবিধা বোধ কর তা না হয় একখানা বাড়ীই দেখে দিই। কনট্রাক্টারি যখন করবে তখন কিছুদিন থাকতে হবে ত।"

নী। তা মন্দ নয়। তাই একটা ঠিক্ করে দিন।

শচীন্দ্র বলিল "আচ্ছা।"

* * * * *

ঠিক্ এই সময় কলিকাতায় উমানাথ ডিটেক্‌টিভ পুলিস আফিসের বড় সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। নীহারকে, সে রুক্মিণী বাবুর বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া আসিয়াছিল। রুক্মিণী বাবুকে সকল

কথা খুলিয়া বলাতে তিনি গদাধরকে পুলিসে ধরাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন। তাই উমানাথ ডিটেক্‌টিভ পুলিস আফিসে আসিয়াছিল।

বড় সাহেব সমস্ত কথা শুনিয়া প্রিয়বাবুকে ডাকাইলেন। তাঁহার উপর এই বিষয়ের তদন্তের ভার পড়িল। তিনি উমানাথকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"ভবিতব্যং ভবত্যেব নারিকেলফলাম্বুবৎ।"

দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা।

দিগন্তপ্রসারিত তোগলকাবাদের বিশাল প্রান্তরমধ্যে ক্রোশের পর ক্রোশ জুড়িয়া এক প্রাচীন নগরীর সুবিশাল ধ্বংসস্তূপ। এককালে এখানে সবই ছিল, এখন কিছুই নাই। থাকিবার মধ্যে কেবল একটি সুদৃঢ় মস্‌জিদ আজও পর্য্যন্ত পাঠান-স্থাপত্যের নিদর্শন-স্বরূপ অতীত গৌরবের স্মৃতি জাগাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর সবই ভগ্নস্তূপে পরিণত। পথ, ঘাট, রাজপ্রাসাদ, আমীর ওমরাহদিগের বিলাসভবন আজ সবই উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত। স্থানে স্থানে প্রাচীর এখনও সমুন্নত-শীর্ষে দণ্ডায়মান। পদতলে কতক কতক স্থলে কক্ষগুলিও অভগ্ন। কিন্তু যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল প্রস্তর ও ধূলির রাশি! ছাগ মেষাদি ইহার ভিতর সঞ্চরণ করে। তাহাদের অন্বেষণে রাখালও ভগ্নস্তূপের মধ্যে প্রবেশ করে। কদাচিৎ কখনও কোন ভ্রমণকারী এই পরিত্যক্ত নগরীর কঙ্কালাবশেষ দেখিবার জন্য আগমন করেন।

সমগ্র ভগ্নস্তূপের সব স্থলে যাতায়াত সম্ভব নহে। কিয়দংশ মাত্র গমনাগমনের উপযোগী হইয়া আছে। বাকি কোথাও দুর্ভেদ্য জঙ্গলে কোথাও বা অসমতল উচ্চ প্রস্তরস্তূপে মনুষ্যের গতিকে ব্যাহত করিয়া রাখিয়াছে। এইরূপ এই দুর্গম অংশে শ্যামচাঁদ নিজ কার্য্যের উপযুক্ত স্থল বাছিয়া লইয়াছিল।

অপরাহ্নের প্রখর রৌদ্রে চারিদিক আলোকিত। শ্যামচাঁদ, গোবিন্দ ও নীরেন্দ্র একটা ভূগর্ভ সমাহিত কক্ষে বসিয়াছিল। অনেকদিন হইতে তাহারা বেশ ব্যবসা চালাইয়া আসিতেছিল। শচীন্দ্রের সাহায্যে তাহাদের টাকা চালাইতে কিছুমাত্র ক্লেশ পাইতে হয় নাই। শ্যামচাঁদ তাই অনবরত টাকা তৈয়ার করিতেছিল। আজ নীরেন্দ্র নিজে গোবিন্দের সঙ্গে টাকা লইতে আসিয়াছিল।

ইতিমধ্যে উমানাথের সাহায্যে ডিটেকটিভ পুলিস সকল সন্ধান জানিতে পারিয়াছিল। শচীন্দ্রও ইহার মধ্যে লিপ্ত এই সন্দেহে হৃদয়বাবুর বাড়ীতে পুলিস গিয়াছিল। অর্দ্ধক্ষিপ্ত হৃদয়বাবু তাহাদের অনুসন্ধানে এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে শচীন্দ্র দিল্লীতে আছে। পুলিশ বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেলে হৃদয়বাবু একজন গোমস্তা ও ভৃত্য সঙ্গে লইয়া দিল্লীতে আসিয়াছিলেন।

পুলিশ নীরেন্দ্র ও গোবিন্দের গতিবিধির উপরও লক্ষ্য রাখিয়াছিল। গঙ্গাধর বাবুর বাড়ীতেও সন্ধান লইতে ছাড়ে নাই। পুলিস কোন কথা ভাঙ্গিয়া না বলিলেও উমানাথ গঙ্গাধর বাবুকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল। শুনিয়া গঙ্গাধর বাবুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সুশীলাসুন্দরী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন। শেষে গঙ্গাধর বাবুও উমানাথের নিকট সংবাদ লইয়া নীরেন্দ্রকে যদি কোন রকমে উদ্ধার করিতে পারেন এই আশায় দিল্লী আসিয়া পৌছিয়াছিলেন।

শ্যামচাঁদ, গোবিন্দ বা নীরেন্দ্র ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারে নাই যে তাহাদের প্রত্যেক গতিবিধির উপর পুলিশের চর লক্ষ্য রাখিয়াছে। জাল একেবারে না গুটাইলে মাছ নিজ অবস্থা বুঝিতে পারে না। আজ তোগলকাবাদের ধ্বংসস্তূপের আশে পাশে সশস্ত্র পুলিশ উঠিতেছিল।

শ্যামচাঁদ তখনও নিশ্চিন্ত মনে নিজ কার্য্যে রত। গোবিন্দ ও নীরেন্দ্র উৎসুক হইয়া তাহার কার্যকলাপ দেখিতেছিল।

নীরেন্দ্রের কথা যখন প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন উমানাথ ভাবিল, আর কাজ নাই। কিন্তু তখন আর ফিরিবার উপায় নাই। বাধ্য হইয়া উমানাথকে পুলিসের সঙ্গে দিল্লীতে আসিতে হইয়াছিল।

শ্যামচাঁদ বলিতেছিল "আমার টাকাটা বাবু কবে দেবেন?"

নী। নিলেই পার। তোমার ভাগ ত রেখেই দিয়েছি। যেদিন ইচ্ছা নিও।

গোবিন্দ বলিল "কাল কিছু বেশী টাকা চালাতে হবে। অল্প স্বল্প টাকায় আর তেমন লাভ থাকে কৈ? আবার ভাল টাকাও ত তার মধ্যে মিশিয়ে দিতে হয়।

শ্যা। আমার যতদূর ক্ষমতা তা কচ্ছি। দেখ্‌তেই ত পাচ্ছেন, এ সব কাজ দিনে কর্‌বার কথা নয়, তবু আমি দিনের বেলাতেও কামাই দিই না। আর বেশী লোভ করাটাও ঠিক নয়। হঠাৎ ধরা পড়ে যেতে হবে।

এই সময় গোবিন্দের দৃষ্টি অদূরস্থ একটা উচ্চ স্তূপের উপর পড়িল। বলিল "ও কি?"

সকলে সেইদিকে চাহিয়া দেখিল। মানুষ দেখা যাইতেছিল না, কেবল একটা পুলিসের পাগড়ী স্তূপের অপরপার্শ্ব দিয়া সরিয়া যাইতেছিল দেখিতে পাওয়া গেল।

ভয়ে শ্যামচাঁদের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। যন্ত্রপাতি ফেলিয়া সে একটা থলির ভিতর হইতে একটা পিস্তল বাহির করিল। জিজ্ঞাসা করিল "আপনারা কেউ ছুঁড়তে জানেন?"

নীরেন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, বলিল "না।"

গোবিন্দ কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল "এঁ্যা পুলিস, কি হবে তবে ?"

শ্যামচাঁদ বলিল "চুপ করুন। হয়ত একজন কি রকম ক'রে এসে থাকবে।"

শ্যামচাঁদের কথা শেষ হইতে না হইতে স্তূপের উপর বন্দুক স্কন্ধে একজন পুলিশ উঠিয়া পড়িল। উঠিয়াই তাহাঁদের দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কি বলিল।

শ্যামচাঁদ "পালান। পালান।" বলিয়া নিজে এক পার্শ্ব দিয়া নিকটস্থ এক স্তূপে উঠিতে গেল। পুলিশ হাঁকিল "খবরদার।" সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক ছুঁড়িল।

বন্দুকে গুলি ভরা ছিল না। ভয় দেখাইবার জন্য কেবল ফাঁকা আওয়াজ করিল। কিন্তু শ্যামচাঁদ তাহা বুঝিতে পারিল না। বন্দুকের শব্দে গোবিন্দ মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া মাটির উপর লুটাইয়া পড়িয়াছিল, নীরেন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু শ্যামচাঁদ একলম্ফে স্তূপের উপর উঠিয়া অপর দিক দিয়া নামিয়া পলাইতে লাগিল। প্রস্তরের আঘাতে তাহার পদের স্থানে স্থানে ভীষণ আঘাত লাগিল। হাত দিয়া ধরিতে গিয়া হাতের তলাও কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না। কখনও হামাগুড়ি দিয়া, কখনও বুকে হাঁটিয়া সে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু একটা বাঁকের মুখ ফিরিতেই সে অতর্কিতে একজন পুলিসের সম্মুখে গিয়া পড়িল।

তৎক্ষণাৎ সেই পুলিস-প্রহরী তাহাকে ধরিতে গেল। শ্যামচাঁদ ইতস্ততঃ করিল না। পুলিসপ্রহরীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়িল। তাহাতে প্রহরীর বিগতজীবন দেহ সেইখানেই লুটাইয়া পড়িল। শ্যামচাঁদ সামনে চাহিয়া দেখিল, একজন সাহেব পুলিস-কর্ম্মচারী ও উমানাথ দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। উমানাথের

উপর তাহার রাগ ছিল। সে আবার পিস্তল তুলিয়া উমানাথের দিকে গুলি ছুঁড়িল। উমানাথের পায়ে সে গুলি লাগিল। সে বসিয়া পড়িল। কিন্তু শ্যামচাঁদ আর পলাইতে পারিল না। পরমুহূর্ত্তেই সাহেবের পিস্তল গর্জ্জিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে শ্যামচাঁদের মৃতদেহ ভূলুণ্ঠিত হইয়া গেল।

তখন চারিদিক হইতে পুলিসপ্রহরী অগ্রসর হইয়া আসিল। রোরুদ্যমান গোবিন্দ ও বিহ্বলহৃদয় নীরেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিতে তাহাদের আর ক্লেশ পাইতে হইল না। উভয়ের হাতে হাতকড়ি দিয়া টানিয়া লইয়া গেল। মেকি টাকা প্রস্তুতের সরঞ্জামগুলিও সাহেবের আদেশে কোতয়ালীতে প্রেরিত হইল।

সূর্য্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে। অসহ্য গ্রীষ্মের পর আঁধি আসিবার পূর্ব্বলক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেল। গাছের পাতাটিও নড়িতেছিল না। কিন্তু সে নীরবতা কেবল আসন্ন ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণ মাত্র। আহত উমানাথ একায় স্থানান্তরিত হইল। তাহার আঘাত সামান্যই হইয়াছিল।

হৃদয়বাবু একখানা টঙ্গায় করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। একজন পুলিসের কর্ম্মচারীর নিকট গোপনে জানিয়াছিলেন, সকলে তোগলকাবাদে গিয়াছে। শচীন্দ্রও সেখানে আছে মনে করিয়া হৃদয়-বাবু সেখানে আসিতেছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এই কয়দিনের ঘটনায় তাহা আরও বিচঞ্চল হইয়া গিয়াছে। হিতাহিত বা ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা আর তাঁহার কিছুই ছিল না। শান্ত প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। আসিতে আসিতে দেখিতে পাইলেন নীরেন্দ্র ও গোবিন্দকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতেছে। টঙ্গা থামাইয়া একজন

জমাদারকে শচীন্দ্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। জমাদার বলিল "সে এতক্ষণ দিল্লীতে গ্রেপ্তার হয়েছে। সকাল থেকে তাকে নজরবন্দী রাখা হয়েছিল।"

শুনিয়া হৃদয়বাবু দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া পদব্রজে তোগলকাবাদের ধ্বংসস্তূপের দিকে অগ্রসর হইলেন। কেন যে সেদিকে যাইতেছেন তাহা তিনিও জানিতেন না। তাঁহার বিকৃত মস্তিষ্ক তাঁহাকে যদৃচ্ছা পরিচালিত করিতেছিল। টঙ্গাচালক জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, এখানে গাড়ী রাখিব কি?" হৃদয়বাবু চলিতে চলিতেই বলিলেন "হাঁ।" কিয়দ্দূরে একটি কূপপার্শ্বে এক বৃক্ষতলে সে গাড়ী রাখিল। আকাশের ভাবগতিক দেখিয়া সে বুঝিয়াছিল, এইবার আঁধি আসিবে।

অনেকটা অগ্রসর হইয়া হৃদয়বাবু দেখিতে পাইলেন, কে একজন আসিতেছে। নিকটস্থ হইলে চিনিলেন গঙ্গাধর। গঙ্গাধর পুত্রের পরিণাম জানিতে আসিয়াছিলেন। নিকটস্থ মসজিদে ছিলেন। এখন কোতয়ালীতে যাইতেছিলেন। যদি জামিন হইয়া নীরেন্দ্রকে ছাড়াইয়া লইতে পারেন।

গঙ্গাধরকে দেখিয়া হৃদয়বাবু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। গঙ্গাধরও সেইখানে সেই অবস্থায় হৃদয়বাবুকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। বলিলেন "এ কি? আপনি এখানে?"

বিকৃতমস্তিষ্ক হৃদয় বিকট চীৎকার করিয়া বলিলেন "আস্‌ব না? তুমি জান না কেন এসেছি? আমি সব জেনেছি। উমানাথ আমায় সব জানিয়েছে। গহনা চুরি করে আমার সর্ব্বনাশ করেছ। আমার ছেলে-বৌকে পর ক'রে দিয়েছ। আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছ আমি কেন এখানে? তোমার ছেলের জন্য আমার ছেলে আজ গ্রেপ্তার হয়েছে।"

গ। আমার তাতে দোষ কি বলুন?

হৃ। কিছু না। তবে ভাল হয়েছে, তোমার দেখা পেয়েছি—হাঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ—

এই বলিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া হৃদয়বাবু গঙ্গাধরকে ধরিতে ছুটিয়া গেলেন। গঙ্গাধর ভয়ে ছুটিয়া পিছাইতে লাগিলেন। হৃদয়বাবুর রক্তবর্ণ চক্ষু, দন্তঘর্ষণ ও ভ্রূকুটি দেখিয়া তাঁহার ভয় হইয়াছিল। আগে হইতেই শুনিয়াছিলেন যে হৃদয়বাবু ক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তাই আরও বেশী ভয় পাইয়াছিলেন।

হৃদয়বাবু কিন্তু ছাড়িলেন না। যেদিকে গঙ্গাধর যান, সেইদিকেই তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। স্তূপের উপর উঠিয়া হৃদয়বাবুর হাত হইতে এড়াইবেন, এই ভরসায় গঙ্গাধর তাড়াতাড়ি স্তূপের এক-পার্শ্বে উঠিয়া গেলেন। হৃদয়বাবুও তাঁহার পশ্চাতে গেলেন।

তখন উভয়ের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল। গঙ্গাধর পলাইতে চান, হৃদয়বাবু কিছুতেই তাহাকে ছাড়িবেন না। চারিদিকে ছুটাছুটি, লুকাইবার প্রয়াস করিতে করিতে উভয়ে এক উচ্চ স্থলে আসিয়া পৌছিলেন।

সেখানে বহুকাল পূর্ব্বে একটা গভীর কূপ ছিল। কূপে নামিবার কয়েকটা সোপানও বোধ হয় ছিল। তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু কূপগাত্র হইতে আগাছা বাহির হইয়া কূপের মুখ আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। উপর হইতে দেখিলে কূপের অস্তিত্ব জানিবার সম্ভাবনা নাই। তাই গঙ্গাধর একেবারে কূপের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

কিছুক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই প্রবল বাতাস বহিতে আরম্ভ হইয়াছিল। সেই প্রচণ্ড বায়ুর বেগে উন্মুক্ত উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকাও গঙ্গাধরের পক্ষে ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছিল। কাপড় জামা চাদর উড়িতেছিল, মাঝে মাঝে হেঁট হইয়া পড়িয়া তাহা সামলাইতেছিলেন। এইবার

আঁধি আসিল। দিগ্‌দিগন্ত অন্ধকার করিয়া রাশি রাশি ধূলি বহন করিয়া উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় হুঙ্কার দিয়া ঝটিকা বহিতে লাগিল। গঙ্গাধর বাবু দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। কিন্তু উন্মত্ত হৃদয়বাবু বিকট চীৎকার করিয়া সেই আঁধির ভিতরই অগ্রসর হইয়া একলম্ফে গঙ্গাধরের উপর পড়িলেন। গঙ্গাধর সে বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। প্রাণপণে একবার নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু উন্মত্ত হৃদয়বাবুর দেহে অসুরের বল সঞ্চিত হইয়াছিল। গঙ্গাধরের সেই ঝাঁকিতেই উভয়ে কূপোপরিস্থিত জঙ্গলের উপর গিয়া পড়িলেন। সামান্য আগাছা সে ভর সহিতে পারিল না। গঙ্গাধরের উচ্চ আর্ত্তনাদ, ও হৃদয়বাবুর বিকট হাস্য চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে দুইজনে গভীর কূপমধ্যে পড়িয়া গেলেন।

উপরে উন্মত্ত প্রকৃতির উদ্দাম নর্ত্তনে পুঞ্জ পুঞ্জ ধূলি ঝটিকার মুখে বাহিত করিয়া তাঁহাদের সমাধি রচনা করিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"সুতনু হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশবৎলীকমপৈতু তে।"

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

দক্ষিণেশ্বরে নীলমাধবের বাড়ীতে আজ আনন্দ কোলাহল। শচীন্দ্র নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি পাইয়াছে। উমানাথও সম্পূর্ণরূপে সারিয়াছে। বাহির বাড়ীতে নীলমাধব কোমরে কাপড় বাঁধিয়া ভোজের আয়োজনে ব্যস্ত। রঘুনাথ কলিকাতা হইতে বাজার করিতে গিয়াছে। উমা-নাথ সকল যোগাড় করিয়া দিতেছিল। মাধুরীর আজ একমুহূর্ত্তও অবকাশ নাই। প্রত্যূষে উঠিয়াই সে রান্নাঘরে গিয়া রন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

শচীন্দ্র পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। হৃদয়বাবু কোনও উইল রাখিয়া যান নাই! ত্যাজ্যপুত্র করাটাও কেবল মুখে। শ্যামচাঁদের মৃত্যুতে নীহারের সম্পত্তির আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

আজিকার আনন্দোৎসবে সুশীলাসুন্দরীই কেবল যোগদান করিতে পারেন নাই। বিধবা হইবার পরই পুত্রের কারাদণ্ডের সংবাদে তিনি মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে আনিবার জন্য রঘুনাথ ও মালতী বহু চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সফল-কাম হইতে পারে নাই।

নিম্নতলে যখন এইরূপ আনন্দোৎসবের স্রোত প্রবাহিত, দ্বিতলের একটি কক্ষে তখন শচীন্দ্র ও মালতী দাঁড়াইয়া। কতকাল পরে আজ

কখনও কারও কথা সহ্য করতে পার না। তোমার মন যে কি হয়েছিল তা আমি বুঝতে পেরেছি। ভেবেছিলুম তোমায় আর দেখতে পাব না। অভিমানিনী তুমি, যে ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছ, অভিমানে আর আমায় দেখা দেবে না। তাই অভিমানিনীর স্মৃতি নিয়েই জীবন কাটাব বলে এই ফটোখানি সম্বল করেছিলুম। আজ যদি ভাগ্যবশে দেখা পেয়েছি ত ক্ষমা চেয়ে নিই। বল—আমায় মার্জ্জনা করলে ?"

শচীন্দ্র টেবিলের উপর ফটোখানি রাখিয়া দিয়াছিল। মালতী এক কলম কালি লইয়া ফটোর তলায় শচীন্দ্রের হস্তাক্ষরে লেখা "অভিমানিনী" কথাটি কাটিয়া দিল।

নবম পরিচ্ছেদ

"আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা।"

বিদ্যাপতি।

ঘরখানির চারিদিকে জানালাগুলি বন্ধ। দুই চারিটি খড়খড়ির পাকি খোলা, তাহার সামনেও সাদা নেটের পর্দ্দা টাঙ্গান। মেঝের উপর পুরু গালিচা পাতা। আসবাবপত্র সব বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। একপাশে কোমল শয্যার উপর নীহারের অচৈতন্য দেহ শায়িত। শয্যার নিকট একটি ছোট টেবিলের উপর কয়েকটি ঔষধের শিশি, বেদানা, ঔষধ খাইবার গ্লাস প্রভৃতি সাজান। সেই টেবিলের নিকট একখানা চেয়ার। ঘরে কোন লোক নাই। দরজার ধারে ঘরের বাহিরে একজন বেহারা রহিয়াছে।

সেই রজনীর ঘটনার পর হইতে প্রবল জ্বরবিকার নীহারকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। শারীরিক ক্লেশ, আকস্মিক মানসিক উত্তেজনা তাহার পরই অবসাদ—নীহার আর সহ্য করিতে পারিল না। প্রায় এক মাস নীহার এইভাবে শয্যাশায়িনী হইয়াছে। মাঝে মাঝে জ্ঞান হয়, মাঝে মাঝে যেন থাকেও ভাল। আবার জ্বর বাড়ে, আবার চৈতন্য লোপ হয়। ইহার মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে রুক্মিণী বাবু উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া অতি সাবধানে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম জানাইয়াছেন। শুনিয়া নীহার ভাল মন্দ কিছুই বলে নাই। কিছু বুঝিতে পারিল

কি না ভাবভঙ্গীতে তাহাও প্রকাশ করে নাই। অধিক কথা কহা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। রুক্মিণী বাবুও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করেন নাই।

ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন—অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। উচ্চ শব্দে নীহারের নিদারুণ ক্লেশ হয়। বাড়ীর সামনে রাস্তায় খড় বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে—গাড়ীর শব্দ কম হইবে বলিয়া। হিরণ্ময় ধীরে ধীরে খেলা করে। নীহারের কক্ষে সকলে পা টিপিয়া টিপিয়া প্রবেশ করে, ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলে।

এমন দিন যায় নাই যেদিন সীতাপতি না আসিয়াছে। নীহারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি সে পায় নাই, কিন্তু দ্বারের নিকট হইতে অচৈতন্য নীহারের পাণ্ডুর বদন সে নিত্যই দেখিয়া গিয়াছে। সাধে কি বিমল বলিয়াছিল "বন্ধনহীন না হইলে, অবিবাহিত ও ব্রহ্মচারী না হইলে রামকৃষ্ণ মিশনে কাহারও প্রবেশ করা উচিত নয়।"

তবে এ আকর্ষণ আর মোহের আকর্ষণ নয়। ডাক্তারের কথায় বোধ হয় নীহারের শেষ দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। সীতাপতি আগেই ত জীবনের সব সুখ সব আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল। এখন কেবল তাহার সান্ত্বনা, নীহার শান্তি পাইয়াছে। নীহারের শেষ মুহূর্তগুলি শান্তিময় হইয়াছে।

আজ সীতাপতি আর কোন বাধা মানিতে চাহিল না। আজ সে নীহারের সহিত দেখা করিবেই। আর যদি দেখা না-ই হয়? ডাক্তার বাবু অনেকবার বারণ করিলেন, রুক্মিণী বাবু অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু সীতাপতি শুনিল না। তাহার মন কেবলই বলিতেছিল—"আজই শেষ আর দেখা হইবে না।"

অগত্যা ডাক্তার বাবু মত দিলেন। রুক্মিণী বাবু অনুমতি দিলেন।

ধীরপদে সীতাপতি নীহারের কক্ষের দিকে গেল। রুক্মিণীবাবু আগে আগে গেলেন।

নীহারের জ্ঞান হইয়াছিল। ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "জল।"

রুক্মিণীবাবু তাহাকে বালিশের উপর ভর দিয়া হেলান দিয়া বসাইলেন। বসাইয়া জলের গ্লাস মুখে তুলিয়া ধরিলেন। খানিকটা জল পান করিয়া নীহার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

রুক্মিণী বাবু বলিলেন—"মা, একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে।"

বিদ্যুতের মত নীহারের মনে জাগিয়া উঠিল "সীতাপতি।" সে যে রোগশয্যায় শুইয়া এই আশাই করিতেছিল। মরণের পূর্ব্বে এক বার সীতাপতিকে দেখিতে পাইবে এ লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। সীতাপতিকে প্রত্যাখ্যান করিয়া সে দক্ষিণেশ্বর চলিয়া গিয়াছিল, সীতাপতির কাতর প্রার্থনায় সে কর্ণপাতও করে নাই এ কথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই। কর্ত্তব্যের পাষাণ চাপাইয়াও এ কথা দমন করিতে পারে নাই। সীতাপতিকে বিস্মৃতি-সলিলে নিমজ্জিত করিতে পারে নাই। রোগশয্যায় পড়িয়া সকল সংবাদ শুনিয়া তাহার মন কতকটা লঘু হইয়াছিল। গদাধরের মৃত্যুতে সে একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। দুঃস্বপ্নের মত তাহার জীবনের একটা দিক কাটিয়া গিয়াছে। এখন সে কেবল চায় হিসাব নিকাশ করিতে, সকলের সঙ্গে শেষ দেখা করিয়া শান্তিতে শেষ ঘুম ঘুমাইতে। তাই সকলের আগে সীতাপতির সহিত সাক্ষাতের জন্যই সে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

নীহারের উৎসুক ব্যাকুল দৃষ্টি কক্ষদ্বার পথে পড়িতেই সে সীতাপতিকে দেখিতে পাইল। সীতাপতিও ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিল। রুক্মিণী বাবু বাহির হইয়া গেলেন।

সীতাপতি চেয়ারে বসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"এখন কেমন আছ?"

নীহার থামিয়া থামিয়া বলিল "আর বাবাকে মাকে বেশীক্ষণ কষ্ট দোব না। আমার গোটাকতক কথা বল্‌বার আছে। শক্তি থাক্‌তে থাক্‌তে বলে নিই। বেশী কথা বল্‌তে পার্‌ব না।"

সী। আমারও ক'টা কথা বল্‌বার আছে। তুমি সেরে ওঠ। তার পর বল্‌ব।

নীহার মৃদু হাসিল। সেই ক্ষীণ হাস্যরেখা তাহার পাণ্ডুর বদনে কাতরতার ছবি জাগাইয়া তুলিল। বলিল—"তা হ'লে আমার আর শোনাই হবে না। যাক্, আমার কথাগুলো বলে নিই। এ সময়ে আমার আর বল্‌তে লজ্জা হচ্ছে না। কথাগুলো না বলে আমি শান্তি পাব না। আপনি আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চেয়েছিলেন—আমি দেখা কর্‌তে পারি নি। কেন পারি নি তাও আপনাকে বলি। কিন্তু বলবার আগে তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিই।"

সী। তা আর বল্‌তে হবে না নীহার। তুমি যে কেন দেখা কর্‌তে পার নি, তা আমি তখনই বুঝেছিলুম। আমার দেখা কর্‌তে চাওয়াই তখন অন্যায় হয়েছিল। তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কেন? তুমি ত কোন দোষ ক'র নি।

নী। কি জানি, আমার মন কেবলই বল্‌ছে, আমি আপনার কাছে অপরাধিনী। আপনি আমায় ক্ষমা না কর্‌লে আমি শান্তি পাব না। আমার মৃত্যু আসন্ন—আজ তাই মুখ ফুটে বল্‌তে পাচ্ছি, আপনি আমার জন্যই জীবনে সুখী হ'তে পার্‌লেন না। আমার জন্য আপনি বাপ মা ছাড়্‌লেন, সমাজ ছাড়্‌লেন, বিষয় সম্পত্তি ছাড়্‌লেন, কিন্তু সবই বৃথা হ'ল। হতাশ হয়ে আপনি সংসার ত্যাগ কর্‌লেন। শুনেছি আপনি সন্ন্যাসী হয়েছেন। কি কর্‌ব? আমার হাত ছিল না।

আমার কোন অপরাধ নেই। ভাগ্যে যা ছিল, তাই ঘটেছে। আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমি শান্তিতে মরি। আপনাকে আমার একটা অনুরোধ, আপনি আবার সংসারী হ'ন। বাপ মা'র কাছে ফিরে যান। আপনি কোন দোষ করেন নি। সমাজ আপনাকে ত্যাগ করবে না। আপনি সংসারী হ'য়ে সুখী হ'লে পরলোকে আমি শান্তি পাব।

সীতাপতি ব্যাকুলভাবে বলিল—"অমন কথা বলো না। আমার অদৃষ্টে সুখ হ'তে পারে যদি তুমি আমার একটি প্রার্থনায় রাজী হও। তা' হলে আমি সংসারী হই। তুমি, যা বল্‌বে তাই শুনি। তা নইলে আর আমার জীবনে কোন সুখের সম্ভাবনা নেই।"

নী। কি বলুন?

সী। তুমি আমার হও। সন্ন্যাসীর সাজ আমি পরি নি, মিশনেও যোগদান করতে সাহস করিনি, কারণ যেদিন শুনলুম যে তোমার বিবাহ-কাহিনী সব মিথ্যা, সেইদিনই আমার মন আবার তোমার দিকে ছুটে এল। তার আগেই কি তোমায় আমি ভুলতে পেরেছিলুম? কেবল মনকে মিথ্যা প্রবোধ দিয়ে, জোর করে মনকে দমন করব এই আশায় মিশনে ঢুকতে গিয়েছিলুম। কিন্তু দু'চার দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলুম যে তোমায় ভোলা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়। তার পর কতবার অশান্ত মনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি, কিছুতেই পারি নি। তাই বল্‌ছি—তুমি আমার আশা পূর্ণ কর, আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর!

নীহার বলিল—"আমায় ক্ষমা করুন।"

সী। কেন? তুমি কি আমায় ভালবাস না? তবে কেন আমার এ দশা করলে?

নীহার কাঁদিয়া ফেলিল। একটু উত্তেজিতভাবে বলিল "আমি আপনাকে ভালবাসি না? কার জন্য আমি যা আমার কর্ত্তব্যপথ মনে

করেছিলুম তা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি? কার স্মৃতি কার চিন্তা আমার সকল ধৈর্য্য, সকল শক্তিকে বার বার দুর্ব্বল করেছে? কার স্বপ্ন আমার দক্ষিণেশ্বরের জীবনে দিবানিশি মনকে আচ্ছন্ন রেখেছিল? কার প্রত্যাশায় আমি এ রোগশয্যায় পড়ে দিনরাত ব্যাকুল হয়েছিলুম? আপনি না জানুন ভগবান আমার বিচার করবেন। তিনি সবই দেখেছেন। আমায় অপরাধিনী করেন, করুন। বাস্তবিকই আমি অপরাধিনী। আমি আপনার জীবনের সুখ অপহরণ করেছি। মৃত্যু-কালে আর আমার উপর রাগ রাখবেন না। আমি হাত জোড় করে ক্ষমা চাচ্ছি। আমায় ক্ষমা করুন।

সীতাপতি ক্ষণিক উত্তেজনার মুখে যাহা বলিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া হৃদয়ে নিদারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিল। নীহারের চোখে অশ্রু দেখিয়া সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। অশ্রুপূর্ণলোচনে কম্পিতস্বরে বলিল—"আমি নরাধম—তাই এমন কথা তোমায় বলেছি। তুমি দেবী আমি তোমার উপযুক্ত নই। যে কর্ত্তব্যের পথে তুমি চল্‌তে সাহস করেছ, আমি পুরুষ হ'য়ে মনে মনে তোমায় সে পথ থেকে ফেরাবার সঙ্কল্প করেছিলুম। সে সঙ্কল্প আবার কেন করেছিলুম তা জান? কেবল আত্মসুখের জন্য। আমার প্রায়শ্চিত্ত নেই। তা না হ'লে তোমায় হারাতে বস্‌ব কেন?"

নীহার মৃদুস্বরে বলিল "চুপ করুন। ওরকম কথা বল্‌লে আমার বড় কষ্ট হয়। আপনি সুখী হবেন এটা না ভাবতে পার্‌লে ম'লেও আমি শান্তি পাব না। আপনি প্রতিজ্ঞা করুন—আবার সংসারী হবেন, সুখী হবেন, তা হ'লে আমি সুখে মরি।"

সী। যা অসম্ভব, যা কখনও ঘট্‌বে না, তা কি ক'রে প্রতিজ্ঞা কর্‌ব নীহার? আমি নিজের সুখের প্রত্যাশী বটে, কিন্তু মিথ্যাবাদী

নই। ছলনা ক'রে মৃত্যুশয্যায় তোমায় ভোলাতে পারব না। ভগবান সাক্ষী, আমি বুকে হাত দিয়ে বল্‌ছি আমার জীবনের যা সুখ-আশা, সব তোমার সঙ্গে। তুমি যদি আমার হও, তাহ'লেই আমি সুখী হব। নহিলে আর এ জীবনে নয়। বল—বল নীহার, তুমি আমার হ'বে? এখন আর বাধা কিসের? তোমার বিবাহ-কাহিনী মিথ্যা—গদাধর মরেছে। তুমি কেন আমায় সুখী করবে না?

নী। আপনি আমায় বিবাহ করবেন? লোকে যখন বল্‌বে আপনার স্ত্রী আর একজনের স্ত্রীস্বরূপ তাঁর গৃহে কাল কাটিয়েছে, তখন আপনি কি উত্তর দিবেন?

সী। আমি সব জানি নীহার। দেহে ও মনে তুমি সম্পূর্ণ শুদ্ধা। তোমার অঙ্গ স্পর্শমাত্র করতে চাইতেই তুমি গদাধরকে বাধা দিয়েছিলে। লোকে যা বলে বলুক আমি লোকের কথা মানি না। বল, বল নীহার —তুমি আমায় বিবাহ করবে?

নীহার মৃদুস্বরে বলিল "এখন আর সময় কই? আমার ত যাবার আর দেরী নেই।"

সী। তা হ'লে তুমি রাজী? বল—বল—এই কথাটি শোনবার জন্য আমি এখনও আশা রেখেছি। বল তুমি আমার।

নীহারের গণ্ড রক্তিমাভ হইয়া উঠিল। বলিল—"যদি বাঁচতে পারতুম তা হ'লে—"

সী। চুপ করলে কেন? বল—তাহ'লে তুমি আমার হ'তে?

নীহার মৃদুস্বরে বলিল "যদি আমায় গ্রহণ করতেন।"

সীতাপতি সাগ্রহে নীহারের করধারণ করিল। বলিল "নীহার!"

নীহার চক্ষু নিমীলন করিল।

তবে এস দেবতা—মন্দাকিনীর শীকরসিক্ত নন্দনবনজাত পারিজাতের

সৌরভে দিক আমোদিত করিয়া অমৃতের কমণ্ডলু করে মুমূর্ষুকে সঞ্জীবিত করিতে এস। প্রেমময় তুমি—প্রেমিকের প্রাণের প্রার্থনা ত' তোমার কাছে বিফল হয় না। অর্দ্ধ জীবন দিয়া রুরু প্রমদ্বরাকে বাঁচাইয়াছিল—আজ সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া কাতরনয়নে নতজানু প্রণয়ী তোমার করুণা ভিক্ষা করিতেছে, তার মনস্কামনা পূর্ণ কর।

সমাপ্ত

বাঙ্গালীর সুখ-দুঃখের আলো-ছায়ায় গঠিত,

রস-বৈচিত্র্যে ও চরিত্রাঙ্কণ-নৈপুণ্যে অতুলনীয়

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম-এ, বি-এল, সরস্বতী প্রণীত

বারুণী

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—"আমি পূর্ব্বাবধিই শরৎ বাবুর লেখার পক্ষপাতী ছিলাম। 'বারুণী' যেদিন হস্তগত হইল, সেই দিনই আমি উহার প্রথম হইতে শেষ লাইন পর্য্যন্ত পড়িয়া ফেলি। বাঙ্গালা পুস্তক একদিনে একখানা সায় করা আমার দ্বারায় বহুকাল হয় নাই। প্রত্যেক গল্পটিই সুপাঠ্য। তন্মধ্যে "অনাদৃত" ও "পুনর্জ্জন্ম" বঙ্গসাহিত্যে চিরস্থায়ী হইবার যোগ্য।"

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—"আজ 'বারুণী শেষ করিলাম। খুব ভাল লাগিল। সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে 'পুনর্জ্জন্ম'। সব গল্প-গুলিতেই বেশ একটু করুণ রস আছে। গার্হস্থ্যজীবনের চিত্র বেশ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। 'বারুণী'তে স্বভাব-বর্ণনার বাহুল্য নাই, কবিত্বের আড়ম্বর নাই, অথচ এরূপ গুণপণার সহিত সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে যে, গোড়া হইতেই পাঠকের মন আকৃষ্ট হয় এবং শেষদিকে হৃদয় করুণরসে আর্দ্র হইয়া উঠে। ভাষা অতি সুন্দর। ছোট গল্প রচনায় যে গুণপণা আবশ্যক, তাহা বারুণীতে পূর্ণমাত্রায় আছে।"

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়—"আপনার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার পরিচয় না থাকিলেও আমি আপনার রচনার অত্যন্ত পক্ষপাতী

এবং ভক্ত পাঠক। বঙ্গভাষার গল্প-সাহিত্যে আপনার আসন অনেক উচ্চে এ কথা অসঙ্কোচেই বলিতে পারি।"

The Bengalee.—July 22, 1915: "The stories are very delightful and we passed quite a happy half-an-hour in its company. The style of the author is forceful, elegant and lucid; his language terse, but at the same time his characters have been clearly portrayed. The second story has appealed to us specially. The plot is taken up with a famine episode in Orissa. The author has depicted the horrible scene in a direct and forcible manner pressing the horrors of famine home to his readers. The author, however, is not merely an artist, but is also possessed in a remarkable degree of the gift of insight into human nature. What strikes us most is that the stories, contrary to the prevailing fashion of the day relate absolutely to the life and culture of our own country. The characters are not the foreign one opossed in Indian garb. We have every reason to believe that the book will be widely appreciated."

ভারতবর্ষ; আশ্বিন, ১৩২২—"এই গল্পগুলি যখন পত্রাদিতে প্রথম প্রকাশিত হয়, তখনই আমরা ইহার প্রশংসা করিয়াছি। আমরা সবগুলি গল্পই পাঠ করিয়াছি এবং শরৎ বাবু যে একজন সুলেখক তাহা

প্রত্যেক গল্প পাঠ করিলাই বুঝিতে পারিয়াছি। শরৎবাবুর লেখনী সকল বিষয়েই পরিচালিত হইয়া থাকে এবং তিনি সংস্কৃত কাব্য, নাটক ও দর্শন সম্বন্ধে চিন্তাশীল প্রবন্ধাদি লিখিয়া ইতঃপূর্ব্বেই বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন। গল্প-লেখকের ক্ষেত্রেও তাঁহার যশ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পুস্তকখানির কাগজ, ছাপা, বাঁধাই অতি সুন্দর।"

মানসী; আষাঢ়, ১৩২৩—"মাসিকপত্রের পাঠকগণ শরৎবাবুর নানা বিষয়িণী রচনার সহিত সুপরিচিত। বেদান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট গল্প অবধি সব বিষয়েই তিনি লেখনী চালনা করিয়া থাকেন। তাঁহার লেখার প্রধান গুণ এই,—যে বিষয়েই তিনি লেখেন, সরল সরস ভাষায় নিজের বক্তব্যটি বেশ গুছাইয়া বলিতে পারেন। সমালোচ্য গ্রন্থখানিতে অনেকগুলি গল্পেই করুণরস বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। করুণরস ফুটাইতে পারেন এমন লেখক বঙ্গ-সাহিত্যে আরও আছেন, কিন্তু যে ঘটনাগুলির মধ্য দিয়া তাঁহারা ঐ রসের বিকাশ সাধন করেন, তাহা প্রায়ই বড় একঘেয়ে হইয়া পড়ে। শরৎবাবুর গল্পগুলি কিন্তু সে জাতীয় নহে—তিনি নানা বিচিত্র ঘটনার ভিতর দিয়া করুণরসকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ঘটনাগুলি শুধু বিচিত্র নহে, তাহাদের মধ্যে অভিনবত্বও আছে। ইহাই ছোট গল্পের প্রকৃত উপাদান। বর্ণিত ঘটনাটি বেশ স্বাভাবিক হওয়া চাই, পড়িয়া কাহারও না মনে হয় 'না, এরূপ বাস্তব জীবনে হয় না।' অথচ এমন হওয়া চাই, যাহা সচরাচর ঘটে না। অর্থাৎ 'ঘটিয়া থাকে' ঘটনার চেয়ে 'ঘটিলে ঘটিতে পারিত' ঘটনাই ছোট গল্পের পক্ষে সমধিক উপযোগী। এই গ্রন্থে অনেকগুলি গল্পেই ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়।

এই সংগ্রহের একটি গল্পের নাম 'নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী।' এই

নামে বঙ্কিমবাবুর একটি অসমাপ্ত ছোট গল্প অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন। শরৎবাবু ভূমিকায় বলেন "এ পর্য্যন্ত কোনও লেখক এই অসমাপ্ত গল্পটির একটা 'উপ-সংহার' পর্য্যন্ত করেন নাই। এতদিন বাদে শুধু 'উপসংহার' করাটা ভাল দেখায় না বলিয়া ইহা পূরাদস্তুর সংহারই করিয়া দিয়াছি"। সুখের বিষয়, শরৎবাবু গল্পটি সংহারে কৃতকার্য্য হন নাই। বঙ্কিমবাবুর মনে কি ছিল তাহা বলা যায় না, তবে শরৎবাবু ইহার যে পরিণামটি কল্পনা করিয়াছেন, তাহা বেশ সঙ্গত ও কৌশলপূর্ণ হইয়াছে।

শরৎবাবুর আর একখানি নবপ্রকাশিত গল্পের বই

ভারতবর্ষ; ভাদ্র, ১৩২৪—শ্রীযুক্ত ঘোষাল মহাশয় অদ্ভুত লেখক। তাঁহার লেখনী হইতে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্মতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব সমস্তই বাহির হইতে থাকে; এবং সে সকল বিষয়েই তাঁহার গভীর গবেষণার উজ্জ্বল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা কম শক্তির পরিচয় নহে। প্রমাণস্বরূপ এই 'যৌতুক' বইখানাই লওয়া যাইতে পারে। ইহাতে সাতটি ছোট গল্প আছে। মাসিকপত্রে এই গল্পগুলি যখন প্রকাশিত হয়, তখন সকলেই এগুলির প্রশংসা করিয়াছিলেন। এখন এই গল্পগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় আমরাও সেই প্রশংসার প্রতিধ্বনি করিতেছি। শ্রীযুক্ত শরৎবাবু যখন যাহা লেখেন, তাহাই আমরা বিশেষ

আগ্রহের সহিত পাঠ করি। আমাদের পাঠকগণ এই 'যৌতুক' লাভ লাভ করিয়া যে আনন্দিত হইবেন, একথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিয়া দিতেছি।

মানসী ও মর্ম্মবাণী; আশ্বিন, ১৩২৪—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের গল্পগুলি আমাদের ভাল লাগে। শরৎবাবুর গল্পের বিশেষত্ব এই যে সেগুলি সাধারণতঃ উদ্দেশ্যমূলক হইয়াও এমনই স্বাভাবিক যে, সেগুলিতে আর্টের সহিত বাস্তবতার সম্মিলন দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই। শরৎবাবুর গল্পগুলিতে বাস্তবতা আছে, কিন্তু পাপের পঙ্কিলতা নাই, উদ্দেশ্যমূলকতা আছে কিন্তু অস্বাভাবিকতা নাই। তিনি কোথাও কোন উদ্দেশ্যের জন্য গল্পের স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত হইতে দেন নাই। আর গল্পগুলির পবিত্রভাব পাঠকের হৃদয়েও পবিত্রতা সঞ্চারিত করিয়া দেয়। 'যৌতুকে'র অধিকাংশ গল্পই সুপরিকল্পিত এবং লেখকের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তির পরিচায়ক। সর্ব্বোপরি তাঁহার আন্তরিকতা গল্পগুলিকে একটা স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে।

এণ্টিক কাগজে ছাপা. দুই রঙের সিল্ক বাঁধাই। মূল্য এক টাকা।

ইতিমধ্যেই গ্রন্থ দুইখানির হিন্দী ও মারাঠি ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে।

প্রকাশক :—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।